রহস্য সন্ধানী

দময়ন্তী সমগ্র ২

মনোজ সেন

রহস্য সন্ধানী দময়ন্তী সমগ্র

২

মনোজ সেন

বুক ফার্ম

Rahashya Sandhani Damayanti Samagra vol-2

Written by

Manoj Sen

No part of this work can be reproduced in any form

without the written permission of the author and the publisher

© মনোজ সেন

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০২০

প্রচ্ছদ : সপ্তদীপ দে সরকার

অলংকরণ : রাহুল ঘোষ

বুক ফার্ম-এর পক্ষে শান্তনু ঘোষ ও কৌশিক দত্ত কর্তৃক

৭ এল, কালীচরণ শেঠ লেন, কলকাতা ৭০০০৩০ থেকে প্রকাশিত

চলভাষ : ৯৮৩১০৫৮০৪০/৯০৫১০১১৬৪৩

মুদ্রক : এস পি কমিউনিকেশন প্রা লি, কলকাতা ৭০০০০৯

আমার পরম শুভানুধ্যায়ী সুহৃদ
পরলোকগত **বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের**
আনন্দময় স্মৃতিতে,
গোরাবাবু

আনন্দবাজার পত্রিকা
কলকাতার কড়চা, ১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮, সোমবার

রোমাঞ্চকর

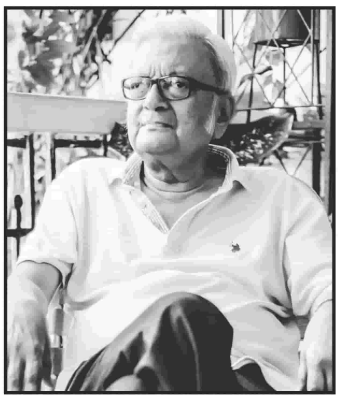

■ বিশ শতকের সত্তর দশক থেকে টানা কুড়ি বছর ‘রোমাঞ্চ’ পত্রিকায় রহস্য, অলৌকিক, বিজ্ঞানভিত্তিক, রূপকথা ইত্যাদি মিলিয়ে প্রায় আড়াই হাজার পাতা ছোট ও বড়দের উপযোগী কাহিনি লিখেছেন। ১৯৯২ সালে ‘রোমাঞ্চ’ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর প্রায় এক দশক লেখা বন্ধ। শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনীশ দেবের উৎসাহে নতুন শতকে আবার নানা পত্রপত্রিকায় লেখা শুরু করেন মনোজ সেন (জন্ম ১৯৪০)। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। স্কটিশ চার্চ স্কুল, প্রেসিডেন্সি কলেজ, বি ই কলেজে পড়াশোনা। প্রচারের আড়ালে থাকা এই প্রবীণ লেখকের একটিমাত্র সঙ্কলন প্রকাশিত হয় বছর দশেক আগে, তাও নিজের উদ্যোগে। এ বার বুকফার্ম প্রকাশ করল ‘৫x৫=২৫’ (পাঁচমিশেলি সঙ্কলন)। ভূতের গল্প, থ্রিলার ইত্যাদির সঙ্কলনও প্রকাশের পথে। অন্য দিকে ‘ক্যামেরাজি’ নামের এক অলাভজনক ভিডিয়োগ্রাফি সংস্থা সোশ্যাল মিডিয়া ও ইউটিউবে মনোজ সেনকে নিয়ে প্রকাশ করেছে একাধিক প্রোমো-ভিডিয়ো।

‘বুক ফার্ম ‘-এর প্রয়াস নিয়ে আনন্দবাজার প্রত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন

সূচিপত্র

প্রথম পাপ

অন্ধ তামস

ইজ্জত

নীলকান্তপুরের হত্যাকাণ্ড

ভগ্ন অংশ ভাগ

কৃতজ্ঞতা

সুমিত সেনগুপ্ত, সোনাল দাস, কামিল দাস,
সুশান্ত রায়চৌধুরী, রাহুল ঘোষ, সপ্তদীপ দে সরকার

ভূমিকা

দময়ন্তী দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল। এই ব্যাপারে সমস্ত কাজ রেকর্ড সময়ে শেষ করল 'বুক ফার্ম'। এটা আমার কাছে একটা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য আনন্দের ঘটনা। আজকের এই অতিমারির সময়ে যখন চারদিক থেকে কেবল দুঃসংবাদ আসছে, তখন 'বুক ফার্ম'-এর এই উপহার আমার আশাতীত ছিল। 'বুক ফার্ম'-কে আমার অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এই সুযোগে ধন্যবাদ জানাই 'হই চই' বাংলা ওয়েবসিরিজের পরিচালকদের। 'বুক ফার্ম' যেমন বাঙালি পাঠকদের সঙ্গে দময়ন্তীর পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, 'হই চই' তেমনি ওয়েবসিরিজের অগণিত দর্শককে দময়ন্তীর কাছে নিয়ে গিয়েছেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টা সার্থক হবে এই আশাই করব।

বাংলা সাহিত্যে দময়ন্তীর আবির্ভাবের পর, গত পঞ্চাশ বছরে আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রচুর পরিবর্তন হয়ে গেছে। মেয়েদের কর্মজীবন শিক্ষা, চিকিৎসা, আইন, অভিনয় প্রভৃতি ব্যাবহারিক বিষয় ছাড়িয়ে সেনা, নৌ বা বিমানবাহিনী, পর্বতারোহণ ইত্যাদি শ্রমসাধ্য ও পুরুষদের একচেটিয়া কাজেও চলে এসেছে। মেয়েরা আজ আর 'গোষ্ঠে নাবে যবে সন্ধ্যা, ক্লান্ত দেহে স্বর্ণাঞ্চল' টেনে গৃহপ্রান্তে সন্ধ্যাপ্রদীপ দেওয়ার মধ্যে আবদ্ধ নেই। অথচ, আজও দময়ন্তী যুক্তি, বুদ্ধি, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, ঘটনার বিশ্লেষণ ইত্যাদির যে সমাদর রয়েছে সেটা আমার আশাতীত ছিল।

একটা কথা। কেউ কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন আমার দময়ন্তীকে সৃষ্টি করার অন্যতম কারণ কি মেয়েদের ক্ষমতায়নের পক্ষে ওকালতি করা? সেটা ঠিক কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। লক্ষ করলে দেখা যাবে, এক বা একাধিক পুরুষ সবসময় তাকে পেছন থেকে সাহায্য করে গেছে। আমি তখনও বিশ্বাস করতুম এবং এত পরিবর্তনের পরে আজও বিশ্বাস করি যে দু-পক্ষেরই পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া কোনো ক্ষমতায়নই সম্পূর্ণ হতে পারে না। সংগীত আর সঙ্গতের যুগলবন্দির মতো।

এত কথার পর একটা প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যায়। গল্পগুলো গল্প হয়েছে তো?

মনোজ সেন

প্রথম পাপ

শনিবারের বিকেল। সমরেশ একটা লম্বা দিবানিদ্রা দিয়ে উঠে মিটমিট করে তাকাচ্ছিল এবং আরও কিছুক্ষণ শুয়ে থাকা যায় কিনা চিন্তা করছিল। দময়ন্তীকে ঘরের মধ্যে ঘোরাঘুরি করতে দেখে জড়িত কণ্ঠে বলল—'চা-টা কিছু লাগাও!'

দময়ন্তী বলল, 'লাগাচ্ছি। আগে উঠে হাত-মুখ ধোও তো! তারপর বারান্দায় এসো। দিব্যি ফুরফুর করে হা—ওয়া দিচ্ছে।'

হাত-মুখ ধুয়ে সমরেশ অর্ধনিমিলিত চোখে বারান্দায় এসে ধপ করে একটা মোড়ার ওপর বসে পড়ল। আগের মতোই জড়িত গলায় বলল, 'ইঃ! কী ঘুমেই ধরেছে! বলি, চা-টা বেশ কড়া করে করেছ তো? নইলে এ শালার ঘুম ছুটতে দেরি হবে।'

এমন সময় ওদের বারান্দার ঠিক নীচেই একটা বিশাল গাড়ি এসে ফুটপাথের পাশে দাঁড়াল। নিঃশব্দে, মরালগতিতে যেন হাওয়ায় ভেসে এল গাড়িটা।

দুজনে মুগ্ধ হয়ে দেখছিল গাড়িটাকে। কিন্তু তারপরে গাড়ির ভেতর থেকে যিনি নামলেন, তাঁকে দেখে তো দুজনেরই চক্ষুস্থির— সমরেশের বিশেষ করে। অনবদ্যকান্তি, অপূর্বসুন্দরী এক মহিলা এমন লীলায়িত অথচ ঈষৎ গর্বিত ভঙ্গিতে গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির মধ্যে ঢুকলেন যে মনে হল যেন, একটি গীতি-কবিতা চোখের ওপর দিয়ে ভেসে চলে গেল। ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সমরেশ। বলল, 'বোধ হয় একতলায় বাড়িওলার কাছে এল, তাই না?'

দময়ন্তী হেসে উঠল। বলল, 'তাই হবে বোধ হয়। কিন্তু তোমার কী হল? শালার ঘুম ছুটে গেল মনে হচ্ছে যেন?'

'আরে, না, না', সমরেশ লজ্জিত গলায় বলল, 'কী যে বলো, তার ঠিক নেই। আমি কি আর ওই ভদ্রমহিলাকে দেখছিলুম নাকি? আমি তো গাড়িটা দেখছিলুম। আচ্ছা, কনভার্টিবল ক্রাইসলার— দেখলেই মনটা কেমন উদাস হয়ে যায়।'

চায়ের কাপের ওপর দিয়ে স্থির দৃষ্টিতে সমরেশের দিকে তাকিয়ে দময়ন্তী বলল, 'তোমরা, পুরুষেরা ভয়ানক মিথ্যেবাদী!'

'দ্যাখো, জাত তুলে কথা কইবে না বলে দিচ্ছি!' সমরেশ কটমট করে তাকাল, 'মনে রেখো, জগতে যে দুজন সত্যবাদী বলে বিখ্যাত, তাঁরা দুজনেই পুরুষজাতীয়।'

'কে সেই দুজন শুনি?'

'একজন ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির আর অন্যজন শ্রীসমরেশ দত্তগুপ্ত। সন অব...'

ভয়ানক চ্যাঁচামেচি করে দময়ন্তী প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই ক্রিং ক্রিং করে দরজার ঘণ্টি বেজে উঠল।

দুজনেই চোখ কপালে তুলে তাকাল দুজনের দিকে।

'হাঁ করে দেখছ কী? যাও, দরজাটা খোলো গিয়ে!' চাপা গলায় দময়ন্তী ধমকে উঠল। তারপর চায়ের কাপ-টাপগুলো ট্রের ওপর সাজাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

'আপনিই বোধ হয় মিস্টার সমরেশ দত্তগুপ্ত?' দরজা খুলে দিতে প্রশ্ন এল।

সমরেশের মনে হল যেন পাঁচটা কোকিল একসঙ্গে ডেকে উঠল।

ঢোক গিলে বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমিই সমরেশ দত্তগুপ্ত।'

'ভেতরে আসতে পারি কি? বড়ো বিপদে পড়ে আপনাদের কাছে এসেছি।'

ব্যস্ত হয়ে সমরেশ দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল। বলল, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, ভেতরে আসুন, বসুন ওই সোফাটায়।'

অপাঙ্গে ভদ্রমহিলাকে দেখল সমরেশ। বয়স খুব কমিয়ে-সমিয়ে ধরলেও তিরিশ। তবে প্রগাঢ় যৌবনা, 'যুবতীবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতু' বলা চলে। লম্বা প্রায় পাঁচ ফুট পৌনে চার ইঞ্চি। পরনে গাঢ় নীল রঙের একটা সিল্কের শাড়ি এবং সেই কাপড়েরই একটা স্লিভলেস ব্লাউজ। মাঝখানে যে প্রায় সাড়ে আট ইঞ্চির মতন শরীরের অংশটুকু দৃশ্যমান তার মিনিমাম পরিধি বাইশ ইঞ্চির বেশি হতেই পারে না। আর তার ওপরে-নীচে অদৃশ্য অংশদ্বয়ের পরিধি চৌত্রিশের কম হলে যেন সমরেশের নাম পালটে রাখা হয়।

কিন্তু এই পর্যবেক্ষণ সমরেশকে অর্ধপথেই বন্ধ করতে হল। কারণ পাঁচটা কোকিল আবার একসঙ্গে প্রশ্ন করল, 'আপনার স্ত্রী কি বাড়িতে আছেন?'

চমকে উঠে সমরেশ বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আছেন বই কী! উনি আসছেন এক্ষুনি।'

'দেখুন, আপনার বন্ধু ডিটেকটিভ ইনস্পেকটর শিবেন সেন আমাদেরও পারিবারিক বন্ধু। উনিই আমাকে পরামর্শ দিলেন, আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে। এর আগে আপনার স্ত্রী নাকি দু-তিনটি কেসে রহস্যোৎঘাটনে ওঁকে সাহায্য করেছিলেন? এখন তো তাঁর ওপরে শিবেনের অগাধ বিশ্বাস। তাঁর মগজে নাকি একটি চমৎকার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী শক্তি আছে!'

সমরেশ একটা খুব বিনীত হাসি হাসল বটে, কিন্তু মনে মনে শিবেনের মুণ্ডপাত করল। আগে থেকে একটু বলে রাখতে হয়। কথা নেই, বার্তা নেই, দুম করে একজনকে পাঠিয়ে দিয়েই খালাস। তাও আবার এরকম সাংঘাতিক একজনকে।

ভদ্রমহিলা তখনও কথা বলেই চলেছেন, 'আপনি হয়তো আমাকে চিনতে পারবেন। আমার নাম শুনে থাকতে পারেন। আমার নাম মালবিকা হালদার।'

মালবিকা হালদার! হাঁ করে তাকিয়ে রইল সমরেশ। কস্মিনকালেও এ হেন একটা নাম শুনেছে বলে মনে করতে পারল না। ঠিক তক্ষুনি দময়ন্তী ঘরে ঢুকে ওকে উদ্ধার করল। নমস্কার করে উচ্ছ্বসিত গলায় বলল, 'ওমা! আপনিই মিসেস মালবিকা হালদার? কী আশ্চর্য, আপনার নাম শুনেছি বই কী! কত ছবি দেখেছি আপনার 'ফেমিনিকা' পত্রিকায়। আপনিই তো গত বছর কলকাতার 'সামার কুইন' হয়েছিলেন, তাই না?'

লজ্জিতভাবে একটু ঘাড় কাত করলেন মহিলা। বললেন, 'শিবেনের কাছে আপনাদের নাম শুনে ছুটে চলে এলুম। ভয়ানক বিপদ আমার মিসেস দত্তগুপ্ত, আমায় আপনি বাঁচান। আমার সম্মান, আমার সংসার, আমার ভবিষ্যৎ... এভরিথিং ইজ অ্যাট স্টেক। একজন মেয়ে হিসেবে আপনার কাছে মিনতি করছি, আমায় উদ্ধার করুন। কোনো পুরুষের কাছে সংকোচে যেতে পারিনি, কিন্তু আপনি তো আমার দুঃখটা সঠিক বুঝতে পারবেন, অন্তরে অনুভব করতে পারবেন।' বলতে বলতে কান্নায় গলা বুজে এল মিসেস হালদারের। কোলের ওপর রাখা ছোট্ট ভ্যানিটি ব্যাগটি খুলে তার ভেতর রুমালটা খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু রুমাল বেরোনোর আগেই তাঁর দু-চোখ ছাপিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগল।

সমরেশ অত্যন্ত অপ্রস্তুত আর দময়ন্তী করুণ মুখ করে ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে রইল। দময়ন্তীর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে সমরেশ ফিসফিস করে বলল, 'এসব কান্নাকাটির মধ্যে আমি আবার কেন? তুমি রহস্যের সমাধান করো, আমি ঝপ করে মেজদার বাড়ি থেকে ঘুরে আসি।'

সমরেশের হাত চেপে ধরে দময়ন্তী চাপা গলায় বলল, 'না, কোথাও যাবে না তুমি। তুমি সঙ্গে না থাকলে আমি কনফিডেন্স পাই না যে! চুপ করে বসে থাকো তো!'

মিসেস হালদার বেশ কিছুক্ষণ কাঁদলেন। তারপর কান্নার বেগ একটু কমে এলে দময়ন্তী মৃদুকণ্ঠে বলল, 'কী বিপদ আপনার বলুন। যদি আমার সাধ্যের মধ্যে হয়, নিশ্চয়ই সাহায্য করব আমি।'

রুমালে চোখ মুছে সেটিকে যথাস্থানে রেখে কম্পিত কণ্ঠে মালবিকা বললেন, 'আমাকে কেউ ব্ল্যাকমেল করছে, মিসেস দত্তগুপ্ত। মাসে মাসে দশ হাজার টাকা করে দিয়ে যাচ্ছি আমি। অবশ্য টাকাটা বড়ো প্রশ্ন নয়, টাকা আমার অনেক আছে। কিন্তু এই লুকোচুরি যে-কোনো দিন ধরা পড়ে যেতে পারে। আর সেদিন আমার সর্বনাশ! এই মুখ আর কোথাও দেখাতে পারব না। সেদিন সেই লজ্জার হাত থেকে বাঁচতে আমাকে হয়তো আত্মহত্যাই করতে হবে। ভেবে দেখেছি, এ ছাড়া আর অন্যপথ আমার থাকবে না।'

দময়ন্তী বলল, 'আপনি এখনই এ নিয়ে এত ভাবছেন কেন? তেমন সময় তো আসেনি। তবে কে আপনাকে ব্ল্যাকমেল করছে বলুন, দেখি, তাকে আটকানোর কোনো পথ বের করতে পারি কিনা?'

মাথা নীচু করে মালবিকা বললেন, 'সেইটেই তো এখনও পর্যন্ত বের করতে পারলুম না। টাইপ করা চিঠিতে টাকার ডিমান্ড আসে। কে পাঠায়, কোথা থেকে পাঠায়, কিছুই জানি না।'

দময়ন্তী আশ্চর্য হয়ে বলল, 'সে কী? লোকটার নামধাম জানেন না, অথচ মাসে মাসে টাকা গুনছেন? টাকাটা দেন কী করে?'

'কলকাতায় একটা কফির দোকান আছে, সেখানে খাবার দাবারও বিক্রি হয়। একটা টিফিন ক্যারিয়ারে টাকাটা রেখে, আমি সেটা সেখানে কাউন্টারের ওপর রেখে আসি। তারপর কে কীভাবে নিয়ে যায়, আমি বলতে পারব না। কারণ আরও অনেকগুলো টিফিন ক্যারিয়ার থাকে সেখানে। আমারটা মিশে যায় সেগুলোর সঙ্গে।'

'কী নাম সেই কফির দোকানটার?'

'আমায় মাফ করবেন, আমি বলতে পারব না। শিবেনও পীড়াপীড়ি করেছিল। আমি বলিনি। কারণ, চিঠিতে লেখা থাকে যে, যদি কখনো কোনোভাবে কারোর কাছে রেস্টুরেন্টটার নাম করি, তাহলে...'

'বুঝেছি।' দময়ন্তী বলল, 'থাক, তাহলে। কিন্তু যে ব্যাপারে আপনাকে ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছে, সেটা জেনুইন তো?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মালবিকা বললেন, 'হ্যাঁ, জেনুইন।' ওঁর মাথাটা ঝুঁকে পড়ল বুকের ওপর।

'সেটা কী, তা জানতে পারি কি?'

‘ক্ষমা করুন আমায়। সেটাও আমি বলতে পারব না। আমায় সে অনুরোধ করবেন না।’ ভদ্রমহিলার কণ্ঠস্বর আবার বুজে আসবার উপক্রম হল।

‘কী আশ্চর্য!’ দময়ন্তী হতাশ গলায় বলল, ‘আপনি চান, আমি আপনাকে এই বিপদে সাহায্য করি, অথচ খোলসা করে কিছুই বলছেন না। এ অবস্থায় আমি কী করতে পারি, বলুন তো দেখি?’

কোনো জবাব না দিয়ে অপরাধীর মতো মুখ করে বসে রইলেন মালবিকা। দময়ন্তী কিছুক্ষণ বিরাগপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর ধীরে ধীরে ওর মুখের রেখাগুলো ক্রমশ কোমল হয়ে এল। শান্ত গলায় বলল, ‘আচ্ছা, ঠিক আছে। আপনি বরং আপনার জীবনের গল্প আমাদের শোনান। কী করেন আপনার স্বামী? ছেলেপুলে ক-টি?’

কৃতজ্ঞ চোখ তুলে দময়ন্তীর দিকে তাকালেন মালবিকা। বললেন, ‘আমার স্বামী ডক্টর বি.কে. হালদার, কতগুলো বড়ো বড়ো কোম্পানির ডিরেক্টর। তাঁর নাম হয়তো শুনেছেন। সাধারণভাবে তিনি কেমিক্যাল আর রঙের ব্যবসা করেন।’

সমরেশ বলল, ‘আরে! স্পেকট্রাম পেন্টস-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডক্টর বি.কে. হালদার আপনার স্বামী? ওঁকে তো খুব ভালো করে চিনি। ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল-এর চেয়ারম্যান ছিলেন। আমি তখন ছিলুম ইলেকট্রিকাল সেকশনের সেক্রেটারি।’

মালবিকা বললেন, ‘হ্যাঁ, নানারকম প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে উনি জড়িত। সবগুলোর নামও আমি জানি না ছাই। যাক, আপনি যখন ওঁকে চেনেন, তখন তো ভালোই হল। আমাদের পরিচয়টা ভবিষ্যতে আরও ঘনিষ্ঠ করে নেওয়া যাবে।’

সমরেশ হেঁ হেঁ করে বিনীত হাসি হাসল।

দময়ন্তী বলল, ‘নিশ্চয়ই নেওয়া যাবে। কিন্তু আপাতত আপনার গল্পটা চলুক।’

‘হ্যাঁ, ওই যে বলি’, মালবিকা বললেন, ‘কিন্তু কোত্থেকে যে শুরু করব, জানি না। আচ্ছা, বরং ছেলেবেলা থেকেই শুরু করি, কি বলেন?’

‘আমার বাবা ছিলেন তালতলার বিখ্যাত মিত্র বংশের সন্তান। তালতলাতেই আমাদের সাবেক বাড়িতে আমার জন্ম হয়। আমরা দুই বোন। আমিই ছোটো। আমার দিদির নাম ছিল শ্রীলেখা, ও আমার চেয়ে চার বছরের বড়ো ছিল।

‘শুনেছি, আগে নাকি আমাদের অনেক টাকা-পয়সা ছিল। কিন্তু বাবা যখন সংসারের ভার নিলেন, তখন একমাত্র ওই প্রকাণ্ড বাড়িটা ছাড়া তাঁর বোধ হয় অন্য কোনো সম্বল ছিল না। কাজেই তাঁকে চাকরি নিতে হল। একদিন আমাদের হাত ধরে কলকাতা ত্যাগ করলেন বাবা। পুনার কাছে পুরন্দরপুর বলে একটা ছোটো শহরের মিউনিসিপ্যাল কলেজে ইংরেজির অধ্যাপনার চাকরি পেয়েছিলেন। সেখানেই নতুন করে সংসার পাতলেন।

‘কী আশ্চর্য সুখে আর অপূর্ব আনন্দেই না আমাদের ছেলেবেলা কেটে ছিল সেখানে! আমি যখন যাই তখন প্রায় ছ-বছরের শিশু ছিলুম, আর যখন ফিরি তখন আমার বয়স ষোলো। এই দশটা বছর যেন একটা দীর্ঘ স্বপ্নের মতো মনে পড়ে।

‘একটা ছোটো বাংলো ধরনের বাড়িতে থাকতুম, তার মাথায় টালির ছাদ আর চারদিকে বড়ো বড়ো গাছ। আমাদের প্রতিবেশী ছিলেন বাবার হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্ট মিঃ প্যাট্রিক অ্যাডামস। বুড়ো ইংরেজ, ছেলেপুলে ছিল না, স্ত্রীও মারা গিয়েছিলেন। আমরা ওঁকে ডাকতুম ওল্ড প্যাট বলে, আর কী অত্যাচারই না করতুম! দিদিটা অবশ্য শান্ত, নরম মতন ছিল। আমি ছিলাম দুর্দান্ত। বুড়ো কিন্তু আমাদের সব দুষ্টুমি হাসি মুখে সহ্য করতেন, বোধ হয় কিছুটা প্রশ্রয়ও দিতেন। যখন মারা যান, তখন এমন প্রচণ্ড দুঃখ হয়েছিল যে, আমরা দু-বোন প্রায় দু-দিন না খেয়ে, না ঘুমিয়ে খালি কেঁদেছিলুম।

‘বাবা অবশ্য কাঁদেননি, কিন্তু অত্যন্ত মুষড়ে পড়েছিলেন। বুড়ো মারা যাওয়ার মাস ছয়েক পরে কলকাতায় একটা প্রাইভেট কলেজে চাকরি পেলে বাবা আবার আমাদের নিয়ে ফিরে আসেন তালতলায়।

খুব খারাপ লেগেছিল কলকাতায় ফিরে এসে। অবাধ মুক্তির থেকে একেবারে জেলখানায়। বিশ্রী লাগত আমাদের বাড়িটা— একটা প্রকাণ্ড প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ার মুখ থুবড়ে পড়ে আছে মনে হত। বিশাল বিশাল একগাদা ঘর, তাদের বেশিরভাগই তালাবন্ধ। বারান্দার একপ্রান্ত থেকে চিৎকার করলে, অন্য প্রান্ত থেকে শোনা যায় না। বাড়িটা কেমন যেন সবসময় নির্জন।

‘দিদির অবশ্য আরও খারাপ লেগেছিল। কারণ আমি তখন প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেব বলে পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতুম, ও বেচারি একা একা ঘুরে বেড়াত। ওর তো পড়াশোনা ছিল না। পুরন্দরপুর কলেজ থেকেই বিএ পাশ করে নিয়েছিল।

‘যাই হোক, কলকাতায় ফেরার বছর খানেকের মধ্যেই দিদির বিয়ে হয়ে গেল। দিদির শ্বশুরবাড়িও খুব বিখ্যাত পরিবার। শ্যামবাজারের শ্রীকণ্ঠ ঘোষেদের প্রায় দু-শো বছর কলকাতায় বসবাস। কুলীন এবং পয়সাওলা লোক ওঁরা। সেই শ্রীকণ্ঠ ঘোষের নাতি ছিলেন আমার ভগ্নীপতি।

‘দিদির বিয়েতে ভয়ানক কান্নাকাটি করেছিলুম আমি। ভয় হয়েছিল, দিদি আমায় একটা প্রকাণ্ড নির্জনতার মধ্যে ফেলে রেখে চলে যাচ্ছে। নির্জনতা সহ্য করতে হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু বেশিদিন নয়। কারণ, কিছুদিন পরেই বাবার সনির্বন্ধ অনুরোধে আমার ভগ্নীপতি দিদিকে নিয়ে আমাদের বাড়িতেই এসে বসবাস করতে লাগলেন এবং সেখান থেকেই তাঁর পগেয়াপটির ব্যবসা চালাতে লাগলেন।

‘এই সময় আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিলুম এবং ভয়ানকভাবে ফেল করলুম। তখনই আবার দিদির ছেলেপুলে হবার সম্ভাবনা দেখা দিল। তখন বাবা আমাদের সবাইকে নিয়ে বোম্বে রওনা হলেন। আমার ভগ্নীপতি অবশ্য তালতলাতেই থেকে গেলেন।’

সমরেশ এখানে বাধা না দিয়ে আর পারল না। বলল, ‘আবার বোম্বে? কেন, বোম্বে কেন?’

‘কারণ বাবার মনে তখনও বম্বে-পুনা অঞ্চলের স্মৃতিই অনেক বেশি উজ্জ্বল। কলকাতায় যা আমরা পাই না, ওখানে তাই পেয়েছিলুম— মানুষের বন্ধুত্ব, ভালোবাসা। বম্বের ডা: ই.কে. ভারুচা ছিলেন মস্ত বড়ো ডাক্তার, আর বাবার অন্তরঙ্গ বন্ধু। বাবা কলকাতায় প্রায় কাউকেই চিনতেন না, তাই ডাঃ ভারুচার কাছে যাওয়াই তাঁর বিবেচনায় উপযুক্ত বলে মনে হয়েছিল। ডাঃ ভারুচার নার্সিংহোমেই বাবার নাতির জন্ম হয়। ওর জন্মের পরেই দিদি ভয়ানকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তখন সেই ডাক্তারই যে কী অমানুষিক পরিশ্রম করে দিবারাত্রি দিদির পাশে বসে থেকে দিদিকে ভালো করে তোলেন, তা আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না। কলকাতার কোনো ডাক্তারের কাছ থেকে সেরকম সেবা আশা করাই অন্যায়।

‘যাই হোক, প্রায় আট কী ন-মাস বাদে দিদিকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে আমরা আবার কলকাতায় ফিরে এলুম। বাবা চাকরি, টিউশানি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, আমি বসলুম পরীক্ষার পড়া নিয়ে।

‘তারও প্রায় তিন-চার মাস পরে একটা ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটল আমাদের বাড়িতে। হঠাৎ আমার ভগ্নীপতি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করলেন। আর তার পরদিন থেকে শোকে উন্মাদ হয়ে গেল আমার দিদি। আমার মা যে কী অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন সেসময়, সেকথা আপনাদের বলে বোঝাতে পারব না। তিনি একহাতে পাগল মেয়ের সেবা করেছেন, অন্যহাতে সদ্যোজাত নাতিকে মানুষ করেছেন। একদিনও এক মুহূর্তের জন্য ভেঙে পড়েননি। পড়লে যে কী হত আমাদের সংসারের, আমি জানি না। তবে বাবা শোকে কেমন যেন জুবুথুবু হয়ে গিয়ছিলেন। তাঁর দরাজ প্রাণখোলা হাসি চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

‘এরপর আমার আর লেখাপড়া হল না। মনই বসাতে পারলুম না, কাজেই পড়াশোনা ত্যাগ করলুম। কী হবে খামোখা সময় আর টাকা-পয়সার বাজে খরচা করে?

‘কী অদ্ভুত জীবনটা কেটেছে তখন! দুঃখের বলবো না, যন্ত্রণারও বলবো না, কেমন একটা অসাড়... বোবা... অনুভূতিহীন জীবন। সেই বিশাল প্রাসাদের অন্ধকারে আমি, মা, আমার উন্মাদ দিদি আর তার ছেলেটা একটানা একঘেয়ে দিন কাটিয়ে গেছি। বাবার সব চুল অকালে পেকে গেল। সমস্ত আত্মীয় স্বজনকে ত্যাগ করলেন তিনি, তারাও তাঁকে ত্যাগ করল। ফলে কেউ আসত না আমাদের বাড়ি, আমরাও কারোর বাড়ি যেতুম না। আনন্দহীন, স্ফূর্তিহীন একটা দিনগত পাপক্ষয় করে যেতুম। সারাদিন সংসারের কাজ করতুম, আর ভগবানকে ডেকে জিজ্ঞেস করতুম, কার অপরাধে আমাদের এই অবস্থা? কোনোদিন উত্তর পাইনি।

‘বাবা সারাদিন ছাত্র পড়াতেন। আমাদের মূল বাড়ি থেকে কিছু দূরে আউটহাউসে তাঁর কোচিং ক্লাস ছিল। আমি মাঝে মাঝে জানলায় দাঁড়িয়ে সেই বাড়িতে লোকজনের আসা-যাওয়া দেখতুম। সেখানে যাওয়া অবশ্য আমার বারণ ছিল।

‘প্রায় সাত বছর আমাদের এইভাবেই কেটেছিল। ভেবেছিলুম, কোনোদিন পরিবর্তন আসবে না, আসা সম্ভবও নয়। কিন্তু একদিন সেই পরিবর্তন এল!

‘বাবার কাছে একটি মেয়ে পড়তে আসত, তার নাম তন্দ্রা হালদার। তার দাদা বিভাসকুমার তাকে রোজ গাড়ি করে পৌঁছে দিয়ে যেত এবং নিয়ে যেতে আসত। আমি অবশ্য তাকে কোনোদিন লক্ষই করিনি, তার সঙ্গে পরিচয় হওয়া তো দূরস্থান। কিন্তু ও আমাকে কে জানে কখন কীভাবে দেখেছিল। বাবার কাছে তারপর ও বিয়ের প্রস্তাব করে।

‘বাবা প্রথমে সোজা না বলে দিয়েছিলেন। এবং লুকিয়ে প্রেম করছি সন্দেহ করে আমাকে খুব বকেছিলেন। কিন্তু মা বাবাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করান। ওরা বংশমর্যাদায় যদিও আমাদের সমান ছিল না, কিন্তু লেখাপড়ায় ওদের বংশের নাম আছে, টাকা পয়সাও আছে, তা ছাড়া আদর করে নিতে চাইছে যখন, তখন মেয়েকে সুখেই রাখবে— এইসব বলে মা বাবার মন ভেজালেন।

‘তারপর আমাদের বিয়ে হয়ে যায়— সে আজ প্রায় বছর আষ্টেক আগেকার ঘটনা।’

সমরেশ এতক্ষণ দমবন্ধ করে শুনছিল। এখন দম ফেলে বলে ফেলল, ‘যাক বাঁচা গেল!’

খুব আস্তে করে বললেও, কথাটা কানে গেল মালবিকা হালদারের। বললেন, ‘না, এইখানেই শেষ নয়। বরং এবার শুরু বলতে পারেন।

‘বিয়ের পর আমার স্বামীর ব্যবসায় প্রচণ্ড উন্নতি হয়। এত টাকা রোজগার করেন যে, তা তাঁর পূর্বপুরুষের সঞ্চিত সম্পত্তির চেয়েও বেশি। আমাকে তো দেখেই বিয়ে করেছিলেন, তার ওপর এই উন্নতির জন্যও তাঁর মনে হল, আমিই এর কারণ। একরকম কুসংস্কার আর কী! কিন্তু তার ফলে উনি আমার ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। আমি যখন যা করতে চেয়েছি, বাধা দেননি। বরং উৎসাহ আর প্রশ্রয় দিয়েছেন।

‘কিন্তু আমার বাবা-মা আর সুখের মুখ দেখে যেতে পারেন নি। আমার বিয়ের মাস ছয়েকের মধ্যেই দিদি মারা যায়। বুড়ো বুড়ি নাতিকে নিয়ে ছিলেন বেশ, কিন্তু একদিন প্রবীর, মানে আমার দিদির ছেলেকে স্কুলে দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে ট্রাম থেকে পড়ে মা মারা যান। প্রবীরের বয়স তখন আট কী নয়। এত শোক বাবা আর সহ্য করতে পারলেন না। একদিন সন্ধ্যেবেলা প্রবীরকে তাঁর জামাই-এর হাতে দিয়ে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। যাবার আগে শুধু বলেছিলেন, আমি পুরন্দরপুর চললুম। প্রবীর রইল, তুমি বাবা ওকে একটু দেখো। আমরা খবর নিয়ে দেখেছি, পুরন্দরপুরে উনি যাননি।’

‘বলেন কী?’ সমরেশ আবার বলে উঠল, ‘তার মানে তিনি আজ কোথায়?’

‘জানি না। বেঁচে আছেন কিনা, তাই বা কে জানে। যাই হোক, তারপর থেকে প্রবীর আমাদের কাছেই মানুষ হতে থাকে। এদিকে, অনেক বছর হয়ে গেল, আমাদের কোনো ছেলেপুলে হল না। ডাক্তার বললেন, আমার কোনোদিন হবেও না। তখন আমার স্বামী একদিন প্রস্তাব করলেন যে, আমরা যদি প্রবীরকে দত্তক নিই, তাহলে বেশ ভালো হয়। আমিও অবশ্য এই প্রস্তাবে অত্যন্ত খুশি হয়েছিলুম।’

সমরেশ এখানে আবার হাঁ করেও মুখটা চট করে বন্ধ করে ফেলল। মালবিকা বলে চললেন, ‘তখনই প্রথম সেই বিশ্রী চিঠিটা আসে। আজ থেকে প্রায় বছর খানেক আগে।’

দময়ন্তী জিজ্ঞেস করল, ‘প্রবীরকে যে আপনারা দত্তক নিতে চান, একথা কি আপনার স্বামী কাউকে বলেছিলেন?’

মালবিকা বললেন, ‘বহু লোককেই বলেছিলেন। উকিল ডেকে পরামর্শ হয়েছিল। যাগযজ্ঞ যা হবার তার জোগাড়যন্ত্র করবার জন্য ভাইপোকে বলেছিলেন। সকলেই জানত। আমরা লুকিয়ে চুরিয়ে কিছু করিনি।’

দময়ন্তী বলল, ‘তা তো বটেই। কিন্তু তারপর আপনারা দত্তক নিলেন?’

‘না, আমিই কায়দা করে বাধা দিলুম। ওই চিঠি! ওই চিঠিই আমার ইচ্ছেটাকে নষ্ট করে দিয়ে গেল। আজ প্রায় এক বছর হয়ে গেল। আমি টাকা গুনে যাচ্ছি। যতক্ষণ না এই যন্ত্রণার হাত থেকে উদ্ধার পাচ্ছি, ততক্ষণ কী করে বেচারা প্রবীরকে এর মধ্যে টেনে আনি, বলুন? দত্তক নেওয়া পিছিয়ে দেওয়ায় উনি অবাক হয়েছেন, বিরক্তও হয়েছেন, কিন্তু পীড়াপীড়ি করেননি। বলেইছি তো, আমার কোনো কাজেই উনি বাধা দেন না। আমরা অপেক্ষা করে আছি— উনি আমার মত পালটানোর আর আমি এই চিঠির অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচবার কোনো উপায়ের।’

মালবিকার চোখ দুটি আবার জলে ভরে এল। সিক্ত কণ্ঠে বললেন, ‘আর আমার বলবার কিছু নেই, মিসেস দত্তগুপ্ত, আমার জীবনের প্রায় সব কথাই আপনাকে বললুম। কী দুঃখকে একসময় আমাকে সহ্য করতে হয়েছে, আপনি হয়তো কল্পনাও করতে পারবেন না। আজ আবার সর্বনাশের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছি। কী জানি, এর হাত থেকে আমার মুক্তি আছে কি না। যত টাকা লাগে আমি খরচ করতে রাজি আছি। কিন্তু আমি মুক্তি চাই, উদ্ধার পেতে চাই এই যন্ত্রণা থেকে।’

দীর্ঘশ্বাস ফেলে দময়ন্তী বলল, ‘উতলা হবেন না, মিসেস হালদার। টাকা-পয়সার কথাটা বড় নয়। কিন্তু সবকথা আপনি আমাকে বলেননি। বললে ভালো করতেন। তা ছাড়া বুঝতেই পারছি, বলতে পারবেনও না। যাই হোক, ক-টা প্রশ্ন করব আপনাকে। যদি সম্ভব হয়, উত্তর দেবেন কি?’

একটু সামলে নিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে মালবিকা বললেন, ‘হ্যাঁ দেব। কী প্রশ্ন, বলুন?’

‘প্রথমত’, দময়ন্তী একটু ভেবে জিজ্ঞেস করল, ‘আপনার শ্বশুর-শাশুড়ি কি জীবিত?’

‘শাশুড়ি নেই। শ্বশুর কাশীবাসী, আমার বিয়ের আগে থেকেই।’

‘আপনার স্বামীর ভাই-বোন কজন? তাদের ছেলেপুলে ক-টি?’

‘ওঁরা দু-ভাই, এক বোন। বিভাসের বড়ো এক দাদা ছিলেন, প্রভাস হালদার। মারা গেছেন। তাঁর একটিই ছেলে, নাম প্রকাশ। যাদবপুরে থার্ড ইয়ারে পড়ে। লেখাপড়ায়

ভালো ছেলে। ওর কাকার মতো মস্ত বড়ো ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। আর বোন, মানে তন্দ্রা। বিয়ে থা করেনি, লেখাপড়া নিয়েই আছে। ও এখন ভুবনমোহিনী কলেজের লেকচারার।'

'আপনার সঙ্গে এই ভাসুরপোর সম্পর্ক কেমন?'

একটু চুপ করে থেকে মালবিকা বললেন, 'ভালো নয়। আমাকে সহ্য করতে পারে না। আড়ালে নাকি আমাকে ডাইনি বলে।'

'আপনার প্রতি ওর রাগের কোনো কারণ কি আপনি অনুমান করতে পারেন? কাকার সম্পত্তির আপনি একজন ভাগীদার, তাই কি?'

'তা হতে পারে। অসম্ভব নয়।'

'আপনার বাবার বয়স এখন কত, যদি বেঁচে থাকেন?'

'পঁয়ষট্টির কাছাকাছি হবে। সঠিক বলতে পারব না।'

'আপনার ছেলেপুলে হবে না যে বললেন, সেটা জানতে পারলেন কী করে? কোনো ডাক্তার দেখিয়েছিলেন?'

'নিশ্চয়ই! আমরা দুজনেই দেখিয়েছিলুম।'

'দুজনেই? বাঃ, আপনার স্বামী তো খুব বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন লোক। সাধারণত এরকম হয় না। কাকে দেখিয়েছিলেন?'

'একজনকে দেখাইনি। আমি দেখিয়েছিলুম ডাঃ মৃণালিনী করের কাছে আর উনি ডাঃ কেশবনের কাছে।'

'ডাঃ মৃণালিনী কর, মানে সুভাষচন্দ্র সেবাসদনের ভিজিটিং ডাক্তার? কী বললেন তিনি? বললেন যে আপনিই...'

'হ্যাঁ', মিসেস হালদারের গলাটা অত্যন্ত করুণ শোনাল, 'আমি বন্ধ্যা।'

লজ্জিত ও দুঃখিত মুখে দময়ন্তী কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর আবার প্রশ্ন করল, 'একজনকেই দেখাননি কেন?'

'কোনো পুরুষ ডাক্তারের কাছে এ ব্যাপারে নিজেকে পরীক্ষা করাতে ভয়ানক লজ্জা করেছিল।' বলতে বলতে কান দুটো লাল হল মালবিকার।

'ডাক্তার কর তো হাজরায় বসেন জানি। ডাক্তার কেশবন কোথায় বসেন? উনি কি গাইনোকোলজিস্ট?'

'নিশ্চয়ই। এম.বি.ডি.জি.ও। মাদ্রাজের লোক কিন্তু তিনপুরুষই কলকাতায়। প্রায় বাঙালিই হয়ে গেছেন। বসেন আমাদের পাড়াতেই, নিউ আমেদপুর, বি ব্লকে। আমার যখন ইউটেরাসের একটা গণ্ডগোল হয়, তখন উনিই চিকিৎসা করেছিলেন। আমার স্বামী ওঁকে নিয়ে আসেন। ভারি ভালো লোক। আমাকে খুব পছন্দ করেন।'

'আপনার এই অসুখটা কতদিন আগে হয়েছিল?'

'তা, বছর খানেকের ওপর হবে।'

'ডাক্তার মৃণালিনী কর কি আগে আপনার কোনোদিন চিকিৎসা করেছেন?'

'হ্যাঁ, করেছেন। আমরা তালতলায় থাকতে উনি আমাদের পারিবারিক ডাক্তার ছিলেন। তখন সদ্য পাশ করে বেরিয়েছেন। পরে বিলেতে গিয়ে এম.আর.সি.ও.জি হয়ে আসেন।

তখন আমার বিয়ে টিয়ে হয়ে গেছে।'

'আচ্ছা, আপনারা কি একই দিনে ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলেন পরীক্ষা করাতে?'

'না। একদিন হঠাৎ উনি এসে বললেন যে, তার দিন সাতেক বাদে আমাকে উনি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবেন, এবং নিজেকেও দেখাবেন। আমি তো ভীষণ লজ্জা পেয়ে গেলুম। তার পরদিনই গেলুম মৃণালিনীদির কাছে। উনি আমাকে পরীক্ষা করে যে রিপোর্ট দিলেন, সেটা এনে ওঁকে দেখালুম। উনি প্রথমে আমাকে খুব সান্ত্বনা দিলেন। তারপর বললেন, ডাঃ কেশবনের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট যখন করেই ফেলেছি, তখন যাই, আমিই একবার ঘুরে আসি। তোমার আর যাবার দরকার নেই। অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখতে উনি একাই গিয়েছিলেন, আমি সেদিন যাই-ই নি।'

'ডাক্তার কেশবন কী বললেন?'

মাথা নীচু করে লজ্জিত কণ্ঠে মালবিকা বললেন, 'কী আবার বলবেন? আমি জানি না।'

'এবার শেষ প্রশ্ন। আপনার জামাইবাবু আত্মহত্যা করেছিলেন কেন? তার কারণ কি কিছু জানা গেছিল?'

'হ্যাঁ। উনি কী-একটা কলিকের রুগি ছিলেন। যখন ব্যথা উঠত, দু-হাতে পেট চেপে ধরে সারা ঘরের মেঝেয় ছটফট করে গড়াতেন আর চিৎকার করতেন। ব্যথা চলে যাওয়ার দিন সাতেক পরেও অসম্ভব মনমরা আর খিটখিটে হয়ে থাকতেন, খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে দিতেন, কেউ কাছে গেলে তাড়া করে যেতেন। আত্মহত্যা করার মাস পাঁচ-ছয় আগে থেকেই ওঁর অসুখটা ভয়ানক বেড়ে যায়। প্রায়ই বলতেন, আমি না মরলে এই যন্ত্রণার হাত থেকে উদ্ধার পাব না।'

'তখন ওঁর চিকিৎসা করতেন কে?'

'মৃণালিনীদি।'

হঠাৎ খুব ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ালেন মিসেস হালদার। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই রে! ভয়ানক দেরি হয়ে গেল আমার। এখন আবার আকবর হোটেলে একটা পার্টি আছে। আমি এবার যাব, কেমন? কিছু মনে করবেন না যেন। কিন্তু আপনার সাহায্য আমি পাব তো, মিসেস দত্তগুপ্ত?'

দময়ন্তী শান্ত গলায় বলল, 'দু-দিন পরে আসবেন মিসেস হালদার। আমি একটু ভেবে দেখি। কিন্তু এক্ষুনি উঠবেন কি? একটু বসুন। আমি চট করে কফিটা করে নিয়ে আসি। জল বোধ হয় অনেকক্ষণ ফুটে গেছে।'

দরজাটা বন্ধ করে দময়ন্তীর পাশে এসে বসল সমরেশ। দময়ন্তী জিজ্ঞেস করল, 'কী বুঝলে?'

হাত নেড়ে সুর করে সমরেশ বলল,

'পাটনী কহিল আমি বুঝিনু সকল।

যেখান কুলীন জাতি সেখানে কোন্দল।।'

দময়ন্তী হেসে বলল, 'যা বলেছ। দুনিয়ার সকলের পেডিগ্রি নিয়ে ভয়ানক চিন্তিত ভদ্রমহিলা। কে কুলীন, কার কত টাকা, কার কী ডিগ্রি, সব নখাগ্রে। কলকাতার আদি

বাসিন্দাদের এটা বোধ হয় একটা বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এসব বাদ দাও। আর কী বুঝলে?'

সমরেশ বলল, 'আর বুঝলুম, এটা একটা অতি যাচ্ছেতাই কেস। ভদ্রমহিলা তাঁর জীবনকাহিনী যা শোনালেন, তার সবটাই অর্থহীন। আরে, আসল ব্যাপার হল, তিনি ব্ল্যাকমেলড হচ্ছেন। কে ব্ল্যাকমেল করছে? জানি না। কেন করছে? জানি, কিন্তু বলব না। কোথায় করছে? পুনরায় জানি, কিন্তু বলব না। কিন্তু আমায় বাঁচান! দূর, দূর! এখানে কেন বাপু? কোনো গনৎকারের কাছে যা-না, উপকার পাবি!'

দময়ন্তী বলল, 'তোমার রাগ করাটা স্বাভাবিক। কিন্তু এমন কতগুলো কথা থাকে, যা কোনো মেয়ে অন্য কোনো মেয়েকেও বলতে পারে না লজ্জায়। আর যতই সাজগোজ করুন আর পার্টি এবং ফ্যাশন প্যারেডে যান না কেন, ভেতরে ভেতরে ইনি তো দেখলুম একটি একেবারে খাঁটি বাঙালি মেয়ে। একদিকে যেমন স্নেহে, সংশয়ে, ভালোবাসায় কোমল, অন্যদিকে প্রিয়জনকে অমঙ্গল থেকে বাঁচানোর জন্য সবরকম নীতিজ্ঞান বিসর্জনেও প্রস্তুত। তবে যে কথাটা চট করে ধরা যায় না, তা হচ্ছে, উনি যে গল্পটা বললেন তার মধ্যে অন্তত চারটে অসম্পূর্ণ সত্য বা পূর্ণ মিথ্যে কথা আছে। প্রায় বিশ্বাসযোগ্য করেই বলেছেন, কিন্তু ফাঁকাগুলো যে ধরা যায় না তা নয়। যদি এই ক-টা ফাঁক পূর্ণ করতে পারি, তবে হয়তো পুরো ব্যাপারটাই সমাধান করা যাবে।'

সমরেশ হতাশভাবে বলল, 'কী জানি, এতগুলো ফাঁকফোকর যে তুমি কোত্থেকে দেখছ, তুমিই জানো। আমার সামনে তো বিরাট নিরেট অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নেই। আর সেই অন্ধকার ভেদ করবার জন্য তুমি যে চিন্তা করবে, সেটা নেহাত সময় নষ্ট হবে। কারণ, ভদ্রমহিলা যদি তোমায় সব ইনফরমেশন না দিয়ে উলটে আবার কতগুলো মিথ্যে কথা বলে থাকেন, তাহলে লেট হার গো টু হেল। আমরা বরং চলো একটা নাইট শোতে সিনেমা দেখে আসি। চিত্তটা প্রফুল্ল হবে।'

দময়ন্তী হেসে ফেলল। বলল, 'শান্ত হও। ভদ্রমহিলার সত্যিই ভয়ানক বিপদ। আমি যদি সম্ভব হলেও সাহায্য না করে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকি, তবে যে সেটা আমার অত্যন্ত অপরাধ হবে গো। কী জানো? ভদ্রমহিলার গল্পটা শুনে আমার আদ্যিকালের আদম আর ঈভের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। ঈশ্বরের কথা না শুনে সর্পরূপী শয়তানের প্রলোভনে পড়ে যে পাপ ঈভ করেছিল, তার জন্য তারা দুজনে যে শুধু ইডেনের বাগান থেকে বিতাড়িত হয়েছিল তাই নয়, যুগযুগান্তর ধরে সেই পাপ আজও আমাদের কলুষিত করে রেখেছে। সেই পাপ আজও আনাচেকানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রলোভনের বিষ অন্তরে লুকিয়ে।'

দময়ন্তীর কথা মাঝপথে বন্ধ করে দিয়ে আবার দরজার বেল বেজে উঠল। সমরেশ দরজা খুলেই চেঁচিয়ে উঠল, 'এই যে সর্পপ্রবর! আয় আয়।'

শিবেন সেন ঘরে ঢুকে ভুরু কুঁচকে বলল, 'সর্পপ্রবর! তার মানে?'

সমরেশ বলল, 'মানে কিছুই নেই। কিন্তু বলি বাপু হে! আমাদের স্বামী-স্ত্রীর এই ইডেন গার্ডেনে তুমি যে সব ডেঞ্জারাস টিম পাঠাচ্ছ, সেটা কি ঠিক হচ্ছে? আমি অবশ্য প্রলুব্ধ হব না বলেই প্রতিজ্ঞা করে বসে আছি।'

শিবেন আরও অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ডেঞ্জারাস টিম? কী বলছিস কী তুই?'

দময়ন্তী বলল, 'বুঝলেন না? ও মিসেস মালবিকা হালদারের কথা বলছে। বিকেলবেলা এসেছিলেন, একটু আগে গেলেন।'

জিভ কেটে চোখ কপালে তুলে শিবেন বলল, 'কী সর্বনাশ! এসে গেছেন এর মধ্যেই? আমি তো তাঁর কথাই বলতে আসছিলুম।'

সমরেশ আঙুল তুলে চেঁচিয়ে উঠল, 'যথারীতি পুলিশ! অপদার্থ, অকর্মণ্য, লেট লতিফ পুলিশ!'

শিবেন বলল, 'তুই থামবি? বউদি আপনি বলুন তো, কিছু বললেন ভদ্রমহিলা? তাঁর তো ভয়ানক বিপদ।'

সমরেশ থামল না, বলল, 'বললেন মানে? একঘণ্টা ধরে বললেন। তাঁর জীবনকাহিনি শোনালেন আমাদের। তার মধ্যে আবার একগাদা মিথ্যে কথা। আর এই ভদ্রমহিলাকে দেখ। আমি যখন একটা আধসিকি মিথ্যে কথা বলি, তক্ষুনি খুব মোটা গলায় অভিযোগ হয়, তোমরা পুরুষরা ভয়ানক মিথ্যেবাদী। আর একজন ভদ্রমহিলা একঘণ্টা ধরে এক ঝুড়ি মিথ্যে কথা বলে গেলেন, তার বেলায়, নাঃ, ওঁর যে ভীষণ বিপদ, আমাকে সাহায্য করতেই হবে। কেন রে বাপু? মেয়েছেলেদের এই স্বজাতিপ্রীতি খুব খারাপ লাগে আমার।'

দময়ন্তী মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হেসে উঠল। ছদ্মগাম্ভীর্যের সঙ্গে মাথা নেড়ে শিবেন বলল, 'ঠিক, ঠিক, এ ব্যাপারে আমি তোর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। আর বুঝলেন বউদি, আপনাদের উনি কী বলেছেন জানি না, আমাকে খালি বলেন, আমায় একজন ব্ল্যাকমেল করছে, আমাকে বাঁচাও। ব্যস, আর কিছু না। তা দেখলুম, একজন সুন্দরী মহিলা, বিপদে পড়েছেন, অথচ আমাকে সবকথা খুলে বলতে সংকোচও অনুভব করছেন। তখন দিলুম আপনার নাম করে। তা ডিটেল কিছু বলেছেন নাকি?'

দময়ন্তী বলল, 'বলেছেন বটে, তবে সবটা নয়। আমার কাছেও লজ্জা পেয়েছেন। যা বলেছেন, আপনাকে বলি, শুনুন।'

সমস্ত গল্পটা গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনল শিবেন। শেষ হলে বলল, 'এর মধ্যে ভয়ানক লজ্জাকর কী ব্যাপার লুকিয়ে থাকতে পারে, আমি তো বুঝে উঠতে পারছি না। তবে হ্যাঁ, থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। বলুন এবার, আপনি কদ্দূর কী বুঝলেন?'

দময়ন্তী বলল, 'দাঁড়ান। আগে একটু ভাবি। গল্পটার মধ্যে কতগুলো ফাঁক আছে। সেগুলো ঠিকমতো ভরাট না করলে, আসল সত্যটা ধরা যাবে না।'

সমরেশ বলল, 'হ্যাঁ, সেই ভালো। তুমি ততক্ষণ চিন্তা করো, আমরা বরং দাবা নিয়ে বসি।'

দময়ন্তী বলল, 'তা বসো। কিন্তু তার আগে শিবেনবাবুকে চা খাওয়ানো দরকার। আমি এক্ষুনি করে নিয়ে আসছি।'

প্রায় একঘণ্টা পরে শোবার ঘর থকে বেরোল দময়ন্তী। চোখ দুটো উত্তেজনায় উজ্জ্বল।

শিবেন আর সমরেশ বাহ্যজ্ঞানলুপ্ত হয়ে দাবা খেলছিল। দময়ন্তী পাশে এসে দাঁড়াতে দুজনে এমনভাবে চোখ তুলে তাকাল, যেন এর আগে আর কোনোদিন ওকে দেখেনি। সমরেশ অবশ্য স্ত্রীর চোখের দিকে তাকিয়ে চট করে ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করে ফেলল। বলল, 'সমাধান হয়ে গেছে, মনে হচ্ছে?'

শিবেন তাড়াতাড়ি দাবার বোর্ড গুটিয়ে ফেলল। দময়ন্তী বলল, 'মনে হচ্ছে তো। কিন্তু তার আগে, ব্ল্যাকমেলের একটা চিঠি পেলে হত।'

শিবেন বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার কাছে একটা চিঠি আছে। ভীষণভাবে সেন্সর করে মিসেস হালদার দিয়েছেন আমাকে যদি ফিঙ্গারপ্রিন্ট-ট্রিন্ট কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু ওই সেন্সর করতে গিয়ে সে সব ফিঙ্গারপ্রিন্টের চোদ্দোটা বাজিয়ে ছেড়েছেন, সে কথা আর বলিনি মহিলাকে।' বলে পকেট থেকে ভাঁজ করা কাগজ বের করে দময়ন্তীর হাতে দিল।

চিঠিটা খুলে দময়ন্তী বলল, 'একী? এটা তো প্রিন্ট করা চিঠি দেখছি, টাইপ করা তো নয়!'

সমরেশ দময়ন্তীর হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে দেখে বলল, 'না, এটা টাইপ করাই। ইলেকট্রিক টাইপরাইটারে লেখা হয়েছে। টাইপরাইটারের মেক বোধ হয় স্ট্যান্ডার্ড প্রিন্সটন — আমেরিকায় তৈরি। মোটামুটি পুরোনো। যে টাইপ করেছে সে প্রফেশনাল টাইপিস্ট নয়, তবে শিক্ষিত লোক।'

শিবেন আর দময়ন্তী দুজনেই হাঁ করে সমরেশের দিকে তাকিয়ে ছিল। সমরেশ থামতেই শিবেন বলে উঠল, 'সাবাস! এবার লোকটার নাকের বাঁ-পাশে একটা আঁচিল আছে কিনা বলে ফেল, তাহলেই ল্যাঠা চুকে যায়। ব্যাপারটা কী? তোর মগজেও কি আজকাল ডিডাকটিভ লজিক উঁকিঝুকি মারতে শুরু করেছে নাকি?'

দময়ন্তী বলল, 'সত্যি! ভারি আশ্চর্য! তোমার জীবনে আনন্দ তো দুটি। এক খেলা দেখা, আর অন্যটা হল বিকট বিকট অঙ্ক কষা। বলি, সেসব ছেড়ে টাইপরাইটারের ব্যবসা ধরলে নাকি?'

লজ্জিতভাবে ঘাড় চুলকে সমরেশ বলল, 'ইয়ে, মানে, আসলে ব্যাপারটা খুব সোজা। ইলেকট্রিক টাইপরাইটারের লেখা এরকম প্রিন্ট বলেই মনে হয়। আমাদের অফিসে এরকম টাইপরাইটার আছে কিনা গোটা ছয়েক। আর আমার সেক্রেটারি যে মেশিনটা ব্যবহার করে তার টাইপ আর এর টাইপ একদম এক ছাঁদের। তাতেই মেকটা আন্দাজ করলুম। পুরোনো বললুম, কারণ দেখ পি লেটারটা ভাঙা, সহজেই চোখে পড়ে। তবে যে টাইপ করেছে, সে যে প্রফেসনাল টাইপিস্ট নয়, তার কারণ চিঠিটা লেখা হয়েছে কাগজটার একদম ওপরে, নীচে একগাদা সাদা জায়গা পড়ে রয়েছে। প্রফেশনাল টাইপিস্ট কক্ষণও এরকম করে না। একটা ছোটো চিঠিও একটা বড়ো কাগজে এমনভাবে ধরাবে যে লেখাটা আর কাগজের সেন্টার অব গ্র্যাভিটি এক হয়ে যাবে। আমি অফিসে চাকরি করি, তাই এটা আমার পক্ষে ধরা সহজ। ও কলেজে পড়ায়— ও ধরবে কোত্থেকে?'

দময়ন্তী জিজ্ঞেস করল, 'আর লোকটি যে শিক্ষিত, সেটা বুঝলে কী করে? কোনো বানান ভুল, কাটাকুটি নেই, তাই?'

'ঠিক তাই। দিব্যি পরিষ্কার টাইপ করা।'

দময়ন্তী বলল, 'যাক, তুমি আমার যে কী উপকার করলে, কী বলব! চিঠিতে ফিঙ্গারপ্রিন্ট পেলুম না বটে, কিন্তু তার বদলে যা পেলুম, তাতে করে ব্ল্যাকমেলারটিকে পাকড়াও করা বোধ হয় সহজ হবে।'

'বলো কী? ব্ল্যাকমেলারটি কে ধরে ফেলেছ? ওই হতচ্ছাড়া ভাসুরপোটি নিশ্চয়ই? ব্যাটার খুড়োর সম্পত্তির ওপর খুব লোভ। আমি গোড়াতেই বুঝেছি।'

'না, ভাসুরপোটি হতেই পারে না। সে বেচারি নির্দোষ।'

শিবেন বলল, 'না, না, অমন মাঝখান থেকে বলবেন না। গোড়া থেকে বলুন।'

দময়ন্তী বলল, 'দেখুন, আমাদের সামনে প্রশ্ন চারটে। প্রথমত, কেন ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, কোন লুকোনো অপরাধের জন্য ব্ল্যাকমেল হতে হচ্ছে ভদ্রমহিলাকে। তৃতীয়ত, কে ব্ল্যাকমেল করছে এবং চতুর্থত, সে অপরাধটির সংবাদ পেল কী করে।

'প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, ব্ল্যাকমেলের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, টাকা শোষণ করা। যদি দত্তক নেওয়া বন্ধ করাই উদ্দেশ্য হত, তাহলে সে উদ্দেশ্য সফল হলেও মাসে মাসে টাকা চেয়ে পাঠানো হত না। ভদ্রমহিলার যে ধারণা, দত্তক নেওয়া বন্ধ করবার জন্যই চিঠি লেখা হচ্ছে, তার কারণ, দত্তক নেওয়ার কথা তাঁরা ঘোষণা করবার ঠিক পরে পরেই প্রথম চিঠিটা আসে, তাই। সেটা কিন্তু সমাপতন। গল্পটা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, যদিও চিঠিটার ওই সময়ে আসাটা স্বাভাবিকভাবেই হয়েছে, তাহলেও দত্তক নেওয়ার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। ভদ্রমহিলা যে তাঁর ভাসুরপোটিকে প্রচ্ছন্ন সন্দেহ করেন, সেটা নিতান্তই অমূলক।

'এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন। আচ্ছা, কী কী কারণে একজন বিবাহিতা ভদ্রমহিলা ব্ল্যাকমেলড হতে পারে? বিয়ের আগে লেখা প্রেমপত্র, প্রতিহিংসাপরায়ণ কোনো পূর্বপ্রেমিক স্বয়ং, অত্যন্ত গুরুতর কোন প্রাকবিবাহ অপরাধ, যেমন খুন টুন অথবা অন্য কিছু, এই তো?

'প্রাকবিবাহ প্রেম, প্রেমপত্র বা প্রেমিক স্বয়ং এই ব্ল্যাকমেলিংয়ের কারণ হতে পারে বলে আমার কিছুতেই মনে হয় না। তার কারণ, ভদ্রমহিলা যে সমাজে ঘোরাঘুরি করেন, সেখানে বিয়ের আগে প্রেম অতি তুচ্ছ ব্যাপার এবং পূর্বপ্রেমিকের অস্তিত্ব কোনো একটা সমস্যাই নয়। তাও হয়তো এ ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দেওয়া যেত, যদি জানতুম যে ভদ্রমহিলার স্বামী খুব রক্ষণশীল, নেহাত চাকরির খাতিরে বা হঠাৎ পয়সার গরমে এ হেন সমাজে মিশতে বাধ্য হচ্ছেন। এ দুটোর কোনোটাই ঘটনা নয়। ভদ্রলোক বনেদি বড়োলোক, এবং যাঁর স্ত্রী এমন মারাত্মক রূপ আর পোশাক আশাক নিয়ে একা একা রাত্রিবেলা পার্টিতে যান, তাঁকে আর যাই বলুন না কেন, রক্ষণশীল কিছুতেই বলতে পারেন না। আচ্ছা, সমরেশ! তুমি তো ডাক্তার হালদারকে খুব কাছ থেকে দেখেছ। কীরকম লোক উনি?'

সমরেশ বলল, 'অতিশয় ডেঞ্জারাস! অর্থপিশাচ, পাঁড় মাতাল, প্রচণ্ড স্বার্থপর আর যাকে বলে ভয়ানক নারীলোলুপ। কিন্তু দুর্দান্ত কাজের লোক, চেহারাটি কন্দর্পের মতো আর কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ একজন দিকপাল। লোকটা অদ্ভুত। ভূতের মতো খাটতে পারে, কোনো মেয়েকে পগাবার জন্য বছরের পর বছর পেছনে লেগে থাকতে পারে, বেস্পতিবার মাল ফুরিয়ে গেলে পৃথিবীর অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে এক পেগ হুইস্কির আশায়। আর লোকে বলে, গত বছর ওঁর কারখানায় যে গণ্ডগোল হয়েছিল, তার দুজন লেবার লিডার নাকি এখন ওঁর একতলার বসবার ঘরের বড়ো বড়ো দুটো সোফার নীচে মাটির তলায় পোঁতা অবস্থায় আছেন। তবে এ ব্যাপারে, বিশেষ কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ আমি পাইনি। শিবেন হয়তো কিছু বলতে পারে।'

শিবেন বলল, 'অসম্ভব কিছু নয়। লোকটা সত্যি অতি সাংঘাতিক ক্যারেক্টার। যাই হোক, একটা কথা বোঝা যাচ্ছে যে, ওসব পূর্বপ্রেমিক ফ্রেমিক কিছু নয়। অপরাধটা তাহলে কী?'

দময়ন্তী বলল, 'সেটা বোঝা যেতে পারে, যদি ভদ্রমহিলা তাঁর গল্পের মধ্যে যে গোটাচারেক অসত্য বা অর্ধসত্য কথা বলেছেন, সেগুলো আলোচনা করা যায়।

‘প্রথম অর্ধসত্য হচ্ছে, ভদ্রমহিলার বাবার সন্তানসম্ভবা বড়োমেয়েকে নিয়ে সপরিবারে বম্বে যাওয়ার কারণ হিসেবে যা বলা হয়েছে। মানুষের বন্ধুত্ব বা ভালোবাসা পাওয়ার জন্য ওই অবস্থায় মেয়েকে নিয়ে ট্রেনে চড়ে, কেউ বারো-শো মাইল পাড়ি দেয় না। তার ওপর ভদ্রলোকের আর্থিক অবস্থা তখন খুব স্বচ্ছল ছিল বলা চলে না, কারণ একটা ডিস্ট্রিক্ট টাউনের কলেজে লেকচারারের চাকরি করে উনি যে বিরাট টাকা পয়সা জমিয়েছিলেন, তা কোনোমতেই মনে হয় না। অতএব বম্বে যেতে ওঁকে নিশ্চয়ই ধার দেনা করতে হয়েছিল। আর ভারুচার সঙ্গে ওঁর গভীর প্রণয় ছিল সেটাও খুব বিশ্বাসযোগ্য কথা নয়। ডাঃ ভারুচা পার্শি, খাস বম্বের লোক, খ্যাতনামা ডাক্তার, ব্যস্ত মানুষ। তাঁর সঙ্গে পুণা থেকেও কয়েক মাইল দূরের একটা ছোট্ট কলেজের ইংরেজি ভাষার বিদেশি এক অধ্যাপকের সঙ্গে পরিচয় হওয়াই তো কষ্টকর, ঘনিষ্ঠতা তো দূরের কথা। অতএব এটা ধরেই নেওয়া যেতে পারে, ভদ্রলোকের বম্বে যাওয়ার অন্য কারণ ছিল। আসল উদ্দেশ্য ছিল প্রকাণ্ড একটা শহরে হারিয়ে যাওয়া, যেখানে তাঁকে কেউ চেনে না, অথচ সে অঞ্চলের আদবকায়দা, ভাষাটাষা তাঁর অজানা নয়।’

শিবেন বিস্ফারিত চোখে বলল, ‘তার মানে আপনি বলতে চাইছেন যে সন্তান সম্ভাবনাটা তাঁর বড়োমেয়ের নয়— ছোটো মেয়েরই? কী সর্বনাশ!’

দময়ন্তী বলল, ‘ঠিক তাই। আট-ন-মাস বাদে ভদ্রলোক যখন নাতি কোলে ফিরে এলেন, তখন কেউ জিজ্ঞাসাই করল না ছেলেটি কার। তখন সে প্রশ্ন ওঠেই না।’

সমরেশ বলল, ‘হুঁ, মালবিকার এত আতঙ্কের কারণ এইবার বোঝা যাচ্ছে। বিভাসকুমার যদি জানতে পারেন যে বিবাহের সময় তাঁর ধর্মপত্নী যাকে বলে ভার্গো ইনট্যাক্টা ছিলো না, তাঁকে মোটামুটি ঠকানো হয়েছে, তাহলে তাঁর বসবার ঘরের জন্য আরেকটা বড়ো সোফার অর্ডার দেওয়ার হাত থেকে কেউ তাঁকে ঠেকাতে পারবে না।’

দময়ন্তী বলল, ‘তা ছাড়া আমার সন্দেহটা যে অমূলক নয়, তার প্রমাণ ভদ্রমহিলার আর একটা মিথ্যে কথা। সেটা হচ্ছে, মিস্টার হালদারের প্রবীরকে দত্তক গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ।

‘কত বয়েস হবে মিস্টার হালদারের? চল্লিশ বা আরও কম? মাত্র ছ-সাত বছর হল বিয়ে হয়েছে। জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করার জন্যে দৌড়ে বেড়াচ্ছেন— তা সে টাকা রোজগারের জন্যই হোক আর মেয়েদের পেছনেই হোক। ছেলেপুলে হয়নি তো কী হয়েছে? সময় তো চলে যায়নি। অনেকের তো বিয়ের দশ-বারো বছর পরেও ছেলেপুলে হয়। ঠিক এই সময় মিস্টার হালদারের মতো লোক দত্তক নেওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠবেন— সেটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক। আসলে মালবিকার মাতৃস্নেহ এখানে একটা খুব শক্তিশালী ফ্যাক্টর। প্রথমত তিনি চান প্রবীরকে ওয়ান্স অ্যান্ড ফর অল নিজের ছেলে হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং দ্বিতীয়ত সেটা চান যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। যে সুযোগ কোনোদিন আসবে বলে তিনি কল্পনাও করেননি, সেই সুযোগই আজ উপস্থিত। এই দিনটির জন্যই বোধ হয় বিয়ের বছর খানেক পর থেকেই তিনি সমানে স্বামীর কানে মন্ত্রণা দিয়ে গেছেন আস্তে আস্তে। কী মন্ত্রণা তিনি দিয়েছেন আমি জানি না, কিন্তু তাঁর চেষ্টা যে সার্থক হয়েছে তা তো দেখতেই পাচ্ছি।

‘কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে, দত্তক নেওয়ার জন্য অত সাততাড়াতাড়ি চেষ্টা কেন করছিলেন ভদ্রমহিলা? তার উত্তর হল, তাঁর ভয় ছিল যদি ওঁর আবার কোনো ছেলেপুলে হয়, তাহলে প্রবীরকে যে সামাজিক প্রতিষ্ঠা তিনি দিতে চাইছেন, সেটা আর সম্ভব হবে না। কিন্তু আজ উনি বুঝতে পেরেছেন যে সে সম্ভাবনা একেবারেই নেই। কারণ তাঁর স্বামীটি একজন ক্যাসানোভা।’

সমরেশ বলল, 'অর্থাৎ তিনি একজন দুর্ধর্ষ প্রেমিক, কিন্তু সন্তানের জন্মদানে অক্ষম?'

দময়ন্তী লজ্জিতভাবে বলল, 'হ্যাঁ, মানে ব্যাপারটা অনেকটাই সেই রকমই। কিন্তু ভদ্রমহিলার এই আবিষ্কারই তাঁকে ব্ল্যাকমেলারের হাতে ঠেলে দিয়েছিল।'

শিবেন বলল, 'তাহলে আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন "কোন অপরাধের ফল এই ব্ল্যাকমেলিং" তার সমাধান হয়ে গেল। এবার তৃতীয় প্রশ্ন, এই ব্ল্যাকমেলারটি কে?'

'সেটা বোঝা যাবে ভদ্রমহিলার তৃতীয় মিথ্যেটা নিয়ে আলোচনা করলে। উনি বলেছেন, দত্তক নেওয়ার চূড়ান্ত ডিসিশন নেওয়ার আগে ওঁরা যে একসঙ্গে একই ডাক্তারের কাছে যাননি, তার কারণ এ বিষয়ে কোনো পুরুষ ডাক্তারের কাছে যাওয়ার লজ্জা তাঁকে বাধা দিয়েছিল। এটা ডাহা মিথ্যে কথা। কারণ, এর আগে তার যে রোগের জন্য পুরুষ ডাক্তার চিকিৎসা করেছিলেন, তার বেলায় যদি লজ্জা না করে থাকে, তবে এর বেলায়ও লজ্জা হবার কোনো কারণ নেই। লজ্জাটা এ ব্যাপারেই নয়। আসলে ওই পরীক্ষার ফল কী হবে, তা তাঁর থেকে ভালো আর কেউ জানে না। কাজেই তাঁকে যেতে হল তাঁর বিশ্বাসভাজন একজন ডাক্তারের কাছে, যিনি তাঁর মনোমতো একটা সার্টিফিকেট দিতে আপত্তি করবেন না। তিনি আশা করেছিলেন, এই সার্টিফিকেট দেখালে আর কোনো পরীক্ষা টরীক্ষার ঝামেলা থাকবে না।'

সমরেশ বলল, 'ঠিক ক্লিয়ার হল না। যদি দুজনে একসঙ্গে যেতেনও তাহলেই বা কী হত? প্রমাণ হত যে ভদ্রলোকের বাবা হবার সম্ভাবনা নেই, কিন্তু ভদ্রমহিলার মা হবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু একহাতে যখন তালি বাজে না, তখন দুজনকে নিঃসন্তানই থাকতে হবে এবং দত্তক নিতে কোনো বাধা হবে না। এতে অসুবিধেটা হচ্ছে কোথায়?'

'অসুবিধে আছে নিশ্চয়ই। দেখ, মালবিকার মানসিকতাটা বোঝার চেষ্টা করো। তিনি তাঁর স্বামীকে যেমন ভয় করেন, তেমনি হাজার দোষ থাকলেও বোধহয় ভালোও বাসেন। ভালোবাসেন কারণ খানিকটা কৃতজ্ঞতাবোধ, খানিকটা অন্য কিছু। ভয় করেন কারণ জানেন উনি অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং হিংস্র প্রকৃতির লোক, ক্ষেপে গেলে যে পাঁক থেকে পদ্ম তুলে এনেছেন, আবার সেই পাঁকেই ছুড়ে ফেলে দিতে দ্বিধা করবেন না। কাজেই উনি এমন কিছু কিছুতেই করতে চান না, যা তাঁদের বর্তমান স্ট্যাটাস ক্যুয়ো নষ্ট করে দিতে পারে।

'এখন আমরা জানি, ভদ্রলোক একজন উঁচুদরের খেলোয়াড়— যাকে ইংরেজিতে বলে "প্লে বয়"। কাজেই স্বভাবতই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে তাঁর পৌরুষের প্রচণ্ড একটা অভিমান আছে। সেক্ষেত্রে তিনি যদি তাঁর অক্ষমতার কথা জানতে পারেন, তাহলে তিনি যে কী মূর্তি ধরবেন, মালবিকার তা জানা ছিল না। কাজেই তিনি চেষ্টা করলেন ডাক্তার মৃণালিনী করের কাছ থেকে তাঁর বন্ধ্যাত্বের সার্টিফিকেট দাখিল করে বিভাসকুমারকে ডাক্তারের কাছে যাওয়া বন্ধ করতে। অবশ্য তাঁর আশঙ্কাটা ছিল অমূলক। খেলোয়াড় বিভাসকুমার খেলোয়াড়ি মনোভাবেই ডাক্তার কেশবনের রিপোর্টটা নিয়েছিলেন।'

শিবেন বলল, 'ব্যাপারটা তাহলে এইবার একটু পরিষ্কার হচ্ছে। মালবিকার অতীত কলঙ্কের কাহিনি জানা থাকবার কথা দুজনের। একজন ওঁর বাবা, অন্যজন তাঁদের সে সময়কার পারিবারিক ডাক্তার মৃণালিনী করের। ওঁর বাবাকে স্বচ্ছন্দে বাদ দেওয়া যেতে পারে। বাকি থাকেন ডাক্তার কর। ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই তাঁর কাছে গিয়ে কেঁদে পড়েছিলেন, এবং ডাক্তার করও এই সুযোগ হেলায় হারাতে রাজি হননি। কি বলেন?'

সমরেশ বলল, 'এখন কর্তব্য হচ্ছে, একবার ওঁর চেম্বারে গিয়ে কায়দা করে টাইপরাইটারটা দেখে আসা।'

দময়ন্তী হেসে বলল, 'হ্যাঁ, দেখে আসা কর্তব্য বই কী। তবে আরও একজন সন্দেহভাজন চরিত্র আছেন। তাঁকে বাদ দিলে তো চলবে না।'

সমরেশ বলল, 'এই মরেছে! তিনি আবার কিনি?'

'ডাক্তার কেশবন।' দময়ন্তী বলল।

'ডাক্তার কেশবন!' শিবেন আশ্চর্য হয়ে বলল, 'কিন্তু তিনি তো... যাই হোক, তাঁকে আপনার সন্দেহের কারণটা কী? তার পক্ষে কি মালবিকার অতীত কলঙ্কের কথা জানা সম্ভব? তিনি তো ভদ্রমহিলাকে বোধ হয় দু-তিন বারের বেশি দেখেনই-নি। অবশ্য যদি তাঁর সঙ্গে ডাক্তার করের পূর্বপরিচয় থেকে থাকে সে আলাদা কথা।'

দময়ন্তী বলল, 'জানা সম্ভব। ডাক্তার করের সঙ্গে পূর্বপরিচয় থাকারও দরকার থাকে না। প্রকৃতপক্ষে, ডাক্তার কেশবন যখন প্রথম মালবিকাকে পরীক্ষা করেন, তখনই তিনি জানতে পারেন যে অতীতে কখনও কোথাও তিনি একটি শিশুর জন্ম দিয়েছিলেন। কিন্তু তখন তিনি পরিবারটিকে ভালো করে জানতেন না, কাজেই বোধ হয় ভেবেছিলেন যে সে শিশুটি হয়তো জন্মে মারা গিয়েছিল বা বর্তমানে বড়ো হয়ে হোস্টেলে টোস্টেলে বা বাইরে কোথাও আছে। কাজেই তিনি ও বিষয়ে কোনো কৌতূহল প্রকাশ করেননি বা করবার কথাও বোধ হয় চিন্তা করেননি। কিন্তু যখন তিনি বিভাসকুমারকে পরীক্ষা করলেন, তখন কৌতূহলটা ফণা তুলে উঠে দাঁড়াল। খোঁজ খবর নিয়ে জানলেন যে বিভাসকুমার নিঃসন্তান বলেই সবাই জানে এবং তাঁর শালির ছেলেকে তিনি দত্তক নিতে যাচ্ছেন। চট করে দুই দুই-এ চার করলেন ডাক্তার। একটা চিঠি দিলেন— যদি লেগে যায়। লেগে গেল। লোভের কাছে তাঁর সামাজিক কর্তব্যবোধকে জলাঞ্জলি দিলেন।'

সমরেশ বলল, 'ডাক্তার কেশবন বুঝলেন কী করে? বাচ্চা হলেই তার চিহ্ন কিছু থেকে যায় নাকি?'

দময়ন্তী লজ্জিতভাবে বলল, 'হ্যাঁ, পেটের চামড়ায় দাগ থাকতে পারে আর যে স্টিচ পড়ে তার দাগ সারা জীবনই থাকে। একটু অভিজ্ঞ চোখ অনায়াসে ধরতে পারে।'

সমরেশ বলল, 'সিজারিয়ান না কী যেন বলে, তাই না?'

'না, সিজারিয়ান ডেলিভারি ছাড়াও নর্ম্যাল ডেলিভারিতেও স্টিচ পড়ে। তার দাগ থেকে যায়।'

শিবেন বলল, 'মালবিকা কেন ডাক্তার কেশবনকে সন্দেহ করেননি? তিনি কি জানেন না এই সব চিহ্নের কথা?'

'না, জানেন না। না বলে দিলে কোনো অনভিজ্ঞ মেয়ের পক্ষে জানা সম্ভবও নয়। বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে যে বয়সে মেয়েরা প্রাণের কথা, মনের কথা বলে, অন্যের অভিজ্ঞতার ভাগ নেয়, সেই বয়সটা তো ওঁর কেটেছে নিঃসঙ্গ বন্দি জীবনে— বৃদ্ধা মা আর পাগল দিদিকে নিয়ে। জানবার কোনো সুযোগই হয়নি।'

সমরেশ বলল, 'বুঝলুম। কিন্তু হে নারী, তুমিই-বা এত ডিটেল জানলে কোত্থেকে? হিস্ট্রির সিলেবাসে তো বাপু এসব জিনিস থাকে বলে শুনিনি।'

‘আহা, হিস্ট্রির সিলেবাসের বাইরে যেন কিছুই জানি না আমি। আমাদের পরিবারটিকে তো তুমি জানোই। তুমিই তো বলো, রাবণের গুষ্টি— ভাই-বোন মিলে একগাড়ি লোক। আমরা বোনেরা যখন একত্র হই, তখন নাকি পাড়ায় কাক চিল বসতে পায় না। আমার দিদিদের আর বউদিদের তো তুমি দেখেছ। মুখের কোনো আগল নেই। আড্ডা মারতে বসে যা-খুশি তাই নির্বিকার চিত্তে বলে যাবে। ভেবেছোটা কি, বিয়ের আগেই আমার সবকিছু জানা হয়ে গিয়েছিল।’

সমরেশ তাচ্ছিল্যভরে বলল, ‘সবকিছু! থাক, থাক, ওসব বিষয়ে যত কম বলা যায়, ততই ভালো।’

দময়ন্তী লজ্জা পেয়ে গেল। বলল, ‘অসভ্য বাঁদর! বলি, শুধু অসভ্যতা করবে, না শুনবে কথাগুলো।’

শিবেন তাড়াতাড়ি বলল, ‘হ্যাঁ, হ্যাঁ। ইন্টারেস্টিং কথা হচ্ছিল, তার মধ্যে তুই যত ভ্যাজ ভ্যাজ আরম্ভ করলি। আপনি বলুন বউদি। ডাক্তার মৃণালিনী করকে আপনি তাহলে সন্দেহ থেকে একেবারেই বাদ দিতে চান?’

সমরেশ আবার যোগ দিল :’টাইপরাইটারটা চেক করাতেও তোমার আপত্তি?’

দময়ন্তী বলল, ‘একেবারেই বাদ দিতে চাই, এমন কথা বলব না। তবে আমার ধারণা, তালতলার এই হতভাগ্য পরিবারটির সত্যিকারের শুভানুধ্যায়ী যদি কেউ থাকেন, তবে তিনি এই ভদ্রমহিলা। তা ছাড়া আরেকটা কথা ভেবে দেখুন, মিসেস হালদার যে রেস্টুরেন্টে টাকা দিতে যান, এটা একটা বিশুদ্ধ দক্ষিণ ভারতীয় রেস্টুরেন্ট— যা আজকাল কলকাতায় অজস্র গজিয়ে উঠেছে। কফির দোকান আর তার কাউন্টারের ওপর টিফিন ক্যারিয়ার— এটা অন্য কিছু হতে পারে না।

‘তবে দক্ষিণ ভারতীয় রেস্টুরেন্ট বলে ডাক্তার কেশবনের ওপর মালবিকার সন্দেহ হতে পারত। কিন্তু তিনি যে সমাজে মেশেন, সেটা নিতান্তই কসমোপলিটন। কাজেই বিশেষ কাউকে নির্দেশ করা তাঁর পক্ষে ঠিক সম্ভব হয়নি। ডাক্তার কেশবনই বরং এত কম পরিচিত যে তাঁর নাম বোধ হয় মালবিকার মনেই পড়েনি।’

শিবেন বলল, ‘যাক, তাহলে আপনার তৃতীয় আর শেষ প্রশ্নের জবাব হল এই। আমি কিন্তু ডাক্তার করকেও একটু বাজিয়ে দেখতে চাই। তাঁকে একেবারে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। তাহলে সমরেশ, আমি কাল বিকেলে আসব। তোরা রেডি থাকিস। আমরা একসঙ্গে ডাক্তার কেশবনের চেম্বারে হানা দেব।’

দময়ন্তী দু-হাত নেড়ে বলে উঠল, ‘ওরে বাবা! না, না, আমি যাব না। সমরেশকে নিয়ে যান, ওর খুব সাহস। আমার ভীষণ ভয় করে।’

দময়ন্তী একটা ম্যাগাজিন খুলে বসেছিল বটে, কিন্তু মোটেই পড়ছিল না। ভেতরে ভেতরে খুবই অস্থির হয়ে উঠেছিল সে। দরজার ঘণ্টি বাজতেই একলাফে গিয়ে দরজা খুলল।

সমরেশ আর শিবেন ঘরে ঢুকল। শিবেন মৃদু মৃদু হাসছিল আর সমরেশ প্রায় লাফাচ্ছিল উত্তেজনায়।

‘উঃ! পুলিশি হেক্কার কাকে বলে, আজ বুঝলুম।’ বলল, সমরেশ। ‘বাপরে বাপ! সে কী ধমক ধামক, আমারই পিলে চমকে চমকে উঠছিল। কেশবনের তো কথাই নেই— একেবারে স্পিকটি নট।’

দময়ন্তী বলল, ‘আঃ বাজে কথা ছাড়ো। কী হল বলো দেখি?’

‘হল যা, একেবারে গুরুচরণ। আমরা তো প্রথমে রুগি সেজে ঢুকলুম। আমি রুগি, শিবেন গার্জিয়ান। রোববার, চেম্বার ফাঁকা। প্রথমে তো ভাগিয়েই দিচ্ছিল। পরে অনেক অনুনয়, বিনয় করবার পর, দেখতে রাজি হল। ঘরে ঢুকে দেখি, ব্যাটা বসে বসে টাইপ করছে। টাইপরাইটারটা প্রথমেই দেখে নিলুম। আমার কথাই ঠিক— স্ট্যান্ডার্ড প্রিন্সটন। তারপর, দু-একটা কথার পরেই শিবেন নিজের পরিচয়টি দিল।

‘শিবেন প্রথমটা আন্দাজে ছেড়েছিল। বলল, আমরা জানি, আপনি আপনার রুগিনীদের ব্ল্যাকমেল করছেন, তার অকাট্য প্রমাণ আমাদের কাছে আছে। যেখানে সমাজকে রোগমুক্ত করবার দায়িত্ব আপনার, সেখানে আপনি নিজেই একটা কুৎসিত ব্যাধিবিশেষ। আমরা দেখব, যাতে এই ব্যাধিটি সমূলে উৎপাটিত করা যায়।

লোকটা প্রথমে তেড়ে এসেছিল। তারপর আমতা আমতা করতে লাগল। ইতিমধ্যে আমি উঠে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি যে টেবিলের ওপর টাইপরাইটারটা রাখা, তার আধখোলা ড্রয়ারের ভেতর একটা লাল টুকটুকে নোটবই দেখা যাচ্ছে। ঠিক যে সন্দেহ হয়েছিল তা নয়, কৌতূহলের বশেই বইটা তুলে নিয়েছিলুম। লোকটা তখন শিবেনের ধাতানি শুনছে, লক্ষ্য করেনি, বইটি খুলে আমার তো চক্ষুস্থির! ভেতরের পাতায় প্রায় জনা পনেরো মহিলার নাম। প্রত্যেকের নামের পাশে একটা করে তারিখ আর একটা করে টাকার অঙ্ক। সবচেয়ে বেশি আমাদের মিসেস হালদারের নামে, দশ হাজার টাকা। আর সবচেয়ে কম কে এক মিসেস কমলা সরকারের নামে— পাঁচশো টাকা।’

‘শিবেনকে সেটা দেখাতেই ও তো একেবারে ফেটে পড়ল। তারপর যা মুখ ছোটাল না, তা ভাষায় বর্ণনা করা আমার অসাধ্য। লোকটা থরথর করে কাঁপতে লাগল। শিবেন শেষ অস্ত্র ছাড়ল। বলল, আমরা মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনকে জানাব আপনার কথা। আপনি একজন জঘন্য অপরাধী। আমরা দেখব, যেন আপনার সমস্ত ডিগ্রি কেড়ে নেওয়া হয় এবং পুলিশের তরফ থেকে যা করণীয় তাও আমরা করব।

‘লোকটা হাতজোড় করে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়িয়ে আবার ধপ করে বসে পড়ল। শিবেন বলল, কোনোরকম ক্ষমা আপনি পাবেন না, আপনি ক্ষমার অযোগ্য। আমি যা বললুম, তা আমরা করবই। এই বলে বইটি পকেটে পুরে আমরা গটগট করে বেরিয়ে এলুম। আসার আগে দেখলুম, লোকটা তার চেয়ারে কেমন ধারা নেতিয়ে পড়ে আছে।’

শিবেন বলল, ‘হ্যাঁ, ডোজ একখানা যা দিয়ে এসেছি, ব্যাটা তার ধাক্কা সামলে উঠতে সময় নেবে। আসলে আমরা করতে তো পারতুম না কিছুই। এখন ওর অপরাধবোধটা ধাক্কা মেরে জাগিয়ে দিয়ে আসা হল। এতেই কাজ হবে।’

দময়ন্তী বলল, ‘নিশ্চয়ই হবে। আশা করি, মিসেস হালদার এবারে নিজের ছেলেকে ছেলে হিসেবে পেতে আর কোনো অসুবিধে বোধ করবেন না। এবং আরও অনেকেই মুক্তি পাবেন।’

শিবেন চলে গেলে সমরেশ বলল, ‘কেসটা তাহলে এইখানেই শেষ? যাকে বলে, দ্য এন্ড?’

দময়ন্তী বলল, 'ঠিক দ্য এন্ড নয়। মোটামুটি শেষ বলতে পারো। মনে আছে, আমি বলেছিলুম ভদ্রমহিলা চারটে প্রধান মিথ্যে কথা বলেছিলেন? লক্ষ্য করোনি, আমরা তিনটে মিথ্যে নিয়ে আলোচনা করেছিলুম। চতুর্থটার সঙ্গে অবশ্য এ ব্যাপারটার কোনো সম্পর্ক নেই। শুধু কাল যখন ভদ্রমহিলা আসবেন, তখন সেটাও একবার যাচাই করে নেওয়া যাবে। কোনো দরকার নেই যদিও। নেহাত মেয়েলি কৌতূহল বলতে পারো।'

সমরেশ বলল, 'হুঁ, কৌতূহলটা আমার মধ্যেও বেশ জোরালোভাবে সংক্রামিত হয়েছে।'

সমরেশ অফিস থেকে ফিরতেই দময়ন্তী বলল, 'চট করে চানটান করে নাও। মিসেস হালদার ফোন করেছিলেন, আসবেন এখনই।'

কাতর মুখে সমরেশ বলল, 'চান আবার কেন! নিউমোনিয়া ধরাতে চাও নাকি? শুধু হাত-মুখটা ধুয়ে নিলে চলবে না?'

দময়ন্তী বলল, 'এই গরমে কী করে যে বিকেলে চান না করে থাকো, জানি না।' বোধ হয় আরও কিছু গঞ্জনা সে দিত, কিন্তু তার আগেই টেলিফোন বেজে উঠল।

সমরেশ দৌড়ে গিয়ে টেলিফোন ধরল। হাসিমুখে বলল, 'কে, শিবেন? বল, কী বলছিস।' হঠাৎ তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। আর্তগলায় বলল, 'কী বললি?... কী সর্বনাশ! ... আমরা বেরিয়ে আসার পরেই?... নাইট্রিক অ্যাসিড খেয়ে? কী সাংঘাতিক!... উঃ, এখনও চব্বিশ ঘণ্টাও হয়নি যে রে, লোকটাকে জলজ্যান্ত দেখে এলুম!... বড়ো বাড়াবাড়ি হয়ে গেল ব্যাপারটা। ভেবে দেখ, লোকটার অপরাধবোধ কী তীব্র ছিল! ছেলেপুলে আছে নাকি রে? নেই? বিয়ে থা করেনি? ... আচ্ছা, ঠিক আছে। তুই আর কী করবি? চলে আয় রাত্রিবেলা। ছাড়ছি।'

দময়ন্তী উদবিগ্ন মুখে সমরেশের পিছনে দাঁড়িয়েছিল। টেলিফোন রাখতেই বলল, 'ভদ্রলোক বিয়ে-থা করেছিলেন নাকি গো?'

সমরেশ কী যেন জবাব দিতে গিয়েও থেমে গেল। কখন যেন নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন মালবিকা। কিছু একটা ঘটেছে অনুমান করে নিজের উপস্থিতিটা জানান দিতে ইতস্তত করছেন। সমরেশ তাঁর দিকে তাকিয়ে নিস্তেজ গলায় বলল, 'আর আপনার কোনো ভয় নেই, মিসেস হালদার। আর কোনোদিন আপনার কাছে টাকা চেয়ে চিঠি আসবে না। আপনি মুক্তি পেয়েছেন।'

মালবিকা সমরেশের গলার নিরানন্দটুকু লক্ষই করলেন না। আনন্দে, উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে সোফার ওপর বসে পড়লেন। স্খলিত কণ্ঠে বললেন, 'আমি মুক্তি পেয়ে গেছি! আর আসবে না চিঠি— আর কোনোদিনও আসবে না? আমি কী করে আপনাদের ধন্যবাদ জানাব? কেমন করে আমার কৃতজ্ঞতা জানাব?'

দময়ন্তী তাঁর পাশে বসে বলল, 'আপনি শান্ত হোন, মিসেস হালদার। কৃতজ্ঞতা জানাবার সময় অনেক পাবেন। আপাতত অতীতকে পুরোপুরি ভুলে গিয়ে, স্বামী সন্তান নিয়ে নতুন ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করুন। ভগবান নিশ্চয়ই আপনাদের মঙ্গল করবেন।'

অনেকক্ষণ স্থির হয়ে বসে রইলেন মালবিকা। ভেতরের প্রচণ্ড আবেগগুলোকে আয়ত্তে আনবার প্রচেষ্টায় সমস্ত মুখ লাল হয়ে উঠল। তারপর ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করে দময়ন্তীর মুঠির মধ্যে গুঁজে দিয়ে বললেন, 'এটা আপনাকে নিতেই

হবে, মিসেস দত্তগুপ্ত। আমার কৃতজ্ঞতা জানাবার এটা একটা সামান্য উপকরণ বলে মনে করবেন।'

দময়ন্তী আশ্চর্য হয়ে বলল, 'কী এটা?'

মালবিকা বললেন, 'কাল এটাই দিতে যেতুম টিফিন ক্যারিয়ারে করে।'

সমরেশ হাঁসফাঁস করে উঠল, 'দশ— হাজার টাকার চেক!'

দময়ন্তী ভয়ানক লজ্জিত হয়ে বলল, 'না, না সেকী! আপনি আমায় টাকা দিচ্ছেন কেন? আমি তো প্রফেশনাল নই। আমি পরিচিতদের বিপদে একটু সাহায্য করে থাকি মাত্র।'

মালবিকা বললেন, 'কোনো কথাই আমি শুনব না, মিসেস দত্তগুপ্ত। এটা তো যেতই, আরও কত যে যেত সেই শয়তানটার পেটে কে জানে! আমি যদি তার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে এটা একটা সৎকাজে ব্যয় করতে চাই, আপনি বাধা দেবেন কেন?'

সমরেশ মনে মনে বলল, 'বটেই তো, বটেই তো!'

মালবিকা এবার সমরেশের দিকে ফিরলেন। বললেন, 'আপনি এইমাত্র অফিস থেকে ফিরেছেন। চানটান এখনও করেননি দেখছি। যান, আপনি বিশ্রাম করুন। আমিও এবার উঠি।'

বললেন বটে, কিন্তু উঠলেন না। নিজের মনের সঙ্গে খানিকক্ষণ লড়াই করলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর কৌতূহলেরই জয় হল। লজ্জিতভাবে দময়ন্তীর দিকে চেয়ে বললেন, 'ব্ল্যাকমেলারটিকে তো ধরতে পেরেছেন— কী করে পেরেছেন জানি না। কেন সে ব্ল্যাকমেল করছিল, তাও কি ধরতে পেরেছেন?'

নিরুত্তাপ গলায় দময়ন্তী বলল, 'হ্যাঁ, বোধ হয় পেরেছি।'

'তার মানে আমার জীবনের সব কথাই আপনার জানা! আপনি কি ম্যাজিক জানেন?'

'না, সব কথাই যে জানা তা বলব না। কয়েকটা কথা সঠিক জানি না, অনুমান করতে পারি। যদি কিছু মনে না করেন, দু-একটা প্রশ্ন করব?'

ক্ষীণ কণ্ঠে মালবিকা বললেন, 'করুন।'

'আপনার ভগ্নীপতি যে মারা যান, সেটা বিষ খেয়ে কি? কী বিষ?'

'কোনো একটা ফুলের বীজের এক্সট্র্যাক্ট। বেদেদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। খুব সামান্য পরিমাণে খেলে লোকে পাগল হয়ে যায়, আর একটু বেশি পরিমাণে খেলে মৃত্যু অনিবার্য।'

মালবিকার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে দময়ন্তী জিজ্ঞেস করল, 'আপনার ভগ্নীপতিকে কে সেই বিষ মেশানো খাবার দিয়েছিল? আপনার দিদি?'

আতঙ্ক বিস্ফারিত চোখে চিৎকার করে উঠলেন মালবিকা, 'না, না, দিদি নয়— দিদি নয়! ও দেয়নি— দিতে পারে না! ও যে ভীষণ ভালো ছিল, ফুলের মতো সুন্দর আর কোমল! জানেন, কী ভয় পেত আরশোলাকে, তবু একটা প্রাণে ধরে মারতে পারত না। যখন পাগল হয়ে গেল, তখন খালি কাঁদত আর বলত, তুমি আমায় বিষ দিলে! আমি তোমায় অত ভালোবাসতুম, তবু আমায় বিষ খাওয়ালে? ও জানত ওর স্বামীর সুন্দর

মুখের পিছনে একটা কী ভয়ঙ্কর বিষধর সাপ লুকিয়ে আছে, তবু স্বামীকে আগলে রাখতে চাইত আর ভালোবাসত।'

বহুদিন আগেকার ভয়াবহ স্মৃতি চোখের জল হয়ে মালবিকার দু-চোখ ছাপিয়ে টপটপ করে পড়তে লাগল। দু-হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলেন ভদ্রমহিলা।

দময়ন্তী প্রায় নিজের মনেই বলল, 'তাহলে স্বামী মারা যাওয়ার আগেই উনি পাগল হয়ে গিয়েছিলেন! আমি এই রকমই সন্দেহ করেছিলাম।'

বেশ কিছুক্ষণ বাদে মুখ তুললেন মালবিকা। সমরেশ আশ্চর্য হয়ে দেখল, তাঁর চোখ দুটো শুকনো— যেন কী এক জ্বালায় সব জল শুকিয়ে গেছে। শূন্য দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে কম্পিত কণ্ঠে মালবিকা বললেন, 'একটা ছোট্ট সুন্দর সংসার ছিল আমাদের। জ্বলে গেল, সব পুড়ে ছারখার হয়ে গেল। মাত্র একজনের বিষে। দিদিটা পাগল হয়ে মরল, বাবা প্রায় উন্মাদ আর আমার সর্বনাশ!

'অথচ দিদি চেষ্টা করেছিল সুন্দর একটা সংসার গড়ে তুলতে। আমরা বম্বে থেকে ফেরার পর ও বাবা আর মাকে কত বুঝিয়েছিল। বলেছিল, ঘি আর আগুন কাছাকাছি থাকলে কী আর করা যাবে! তোমরা শান্ত হও, ক্ষমা করো। আমাকে দেখ তো, আমি তো ভুল বুঝিনি। দিদি কী বোকাই ছিল! ভেবেছিল ওর স্বামী ক্ষণিকের জন্যে আত্মসংযম হারিয়ে ফেলেই বিপত্তি ঘটিয়েছিল। আসলে ও ছিল সাপের মতো ক্রুর, শয়তানের মতো নিষ্ঠুর। দিদিকে ও কোনোদিনই ভালোবাসেনি, ওর দৃষ্টি ছিল আমার দিকে। প্রথম থেকেই।

'আমি তখন প্রায় বালিকাই বলা চলে। ওর ভালোবাসার কথাগুলো বিশ্বাস করেছিলুম, দিদিকে ভুল বুঝেছিলুম। দিদি যখন পাগল হয়ে দিন-রাত খালি কেঁদে কেঁদে বলত, 'তুমি আমায় বিষ দিলে!' আমি তখন সেটা প্রলাপ বলেই ভাবতুম। কিন্তু বাবা-মার মুখের দিকে চেয়ে কী একটা সন্দেহ আমার মনে ঢুকেছিল, বম্বে থেকে ফেরার পর ওর কাছে আর একদম যেতুম না।

'ও তখন বাধা পেয়ে উন্মাদ হয়ে উঠল। ওই বিশাল বাড়ির নির্জনতায় ওর বিষাক্ত নিশ্বাস আমাকে খুঁজে বেড়াত! তারপর একদিন উত্তেজনার মুহূর্তে ও আমায় বিষের কৌটো দেখিয়ে আমার জন্য কি না করেছে সেটা প্রমাণ করবার চেষ্টা করল। সঙ্গেসঙ্গে যেন একটা প্রচণ্ড বজ্রাঘাতে আমার চোখের সামনে যে অন্ধকার পর্দাটা ছিল, সেটা ছিঁড়ে খুঁড়ে আসল সত্যের বীভৎস রূপটা দেখতে পেলুম। সেই বিকৃত রূপ দেখে তখন উন্মাদ হবার পালা আমার। আমার অত ভালোবাসার— অত আদরের দিদিটার দিকে চেয়ে, বাবা-মার দিকে চেয়ে আমার বুকটা ফেটে যেত।'

দময়ন্তীর দিকে উদভ্রান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে মালবিকা প্রশ্ন করলেন, 'আপনি জানতে চান, কে বিষ দিয়েছিল? নিতান্ত অল্প বয়সেও প্রতিহিংসা নিতে, নিজের সম্মান বাঁচাতে, যে ফণা একবার ছোবল মেরে ক্ষান্ত না হয়ে আবার মারতে উদ্যত হয়েছিল, তাকে চিরকালের মতো শেষ করে দিতে কে বিষ দিতে বাধ্য হয়েছিল, শুনবেন?'

সমরেশ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'না, না, মিসেস হালদার, আমরা জানতেও চাই না, আর শুনতেও চাই না। যা হয়ে গেছে, ফুরিয়ে গেছে। তাকে আর টেনে এনে লাভ কী? অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন আপনি। এখন বাড়ি যান। আজ আপনার আনন্দের দিন। অতীতকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে, নতুন করে শুরু করুন পথচলা। এই তো সবে শুরু। আপনার সব শুভ হোক।'

অন্ধ তামস

জয়ন্ত চতুর্বেদী পরপর অনেকগুলো সিগারেট খেয়ে ফেলল। তারপর আর না পেরে বলেই ফেলল, 'দ্যাখো দময়ন্তী, একটা কথা না বলে আর থাকতে পারছি না।'

দময়ন্তী মৃদু হেসে বলল, 'তোমার যে একটা কথা বলবার আছে, সেটা তো অনেকক্ষণ থেকেই বুঝতে পারছি। তা কথাটা কী? কোনো রহস্য নাকি?'

ঘাড় নেড়ে জয়ন্ত বলল, 'হ্যাঁ। রহস্যই বটে। মানে, তোমাকে বলতে চাইছিলুম না আর কী। তোমরা ছুটি কাটাতে এসেছ, ক'টা দিন একটু রিল্যাক্স করবে। তার মধ্যে এইসব...'

দময়ন্তী হাত নেড়ে বলল, 'দ্যাখ জয়ন্ত, পুলিশে চাকরি করে করে তোমার বুদ্ধি দেখছি কমেই যাচ্ছে, বাড়ার কোনো লক্ষণই নেই। তোমার কাছে একটা রহস্য রয়েছে আর তুমি সেটা বের না করে চেপে যাচ্ছ আমাদের ছুটির ব্যাঘাত ঘটবে বলে? কলেজে তো তুমি এতটা ইয়ে ছিলে না!'

জয়ন্ত একগাল হাসল। বলল, 'গালাগাল কোরো না। চেপে কি আর যেতুম? বলতুম ঠিকই। কারণ আমি জানি, তুমি রহস্যটা ছুটির চেয়ে কম উপভোগ করবে না। এই একটু ভদ্রতা করছিলুম আর কি।'

দময়ন্তী বলল, 'তা ভালো। কেউ ভদ্রতা টদ্রতা করলে ভালোই লাগে। এবার তবে খুলে বলো ব্যাপারটা কী? এখানে কীসের রহস্য?'

সমরেশ বলল, 'একটু দাঁড়ান জয়ন্তবাবু। রহস্যের সঙ্গে একটু অনুপান না থাকলে কি জমে? বলে হাঁক মারল, 'বৈজু, গোটা ছয়েক কাবাব এখানে দিয়ে যাও তো বাপধন। ভয়ানক সিরিয়াস ব্যাপার হতে যাচ্ছে, দেরি করে সব মাটি করে দিও না।'

২

জয়ন্ত বলল, 'দ্যাখো, এই ফুলডিহি টাউনকে তোমরা, কলকাতার লোকেরা, জানো একটা স্বাস্থ্যকর জায়গা বলে। এটা যে স্বাস্থ্যকর জায়গা তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু এর আর একটা পরিচয়ও আছে। এটা একটা বহু পুরোনো খনি শহর। এর চারদিকে অনেকগুলো ভালো ভালো অভ্রের খনি আছে। আর তার ফলে বেশ কিছু পয়সাওয়ালা লোক এখানে বহুদিন ধরে বংশানুক্রমে বসবাস করে আসছেন। তাঁদের বাড়িগুলো এদিকে নয়, এখান থেকে মাইল খানেক দূরে। স্থানীয় লোকেরা সে জায়গাটাকে বলে লালকুঠিপাড়া।

'এই পুলিশ লাইন, সরকারি অফিস, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাংলো ইত্যাদি একসময় ওই লালকুঠিপাড়াতেই ছিল। বছর দশেক হল নতুন কলোনি করে এদিকে উঠে এসেছে আর নতুন গড়ে ওঠার ফলে ফুলডিহি ব্যারেজ কাছে হওয়ার ফলে আজকাল এদিকটাই বেশি জনপ্রিয়।

'তোমাকে এসব কথা বলার অবশ্য আমার একটা উদ্দেশ্য আছে। আমি বলতে চাইছি, তুমি মনে কোরো না যে এখানে কেবল সরকারি চাকুরে আর স্বাস্থ্যোদ্ধারকারীদের ভিড়। এখানে বহু পুরোনো বাসিন্দারা আছেন, তার মানেই আছে দলাদলি, ঈর্ষা এবং মাঝে

মাঝে সংঘাত। খুনখারাপি এখানে নেহাত বিরল নয়। এরকম একটি খুনের কেসই তোমাকে বলছি। তবে মনে কোরো না যেন যে এই কেসটার জন্যেই তোমাদের জোরজার করে ছুটি কাটানোর নাম করে এখানে টেনে এনেছি।'

দময়ন্তী প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বলল, 'ওরে বাবারে বাবা, আমি কিছু মনে করছি না! কলকাতায় লেখাপড়া করে আর বিহারে চাকরি করেও দেখছি, তোমার ইউ পি মার্কা চরিত্রের বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি।'

সমরেশ বলল, 'আর দেরি করবেন না জয়ন্তবাবু, শুরু করে দিন। বেশি দেরি করলে আপনার বৈজু মহারাজ কাবাব সাপ্লাই করে কুল পাবে না।'

জয়ন্ত সহাস্যে বলল, 'বৈজুর জন্য কোনো চিন্তা নেই। যাহোক, কেসটা বলি। তবে আগেই বলে রাখি, আমার বলাটা হয়তো সম্পূর্ণ অপক্ষপাত হবে না, কারণ এই কেসের সন্দেহভাজনদের মধ্যে একজন আমার শিক্ষাগুরু। আমি যখন আই-পি-এস ট্রেনিংয়ে ছিলুম, ইনি তখন ব্যালিস্টিক এক্সপার্ট হিসেবে আমাদের ক্লাস নিয়ে থাকতেন। এঁর নাম ক্যাপ্টেন রামনাথ সরফ। ঘটনাটা এঁর বাড়ির সামনেই ঘটে।

'আজ থেকে মাস ছয়েক আগে, পনেরোই এপ্রিল, রাত ন-টার সময় ক্যাপ্টেন সরফের বাড়ির গেটের মুখে তেজপাল আগরওয়াল নামে এক ভদ্রলোক গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। তেজপাল রামনাথের দীর্ঘদিনের বন্ধু, উনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতেই আসছিলেন।'

দময়ন্তী বলল, 'প্রথম প্রশ্ন। রাত ন-টার সময় কি লোডশেডিং চলছিল? আমি তো এখানে এসে ইস্তক দেখছি, রোজই রাত আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত লোডশেডিং চলে।'

জয়ন্ত বলল, 'হ্যাঁ, তখন লোডশেডিং চলছিল। আজ থেকে ছ-মাস আগে অবস্থা বিশেষ ভালো ছিল না।'

'তারপর?'

'বুঝতেই পারছ, লোড শেডিংয়ের মধ্যে কে যে গুলি ছুড়েছে, কেউই দেখতে পায়নি। কিন্তু আওয়াজটা শুনেছে অনেকেই। সেই আওয়াজ শুনেই রামনাথের বাড়ির দিকে দৌড়ে আসছিল আনোয়ার আর নাসির বলে দুজন সাইকেল রিক্সাওয়ালা। উলটোদিক থেকে দৌড়ে আসছিল আর একজন। তিনজনের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি হয় এবং আনোয়ার আর নাসির তৃতীয় লোকটিকে মাটিতে পেড়ে ফেলে। থানায় নিয়ে আসার পর দেখা যায় সেই তৃতীয় লোকটি কুখ্যাত দেওরাজ চৌধুরী, এখানকার সবচেয়ে বড়ো ব্যবসাদার নন্দকিশোর চৌধুরীর বখে যাওয়া একমাত্র ছেলে। ছেলেটি উকিল কিন্তু অত্যন্ত দুশ্চরিত্র।

'এই রিক্সাওয়ালাদেরই একজন কি তেজপালকে ওখানে নিয়ে গিয়েছিল?'

'না। তেজপাল লালকুঠিপাড়ার মুখে রিক্সা ছেড়ে দেন। সেখান থেকে হেঁটে রামনাথের বাড়ি যাচ্ছিলেন।'

'বন্দুকটা পাওয়া গেছে?'

'হ্যাঁ। রামনাথের বাগানের কুয়োর মধ্যে।'

'কোনো ফিঙ্গারপ্রিন্ট?'

'পাওয়া যায়নি।'

‘বন্দুকটা কার?’

‘রামনাথের।’

‘দেওরাজ কী বলেছে? সে পালাচ্ছিল কেন?’

‘দেওরাজ বলেছে, সে মোটেই পালাচ্ছিল না। সেও দৌড়ে রামনাথের বাড়ির দিকেই যাচ্ছিল। আনোয়ার আর নাসিরের সঙ্গে অন্ধকারে ধাক্কা লাগতেই তারা ওকে মেরে মাটিতে ফেলে দেয়। কিন্তু আমার বিশ্বাস, দেওরাজ মিথ্যে কথা বলেছে। কারণ, আনোয়ার আর নাসির মোটেই বোকা ছেলে নয়, বরং দুজনেই যথেষ্ট বুদ্ধিমান। আর, দেওরাজের কপালে একটা আলু আর নাসিরের ঠোঁট কাটা যা মুখোমুখি সংঘর্ষেই হতে পারে। দেওরাজ অবশ্য অন্য কথা বলেছে।’

‘দেওরাজের সঙ্গে তেজপালের কোনো শত্রুতা ছিল:?’

‘থাকতেই পারে। তেজপালও বড়ো ব্যবসাদার। নন্দকিশোরের সঙ্গে ওপরে ওপরে না হলেও তলায় তলায় শত্রুতা থাকতে পারে। তা ছাড়া তেজপালের একটি নাতনি আছে। সে বছর খানেক হল দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ পাশ করে এখানে এসে আছে। নিঃসন্দেহে দেওরাজ তার পেছনে লেগেছিল।’

‘নিঃসন্দেহে কেন?’

‘কারণ দেওরাজ দুশ্চরিত্র এবং খারাপ ধরনের ছেলে, বিশেষ করে নারীঘটিত ব্যাপারে। সে যে গিরিজা আগরওয়ালের মতো সুন্দরী, শিক্ষিতা এবং ভয়ানক রকমের মডার্ন মেয়ের পেছনে লাগবে, তাতে সন্দেহ থাকতে পারে না।’

সমরেশ হাত নেড়ে বলল, ‘বাঃ, বাঃ, সুন্দরী শিক্ষিতা নারীচরিত্রও এসে গেছে। এইবার নাটক জমবে। বৈজু, আরও ছ-টা কাবাব!’

দময়ন্তী বলল, ‘গুলিটা কি সামনে থেকে ছোড়া হয়েছিল, না পেছন থেকে?’

জয়ন্ত বলল, ‘সামনে থেকে, ফুট দশেক দূরে নীচু হয়ে বসে নীচ থেকে ওপরের দিকে কেউ গুলিটা ছুড়েছিল। তার থেকে প্রমাণ হয় গুলিটা রামনাথের বাড়ির ভেতর থেকে ছোড়া হয়েছিল।’

‘কীভাবে?’

‘রামনাথের বাড়ির গেট থেকে দশ ফুট দূরে নীচু হয়ে বসে যদি তুমি কম্পাউন্ডের দিকে তাকাও, তুমি সামনে দোতলা বাড়িটা দেখতে পাবে, আর যদি কম্পাউন্ডের ভেতর থেকে বাইরে রাস্তার দিকে তাকাও তাহলে দুটো গাছের ফাঁক দিয়ে একটুকরো আকাশ দেখতে পাবে ঠিক গেটটার ওপরে। অর্থাৎ তুমি যদি কম্পাউন্ডের ভেতরে থাক, তাহলে লোডশেডিং হলেও তারাভরা আকাশের ব্যাকগ্রাউন্ডে গেটের সামনে দাঁড়ানো একটা মানুষের সিল্যুয়েট তুমি দেখতে পাবে, অথচ কম্পাউন্ডের বাইরে থেকে ভেতরের দিকে তাকালে তা তুমি পাবে না।’

‘বাঃ, ভারি চমৎকার চিন্তা করেছ তো! আচ্ছা, তার মানে তুমি বলতে চাইছ যে দেওরাজ যদি হত্যাকারী হয় তাহলে সে রামনাথের বাড়ির ভেতর থেকে রামনাথের বন্দুক দিয়ে তেজপালকে গুলি করে, তারপর বন্দুকটা কুয়োর মধ্যে ফেলে দিয়ে দৌড় দেয়। এই তো?’

‘হ্যাঁ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই থিয়োরিটা পুরোপুরি খাড়া করা যাচ্ছে না।’

‘কেন?’

‘কারণ গুলি ছোড়ার শব্দ আর রিক্সাওয়ালাদের সঙ্গে দেওরাজের ধাক্কা খাওয়ার মধ্যে যে সময়ের এবং দূরত্বের ব্যবধান, তার মধ্যে এ কাজ দেওরাজের করা সম্ভব নয়। যদি

ধরেও নিই যে ঘটনাস্থলে দেওরাজের সঙ্গে অন্য আর একজনও ছিল, তাহলেও, আমি মাপজোপ করে দেখেছি, দেওরাজকে ছুটতে হয়েছিল ঘণ্টায় আশি কিলোমিটার স্পিডে। এটা একেবারেই অসম্ভব।'

'তাহলে দ্বিতীয় সম্ভাবনাটা কী?'

'দ্বিতীয় সম্ভাবনা হচ্ছে, দেওরাজ তেজপালের পেছন পেছন আসছিল। তেজপাল গেটটা খুলতে যাবেন বা খুলছেন, তখন দেওরাজ তাকে পেছন থেকে ডাকল। তেজপাল ঘুরে দাঁড়ালেন। দেওরাজ আন্দাজে গুলি চালাল। একটু নীচু হয়ে বসে চালাল যাতে গায়ে কোথাও না কোথাও লাগে। গুলি করেই বন্দুকটা ফেলে পেছন দিকে দৌড় দিল। তখন তার সাগরেদ বন্দুকটা উঠিয়ে গেটের কাছে গিয়ে তেজপালের মৃতদেহটা ঘুরিয়ে দিল যাতে মনে হয় যে গুলিটা ভেতর থেকে করা হয়েছে, তারপর বাগানের ভেতর গিয়ে কুয়োর মধ্যে বন্দুকটা ফেলে দিল।

'কিন্তু এর মধ্যে একটা গোলমাল আছে। ব্যাপারটা হল, এই থিয়োরিটা দাঁড় করাতে গেলে একজন তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। কে এই তৃতীয় ব্যক্তি? দেওরাজের স্বভাব যতদূর জানা গেছে, তাতে মনে হয় সে একজন লোনার বা একক ব্যক্তিত্ব। তার মোসাহেব বা ইয়ারবকশি বন্ধুবান্ধব অনেক আছে, কিন্তু কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই। তাহলে, এরকম একটা বিপজ্জনক কাজে, কাকে সে বিশ্বাস করে নিয়ে গেল? তার বন্ধুবান্ধবদের বাজিয়ে দেখেছি, তারা সবাই মেরুদণ্ডহীন বাজে লোক। কিন্তু এ কাজে দেওরাজকে যে সাহায্য করেছে সে স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন ওস্তাদ লোক। এরকম কাউকে আমরা বের করতে পারছি না।'

দময়ন্তী চিন্তিত মুখে বলল, 'বুঝেছি। এবার তাহলে তৃতীয় সম্ভাবনা।'

'তৃতীয় সম্ভাবনা হচ্ছে, দেওরাজ আর তেজপাল একসঙ্গেই আসছিলেন। তেজপাল গেট খুলতেই ভেতর থেকে কেউ গুলি করে। তেজপাল আর্তনাদ করে পড়ে যান। আর অমনি ভয় পেয়ে দেওরাজ পেছন ফিরে দৌড় মারে। কিন্তু সেখানে প্রশ্ন, সে কথা দেওরাজ বলছে না কেন?

'আর যদি ধরে নিই যে সে কথা বলতে তার কোনো বিশেষ বাধা আছে, তাহলে গুলিটা ছুড়েছিল কে? এবং কেন?'

দময়ন্তী আস্তে করে প্রশ্ন করল, 'রামনাথ?'

'হ্যাঁ, রামনাথের নামটাই মনে আসে বটে। তিনি রগচটা টাইপের লোক, পুলিশে ছিলেন, একসময় রাইফেল শুটিংয়ে চ্যাম্পিয়ান ছিলেন, কাজেই তাঁর পক্ষে এ কাজ করা অসম্ভব নয়। কিন্তু আজ তাঁর আশি বছর বয়স। শক্তসমর্থ আছেন ঠিকই, কিন্তু তাই বলে একটা রাইফেল তুলে দশ ফুট দূর থেকে স্রেফ একটা সিল্যুয়েটে গুলি চালানো কি এই বয়সে সম্ভব? তা ছাড়া মোটিভটা কি? তেজপাল তাঁর বহুদিনের বন্ধু। তিনি রিটায়ার্ড পুলিশ অফিসার, তেজপাল ব্যবসাদার, কাজেই স্বার্থের দ্বন্দ্ব লাগার সম্ভাবনাও কম। তা ছাড়া উনি এখন কানে কম শোনেন। কাজেই দুই বন্ধু নীরবে সারাদিনে দাবা খেলতেন। এর মধ্যে খুন-টুন আসে কোত্থেকে? আর সবচেয়ে বড়ো কথা হল, রাত ন-টা তাঁর কাছে মধ্যরাত্রি। রিটায়ার করার পর থেকে আজ বিশ বছরের ওপর তিনি রাত আটটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েন।'

জয়ন্ত হয়তো আরও অনেক কথা বলত, কিন্তু দময়ন্তী ওকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, ওনার লক্ষ্য হয়তো তেজপাল ছিলেনই না। হয়তো বদমাশ দেওরাজকেই

গুলি করতে গিয়েছিলেন। অন্ধকারে ভুল করে...'

মাথা নেড়ে জয়ন্ত বলল, 'বিরাট মোটা তেজপাল আর দরকচা মারা দেওরাজকে অন্ধকারে কেন, কোনো অবস্থাতেই একরকম বলে মনে হতে পারে না। আর দেওরাজ যে বদমাশ সেকথা রামনাথ মানতেই চান না।'

দময়ন্তী আশ্চর্য হয়ে বলল, 'সে কী কথা?'

'হ্যাঁ। ওনার ধারণা, দেওরাজ মোটেই বদ ছেলে নয়, ওসব বাজে লোকের রটনা। আসলে নন্দকিশোরবাবুও ওঁর বহুদিনের বন্ধু আর দেওরাজকে তিনি দেখেছেন একেবারে জন্ম থেকে। দেওরাজ নন্দকিশোরের বুড়ো বয়সের ছেলে বলে কেবল বাপের নয়, তাঁর বন্ধুদের কাছ থেকেও অপর্যাপ্ত স্নেহ এবং প্রশ্রয় পেয়ে এসেছে এবং এখনও পাচ্ছে। আর লোকটার এমন একটা ভিজে বেড়াল ভিজে বেড়াল ভাব আছে যে তার আড়ালে সে দিব্যি তার আসল রূপটি বাপ-খুড়োদের কাছ থেকে আড়াল করে যেতে পেরেছে। তার ওপর রামনাথের তো নিজের ছেলে নেই, কাজেই দেওরাজকে উনি প্রায় নিজের ছেলের মতোই দেখেন।'

'রামনাথের পরিবারে আর কে কে আছেন?'

'রামনাথের স্ত্রী অনেক আগেই মারা গেছেন। এখন ওঁর সংসারে আছে বিধবা মেয়ে মণীষা, একটি অন্ধ নাতনি নম্রতা আর নাতি শুভকরণ।'

'এঁরা কেউ আপনার সন্দেহভাজনদের লিস্টে নেই?'

'না। মনীষা এত মোটা যে তাঁর পক্ষে হাঁটু গেড়ে বসে রাইফেল চালানো সম্পূর্ণ অসম্ভব। তিনি বসলে উঠতে পারেন না। শুভকরণ এখানেই নেই, সে বম্বে আই-আই-টিতে পড়ে। আর, নম্রতা অন্ধ। তা ছাড়া তাকে দেখলেই বুঝতে পারবেন সে সার্থকনামা। সারাদিন সে মা আর দাদুর সেবা করে যাচ্ছে।'

'বেশ, তাহলে চতুর্থ সম্ভাবনা।'

'হ্যাঁ। চতুর্থ সম্ভাবনা হচ্ছে অন্য কোনো লোক, মানে যার পরিচয় আমরা এখনও জানি না, রামনাথের বন্দুক চুরি করে পালাচ্ছিল, হঠাৎ সামনে একজনকে গেট খুলে ঢুকতে দেখে গুলি করে বসে এবং খুন হয়ে গেছে দেখে কুয়োর মধ্যে বন্দুকটা ফেলে পালায়। তাহলে প্রশ্ন, কে সেই চোর? তাকে খুঁজে পাওয়া কি সম্ভব?'

দময়ন্তী কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'এই হল তাহলে তোমার রহস্য।'

'হ্যাঁ। কেমন মনে হল? ইন্টারেস্টিং? ভেবে দেখার উপযুক্ত?'

'নিশ্চয়ই উপযুক্ত। আমি কি একবার জায়গাটা দেখতে পারি? আর যাদের নাম বললে, তাদের সঙ্গেও যদি একটা মোলাকাত করার ব্যবস্থা করা যায়।'

জয়ন্ত বলল, 'সব হবে। তাহলে চলো, কালকেই বেরিয়ে পড়া যাক। ইতিমধ্যে আজ দুপুরে টেলিফোন করে আমি একটু ব্যাপারটা জানিয়ে রাখছি কয়েক জনকে। আশা করি, কোনো অসুবিধে হবে না।'

সমরেশ বলল। 'ঠিক আছে। আজ বিকেলে তাহলে চলুন ব্যারেজের দিকটা ঘুরে আসা যাক।'

৩

লালকুঠিপাড়ায় ঢুকলে সন্দেহ থাকে না যে সেটা একটা পয়সাওয়ালা লোকেদের জায়গা। রাস্তাগুলো খুব একটা চওড়া নয় বটে, কিন্তু তাদের দু-পাশে মস্ত মস্ত বাড়ি। বেশিরভাগই তিনতলা, কয়েকটা চারতলাও চোখে পড়ে। অনেকটা কলকাতার বড়োবাজারের মতোই। আর দুনিয়ার যত ক্যাটকেটে রং আছে— গোলাপি, গাঢ় সবুজ, গাঢ় হলুদ ইত্যাদি, সমস্তই এই বাড়িগুলোর বহিরাঙ্গের শোভাবর্ধন করছে। আরও আছে। মালা হাতে উড়ন্ত পরি, জলসেচরত হাতির মুণ্ডু, অদৃষ্টপূর্ব বাঘ, হরিণ, পাখি প্রভৃতি আর প্রকাণ্ড গুম্ফশোভিত দারোয়ান। শেষেরটি অবশ্য জীবন্ত।

জয়ন্ত কিন্তু এখানে গাড়ির গতি কমাল না। একসময় লালকুঠিপাড়া ছাড়িয়ে চলে এল বাইরে ফাঁকা মাঠের মধ্যে। আরও এক ফার্লংটাক যাবার পরে ডাইনে বাঁক নিল। এখানে একটা জঙ্গল মতো আছে, তার অন্য পাশে যেতেই দেখা দিল একটি অতি আধুনিক পাড়া। গোটা কুড়ি-বাইশ বাংলো টাইপের মস্ত মস্ত বাগানওয়ালা বাড়ি, ছবির মতো সাজানো।

জয়ন্ত বলল, 'এটা হল নতুন লালকুঠিপাড়া। পুরোনো পাড়া ছেড়ে অনেকেই এখানে বাড়ি করেছেন আধুনিক রীতিতে। কেবল ব্যবসায়ী বা খনি মালিকরাই নন, কিছু রিটায়ার্ড অফিসারও এখানে বাড়ি করেছেন। যেমন, ক্যাপ্টেন সরফ। ওই যে লাল রং করা গেটটা দেখছেন যার দু-পাশে দুটো জারুল গাছ, ওটাই ওঁর বাড়ি।'

বাড়িটা ছোটো কিন্তু দোতলা। সামনে প্রশস্ত বাগান, গেট থেকে বড়ো বড়ো সাদা পাথর বসানো রাস্তা তার ভেতর দিয়ে বাড়ির গায়ে গিয়ে ঠেকেছে। বাগানে নানারকম ফুলের গাছ, ক্রোটন আর ক্যাকটাসের সমারোহ। তাদের সঙ্গে হালকা হলুদ রঙের অতি আধুনিক ডিজাইনের বাড়িটা দিব্যি মানানসই হয়েছে। বাড়িটার পেছনেও অনেকটা জমি, সেদিকে কিচেন গার্ডেন আর কিছু ফলের বড়ো বড়ো গাছ। মোটমাট সমস্ত পরিবেশটাই শান্ত আর শান্তিপূর্ণ। এখানে যে কিছুদিন আগে একটা ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড হয়ে গেছে— কল্পনাই করা যায় না!

লাল মাটির চওড়া রাস্তার ওপর গেটের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল জয়ন্ত। গাড়ি থেকে দেখা গেল বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি মেয়ে তাড়াতাড়ি ভেতর চলে গেল। মেয়েটি দীর্ঘাঙ্গী, স্বাস্থ্যবতী, হাঁটা চলায় আভিজাত্যের ছাপ আছে। একমাত্র বেমানান তার চোখের কালো চশমাজোড়া।

দময়ন্তী গাড়ি থেকে নেমে জিজ্ঞেস করল, 'মেয়েটি কে জয়ন্ত?'

জয়ন্ত বলল, 'ওই নম্রতা।'

'অন্ধ?'

'হ্যাঁ। হঠাৎ দেখলে বোঝা যায় না, না? চলাফেরা একেবারে স্বাভাবিক মানুষের মতো।'

দময়ন্তী মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ। তাই বটে। বয়েস কত?'

'সাতাশ-আঠাশ হবে। সঠিক বলতে পারব না।'

'বিবাহিতা?'

'না।'

কথা বলতে বলতে জয়ন্ত এগিয়ে গিয়ে বুক সমান উঁচু গেটটা ঠেলা দিল। ঘড়ং ঘড়ং করতে করতে খুলে গেল গেটটা। গেট আর বাইরের রাস্তার মাঝখানে প্রায় ফুট ছয়েক চওড়া ঘাসের জমির দিকে নির্দেশ করে জয়ন্ত বলল, 'এখানেই তেজপাল আগরওয়ালের মৃতদেহ পড়েছিল। পা দুটো ছিল বাড়ির দিকে আর মাথাটার একটুখানি এসে পড়েছিল রাস্তার ওপরে। বুলেটের ধাক্কায় বেশ কিছুটা ছিটকে গিয়েছিলেন পেছন দিকে। একটা পা থেকে চটিজুতো খুলে গিয়েছিল, ধুতিটা সামান্য ছিঁড়ে গিয়েছিল, সিল্কের পাঞ্জাবির বুকের কাছটা ছিল রক্তে লাল। বাঁ-হাতে মুঠো করে ধরা ছিল সুগন্ধী রুমাল, বোধ হয় মুখ মুছতে মুছতে ঢুকছিলেন। ডান হাতে ছিল কিছু খুচরো পয়সা, রিক্সাওয়ালাকে ভাড়া দেবার পর চেঞ্জ, সেগুলো মাটিতে ছড়িয়ে পড়েছিল।'

দময়ন্তী মাথা নীচু করে শুনছিল। মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, 'পকেটে আর কী ছিল?'

'একটা মানিব্যাগে শ-পাঁচেক টাকা, একটা ধানবাদ থেকে কলকাতা যাবার ব্ল্যাক ডায়মণ্ডের এ.সি কোচের টিকিট, এক শিশি সরবিট্রেট আর গোটা পাঁচেক অন্য একটা ওষুধ— ট্র্যাংকুইলাইজার।'

'টিকিটটা কার নামে ছিল:?'

'ওঁর নিজের নামে। সতেরোই এপ্রিলের রিজার্ভশেন।'

'হার্টের অসুখ ছিল?'

'ছিল।'

'গুলিটা কোথায় লেগেছিল?'

'হার্টে। সঙ্গে-সঙ্গে মৃত্যু হয়েছিল।'

'অব্যর্থ লক্ষ্য!'

'হ্যাঁ। অব্যর্থ।'

'আর কিছু লক্ষ করেছিলে যেটা অদ্ভুত মনে হয়েছে?'

'হ্যাঁ। লোড শেডিংয়ের মধ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন, কিন্তু হাতে টর্চ ছিল না। অন্তত ওনার মৃতদেহের ধারেকাছে কোথাও টর্চ পাওয়া যায়নি। ছিটকে কোথাও পড়েছে ভেবে বেশ অনেকটা জায়গা নিয়েই খোঁজা হয়েছিল। ব্যাপারটা বেশ অস্বাভাবিক, তাই না?'

দময়ন্তী মুখ তুলে ফিকে হাসল। বলল, 'হ্যাঁ, বেশ অস্বাভাবিক।'

ওর যখন কথা বলছে, তখন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেটের কাছে চলে এসেছেন। ভদ্রলোক প্রায় ছ-ফুট লম্বা, যদিও বয়সের ভারে সামান্য সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন, কিন্তু স্বাস্থ্য বেশ ভালো, মাথার চুল সমস্ত সাদা, উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বপূর্ণ বলিরেখাঙ্কিত মুখে সাদা মোটা গোঁফ, পরনে সাদা পাজামা আর পাঞ্জাবি, হাতে একটা মোটা বেতের লাঠি।

ভদ্রলোককে দেখে জয়ন্ত দ্রুতপদে এগিয়ে গেল। গলাটা একটু তুলে বলল, 'গুডমর্নিং স্যার, সকালবেলাতেই বিরক্ত করলুম। এই, এঁদের একটু আপনার সঙ্গে দেখা করাবো বলে নিয়ে এসেছি।'

ভদ্রলোক গম্ভীরমুখে লাঠিশুদ্ধ দু-হাত তুলে দময়ন্তী আর সমরেশের উদ্দেশে নমস্কার করলেন। বললেন, 'জয়ন্ত কাল ফোন করে আপনাদের কথা আমাকে বলেছিল। ভেতরে আসুন।' বলে পিছন ফিরে বাড়ির দিকে হাঁটা দিলেন।

বারান্দায় উঠে ডান দিকে একটা মস্ত বড়ো ঘর। সেটাই বসবার ঘর। ঘরটা এত বড় যে একটা সোফা সেটে কুলিয়ে ওঠেনি, দুটো রাখা হয়েছে। বাকি জায়গাটুকুতে আছে একটা ডাইনিং টেবিল আর গোটা ছয়েক চেয়ার, একটা বড়ো কাচের শো কেস, তাতে নানারকম ট্রফি, কাপ, মেডেল প্রভৃতি, একটা বুক কেসে কিছু হিন্দি আর ইংরেজিতে বই আর দেওয়ালে নানা রকমের জন্তু জানোয়ারের স্টাফ করা মুণ্ডু।

ক্যাপ্টেন রামনাথ সরফ একটা সোফায় বসে অতিথিদের বাকিগুলো অধিকার করবার জন্য হাত নেড়ে ইঙ্গিত করলেন। তারপর দময়ন্তীর দিকে তাকিয়ে অতি পরিচ্ছন্ন ইংরিজিতে প্রশ্ন করলেন, 'কে আপনাকে এই তদন্তের জন্য নিয়োগ করেছে?'

দময়ন্তী মৃদু হেসে বলল, 'কেউ না। আমি প্রফেশনাল ডিটেকটিভ নই। রহস্যভেদে আমি একটা বিশেষ আনন্দ পাই, যেমন অনেকে ক্রসওয়ার্ড পাজল সমাধানের মধ্যে পায়। জয়ন্ত আর আমি একসঙ্গে কলেজে আর বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচ বছর পড়েছি। কাজেই বন্ধু হিসেবে ও আমাকে মাঝে মাঝে কোনো কোনো রহস্যের সন্ধান দিয়ে সাহায্য করে। আমিও আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে ওকে সাহায্য করে থাকি।'

'তার মানে, এই তদন্তে আপনার কোন স্বার্থ নেই?'

'না।'

'বিশ্বাস করা কঠিন। যাহোক, আপনি কী করতে চান?'

'আমি জায়গাটা একটু বিশদভাবে ঘুরে দেখতে চাই, আর কয়েক জনের সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই।'

'ব্যাস?'

'ব্যাস।'

'জয়ন্ত বলেছে আপনি আমার সঙ্গে কথা বলতে চান। কী জানতে চান?'

'আপনি তো পুলিশে কাজ করতেন। রিটায়ার করে এখানে বাড়ি করলেন কেন?'

'রিটায়ার করার পর আমার সঞ্চিত কিছু টাকা নিয়ে আমি আমার এক ছোটোবেলাকার বন্ধুর সঙ্গে অভ্রের ব্যবসায় অংশীদার হই। আমি আসার পর ব্যবসায় খুব লাভ হয়। তখন এই অঞ্চলটাও নতুন গড়ে উঠছে। সব মিলিয়ে এখানে থাকাটাই বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি।'

'আপনি কতদিন রিটায়ার করেছেন?'

'কুড়ি বছর।'

'শেষ কবে বন্দুক ছুড়েছেন?'

রামনাথ ব্যঙ্গাত্মক হাসি হাসলেন। বললেন, 'পঁচিশ বছর আগে। এ প্রশ্ন কেন? আপনি কি সন্দেহ করেন যে তেজপালকে আমি হত্যা করেছি?'

'হ্যাঁ, করি। আপনার বাড়ির গেটে আপনার বন্দুক দিয়ে হত্যা করা হয়েছে, আর আপনাকে সন্দেহ করব না? আপনি তো পুলিশে ছিলেন। আপনি হলে কী করতেন?'

‘করতুম না। কারণ ব্যাপারটা বড্ড বেশি সহজ, বড্ড বেশি স্বচ্ছ। কেউ যে আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছে, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।’

‘থাকে। আপনি পুলিশের লোক হিসেবে জানেন যে অতিরিক্ত সারল্য এবং স্বচ্ছতা পুলিশকে ভুলপথে চালিত করতে পারে। আপনি যে তাই হত্যাকাণ্ডটা অত্যন্ত সরল এবং সোজা পথে করে, পুলিশকে ভুল পথে চালিত করছেন না সেরকম প্রমাণ আমি এখনও পাইনি।’

জয়ন্ত বিস্ফারিত চোখে বলল, ‘তুমি বলছ কী দময়ন্তী? স্যারের পক্ষে এ কাজ করা অসম্ভব!’

রামনাথ হাত নেড়ে বললেন, ‘তুমি চুপ করো জয়ন্ত। আপনি কী বলতে চাইছেন, আমি বুঝতে পেরেছি। পরের প্রশ্ন?’ তাঁর মুখের হাসিটি তখন আর নেই।

দময়ন্তী প্রশ্ন করল, ‘তেজপাল আগরওয়াল আপনার বহুদিনের বন্ধু। কতদিনের পরিচয়?’

‘আমাদের পরিচয় প্রায় ষাট বছরের। কলকাতায় আগরওয়াল পরিবার এবং আমাদের পরিবার অনেক বছর পাশাপাশি বড়োবাজার অঞ্চলে বাস করেছে।’

জয়ন্ত বলল, ‘কিন্তু স্যার, পোস্টমর্টেম রিপোর্টে মৃতের বয়স লেখা আছে বাষট্টি। সে ক্ষেত্রে...’

‘সে ক্ষেত্রে কী? আমি ওকে জন্মাতে দেখেছি। কিন্তু আজ আমরা দুজনেই বুড়ো। কাজেই আমাদের পরিচয় ষাট বছরের বলাটা কি অন্যায়?’

দময়ন্তী গম্ভীর মুখে বলল, ‘অন্যায় হয়তো নয়, একটু অস্বাভাবিক। উনি আপনাকে কী বলে সম্বোধন করতেন?’

‘রামদাদা বলে।’

‘আপনি যার সঙ্গে ব্যবসা শুরু করেছিলেন, তিনিই কি ইনি?’

‘না। তার নাম দুর্গাদাস গোয়েঙ্কা। সে মারা গেছে। তার ছেলে বোম্বাইতে এখন ফিলমের ব্যবসা করছে।’

‘এই যে এতগুলো ট্রফি রয়েছে দেখছি শ্যুটিংয়ের ওপরে, এদের সব ক-টাই কি আপনার?’

‘না। আমার আছে, আমার স্ত্রীর আছে, আমার ছেলে-মেয়েরও আছে। আমাদের পুরো পরিবারটাই শ্যুটারের পরিবার।’

‘আপনার ছেলে এখন কোথায়?’

‘আমার ছেলে আর জামাই বড়াডিহির জঙ্গলে শিকার করতে গিয়ে জিপ উলটে খাদের মধ্যে পড়ে মারা যায়।’

দময়ন্তী ঠিক এরকম একটা উত্তর আশা করেনি। কিছুক্ষণ দুঃখিত মুখে চুপ করে থেকে বলল, ‘কত বছর আগে এ ঘটনা ঘটে?’

‘আজ থেকে বিশ বছর আগে।’ অকম্পিত গলায় রামনাথ বললেন।

‘তারপর?’

‘তারপর কী?’

‘তারপরেও কি আপনি শ্যুটিং চালিয়ে গেছেন?’

‘বলেছি তো, আমি তারও বছর পাঁচেক আগে শ্যুটিং বন্ধ করে দিই।’

‘বন্দুকগুলো রেখে দিয়েছিলেন কেন?’

‘মায়া পড়ে গিয়েছে ওদের ওপর। তা ছাড়া আমার নাতি ভালো রাইফেল চালায়।’

‘ও। আচ্ছা, আপনার ছেলের বিয়ে হয়নি?’

‘হয়েছিল। আমার ছেলের বউ এখানে থাকেন না, তিনি বোম্বাইতে থাকেন।’

‘কেন?’

‘এই পাণ্ডববর্জিত জায়গা তাঁর ভালো লাগে না, তাই। তিনি আনন্দ ফুর্তি করতে ভালোবাসেন। বিধবা বলে সর্বস্ব ত্যাগ করে ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে, তা তিনি বিশ্বাস করেন না।’

‘তিনি কি আবার বিবাহ করেছেন?’

‘না।’

‘তাঁর ছেলে-মেয়ে আছে?’

‘আছে। দুটি ছেলে। তারা কোথায় আছে, বলতে পারব না।’

‘তাদের বয়স?’

‘একজনের বাইশ, অপরজন চব্বিশ।’

‘আপনার নাতনি কি জন্মান্ধ?’

‘না। সে বিএসসি পাশ করে বম্বেতে একটা ওষুধের কারখানায় অ্যাপ্রেন্টিস থাকার সময় একটা অ্যাক্সিডেন্টে অন্ধ হয়ে যায়। একটা বিষাক্ত গ্যাসের সিলিন্ডার ফেটে ওর চোখে গ্যাস ঢুকে গিয়েছিল।’

‘কত বছর আগে?’

‘বছর তিনেক আগে। ওর তখন কুড়ি বছর বয়স ছিল।’

‘আপনার বন্দুক যে চুরি গেছে, আপনি জানতেন?’

‘না। মাসে একবার তেল দিই। এই ঘটনার মাত্র কয়েক দিন আগে পরিষ্কার করেছিলুম। কাজেই চুরি গেছে কিনা আমার জানা ছিল না।’

‘তেল কে দেয়?’

‘আমি।’

দময়ন্তী কিছুক্ষণ চুপ করে আছে দেখে রামনাথ মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আর কোনো প্রশ্ন?’

‘আর একটি প্রশ্ন। তেজপাল আগরওয়াল মারা যাওয়ায় আপনি দুঃখিত হননি, তাই না?’

‘হ্যাঁ, তাই।’

‘কেন? তিনি কি আপনার বন্ধু ছিলেন না?’

‘ছিলেন হয়তো। কিন্তু আমি তাকে পছন্দ করতুম না। তার যে কোনো বিশেষ কারণ ছিল, তা নয়। কিন্তু আমার ওর সঙ্গ খুব পছন্দ হত না।’

‘যেদিন তিনি নিহত হন, সেদিন অত রাত্রে লোড শেডিংয়ের ভেতরে তিনি আপনার বাড়িতে কেন আসছিলেন আপনি জানেন? আপনি কি তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন?’

বাঁধানো দাঁত বের করে হাসলেন রামনাথ। পাল্টা প্রশ্ন করলেন, ‘আপনি কি এ প্রশ্নের সত্যি উত্তর আশা করেন?’

‘দময়ন্তী মৃদু হেসে মাথা নাড়ল। বলল, ‘না।’

‘এবার আমি তাহলে আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করি?’

‘করুন।’

‘আমার জবাবগুলোয় আপনার কয়েকটা জায়গায় খটকা লেগেছে, নয়?’

‘হ্যাঁ।’

‘কোথায়?’

‘প্রথমত, তেজপালের সঙ্গে আপনার ষাট বছরের পরিচয় বলায়। দ্বিতীয়ত, আপনার নাতি দুটি কোথায় আছে সেকথা আপনি বলতে রাজি না হওয়ায়। তৃতীয়ত, তেজপালকে আপনি পছন্দ করতেন না সেকথা প্রকাশ করায়। এবং চতুর্থত, তেজপাল কেন সেদিন আপনার বাড়িতে আসছিলেন, সেকথা সোজাসুজি বলতে রাজি না হওয়ায়।’

‘আপনার কি ধারণা, আমি কোনো মিথ্যে বলেছি?’

‘হ্যাঁ, বলেছেন। কেন বলেছেন, সেটা বের করাই এখন আমার কাজ হবে। আমার বিশ্বাস, তখনই হয়তো আসল সত্যটা বেরিয়ে আসবে?’

ফিকে হাসলেন রামনাথ। বললেন, ‘হয়তো। হয়তো নয়। তবু আপনাকে আমার শুভকামনা জানাচ্ছি। গুড লাক।’

৪

বারান্দায় বেরিয়ে এসে জয়ন্ত গোমড়া মুখ করে বলল, ‘তুমি যদি স্যারকে সন্দেহই করে থাক, তবে সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরের মতো কোথায় কোথায় তোমার খটকা লেগেছে, সেসব কথা গড়গড় করে বলে গেলে কেন?’

দময়ন্তী চিন্তিত, অন্যমনস্কভাবে বলল, ‘ক্যাপ্টেন সরফ অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক। তাঁকে না বললেও তিনি বুঝতে পারতেন, কোথায় কোথায় তাঁর জবানবন্দি সন্দেহজনক বলে মনে হয়েছে। কাজেই, আমি বলে দেওয়াতে কোনোই ইতর বিশেষ হয়নি।’

জয়ন্ত পূর্ববৎ গোমড়া মুখে বলল, ‘কী জানি হল কিনা। তবে, এবার আমরা যাব তেজপালের বাড়ি? নম্রতা বা তার মার সঙ্গে কথা বলতে চাও না?’

‘এখনই নয়। হয়তো দু-দিন পরে।’

‘এখনই নয়’ বললেই তো আর হল না। নম্রতা গেটের কাছেই দাঁড়িয়েছিল। তিনজনের পায়ের শব্দ কাছে এগিয়ে আসতে নিঃশব্দে ঠোঁট দুটো ফাঁক করল। অর্থাৎ কিছু বলতে চায়।

দময়ন্তী একটু এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘আপনি কী কিছু বলবেন?’

সুন্দর ইংরেজিতে জবাব এল, ‘হ্যাঁ। তেজপাল আগরওয়ালের মৃত্যু রহস্যের কিনারা করতে আপনার কী স্বার্থ?’

দময়ন্তী নীচু গলায় বলল, ‘আপনার দাদু আমাকে একই প্রশ্ন করেছিলেন। আমি তার যা জবাব দিয়েছিলুম তা আপনি নিশ্চয়ই পাশের ঘর থেকে শুনেছেন।’

নম্রতার মুখে একটু লাল রঙের আভাস দেখা দিল। কালো চশমা জোড়া অকারণেই ঠিক করে নিয়ে বলল, ‘হ্যাঁ, শুনেছি, কিন্তু বিশ্বাস করিনি। কে আপনাকে এই কাজে নিয়োগ করেছেন?’

দময়ন্তী ফিরে প্রশ্ন করল, ‘কে নিয়োগ করে থাকতে পারে বলে আপনার মনে হয়?’

লাল রং এবার আরও একটু বাড়ল। ক্রুদ্ধ গলায় জবাব এল, ‘আমি আপনাকে প্রশ্ন করছি।’

‘তা করছেন ঠিকই, কিন্তু এ প্রশ্নের কি জবাব আমি দেব, বলুন? আমি যদি বলি শ্রীবৃন্দাবন ব্যানার্জী বলে একজন আমাকে টাকা দিয়েছেন, আপনি কি বিশ্বাস করবেন? করবেন না। এবং সত্যি কথা বলার ইচ্ছে যদি আমার না থাকে, আমাকে মিথ্যে বলার হাত থেকে আটকাবেন কী করে? তার চেয়ে বলুন, আমি এই রহস্যের তদন্ত করি এটা কি আপনি বা আপনারা চান, না চান না?’

‘না, চাই না।’

‘কেন?’

‘তার জবাব দিতে আমি বাধ্য নই।’

‘না, তা নন। আচ্ছা, ঘটনার সময় আপনি কী করছিলেন?’

‘ঘুমোচ্ছিলুম। আমি কিচ্ছু শুনিনি, কিচ্ছু জানি না। আর কিছু?’

‘হ্যাঁ। যিনি আমাকে নিয়োগ করেছেন বলে আপনি মনে করেন, আমার মাধ্যমে আপনি কি তাঁকে কোনো মেসেজ পাঠাতে চান?’

একটু ইতস্তত করে নম্রতা বলল, ‘না। তারপর চাপা গলায় যোগ করল, ‘আপনাকে আমি যতটা কুটিল বলে মনে করেছিলুম, দেখছি আপনি তার চেয়েও বেশি।’ বলে পেছন ফিরে বাড়ির দিকে রওনা দিল।

গেট থেকে বেরিয়ে জয়ন্ত বেশ অনেকক্ষণ চুপ করে গাড়ির দরজাটা ধরে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ‘কী আশ্চর্য!’

দময়ন্তী মৃদু হেসে বলল, ‘কী আশ্চর্য?’

‘আরে, নম্রতার মধ্যে যে এতটা উগ্রতা লুকিয়েছিল ধরতেই পারিনি। আর, হঠাৎ এ হেন বিস্ফোরণের কারণটাই বা কী? সরফ পরিবার সন্দেহ করছে যে কেউ তোমাকে নিয়োগ করে এই ঘটনার দায়িত্ব ওদের ঘাড়ে চাপিয়ে কোনো ফায়দা ওঠাতে চাইছে?’

দময়ন্তী ঘাড় নেড়ে বলল, ‘হ্যাঁ। তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। ওদের কি সত্যিই কোনো দায়িত্ব নেই বা ছিল না?’

জয়ন্তর মুখ পুনরায় গোমড়া হয়ে গেল। বলল, ‘জানি না।’

দময়ন্তী চিন্তিত মুখে বলল, ‘আরও ভেতরে যেতে হবে জয়ন্ত। মনে হচ্ছে অনেক কাদা ঘাঁটতে হবে। তবে...’

‘তবে কী?’

‘হত্যাকারীর লক্ষ্য তেজপালই ছিলেন। তিনি কোনো দুর্ঘটনার শিকার নন।’

‘কী করে বুঝলে?’

‘পকেটে টর্চ ছিল না যে।’

৬

তেজপাল আগরওয়ালের বাড়ি পুরোনো লালকুঠিপাড়ায়। তিনতলা প্রকাণ্ড বাড়ি। মাঝখানে উঠোন, তাকে তিন-থাক চওড়া বারান্দা পরপর উঠে গেছে তিনতলা পর্যন্ত। কিন্তু লোকজন খুব বেশি আছে বলে মনে হল না। যারা ঘোরাঘুরি করছে তারা কাজের লোক— বাড়ির লোক নয়।

জয়ন্ত পথ দেখিয়ে চওড়া সিঁড়ি দিয়ে ওপরে নিয়ে চলল। দেখা গেল একতলাটা মোটামুটি গুদোম। দোতলার যতটুকু দেখা গেল সেটুকু অফিস হিসেবেই ব্যবহার হয়। তিনতলায় ঢোকার মুখে লোহার গ্রিল লাগানো প্রকাণ্ড দরজা। পৃথিবীর যেকোনো চোরই এ হেন একটা দরজা দেখলে বিমর্ষ হয়ে পড়বে।

বেল বাজানোর দরকার হল না। দরজার মুখেই দাঁড়িয়েছিলেন এক অতিকায় পুরুষ। খুব যে লম্বা তা নয়, কিন্তু অসম্ভব চওড়া— চতুর্দিকেই চওড়া, ফলে মাথার ওপর আলো

থাকলে এঁর পায়ের নিচে যে ছায়াটা পড়ে সেটা প্রায় একটা নিখুঁত বৃত্তই হয় বলে সকলের মনে হল।

সমরেশ ফিসফিস করে দময়ন্তীকে বলল, 'দরজাটা যে কেন এত বড়ো এবার বুঝেছ?'

সমরেশ কথাটা শেষ করবার আগেই জয়ন্ত দরজাস্থিত বপুটিকে সম্বোধন করে বলল, 'রাজেশবাবু, যাঁকে আনব বলেছিলুম, তাঁকে নিয়ে এসেছি।'

রাজেশবাবুর শরীরটি যত বড়োই হোক না কেন, কণ্ঠস্বরটি আশ্চর্য রকমের মিহি, একেবারে হিংটিংছটের যবন পণ্ডিতদের গুরুমারা চেলার উলটো। বিশুদ্ধ বাংলায় বললেন, 'আসুন আসুন। ভেতরে আসুন।'

ভেতরটি যেরকম আশা করা গিয়েছিল, মোটেই সেরকম নয়। যে বাড়ির বাইরে গোলাপি পরি, সবুজ হাতি আর ঘোড়ামার্কা হরিণের অলংকরণ, তার ভেতরে যে এরকম একটি ড্রইংরুম থাকতে পারে, তা চিন্তাই করা যায় না। ইনটিরিয়ার ডেকরেশনের বিলিতি বইয়ে যেরকম সব ছবি দেওয়া থাকে, ঠিক সেরকম। কী নেই সে ঘরে! দু সেট সোফা, একটা বাইরের লোকেদের জন্য, অন্যটা অন্তরঙ্গদের জন্য, রেডিয়ো, স্টিরিয়ো, এমনকী একটা টিভি সেটও, ফায়ার প্লেস, দেওয়াল থেকে দেওয়াল কার্পেট, নানা রকমের মূর্তি, ছবি— সব মিলিয়ে একটা অত্যন্ত কেতাদুরস্ত ব্যাপার।

দময়ন্তীরা বসলে পরে ভদ্রলোক একাই একটা সোফা জুড়ে বসে বললেন, 'বলুন জয়ন্তবাবু, আমি কীভাবে আপনাদের সাহায্য করতে পারি।'

জয়ন্ত মৃদু হেসে মাথা নেড়ে বলল, 'আমাকে নয় রাজেশবাবু, এঁকে একটু সাহায্য করুন। আপনার বাবার মৃত্যুরহস্য নিয়ে ইনি তদন্ত করবেন। এঁর পরিচয়...'

রাজেশ হাত নেড়ে বললেন, 'এঁর পরিচয়ের কোনো দরকার নেই। ইনি আমার কাছে যেরকম সাহায্য চাইবেন, তাই পাবেন। বলুন মিসেস দত্তগুপ্ত, আমি আপনার জন্যে কী করতে পারি?'

দময়ন্তী বলল, 'আপনি তো ভারি চমৎকার বাংলা বলেন! কোত্থেকে শিখেছেন?'

রাজেশ দন্তবিকাশ করে বললেন, 'বাঃ, আমি তো কলকাতার ছেলে। রিপন কলেজে পড়াশোনা করেছি। তার আগে হেয়ার স্কুল।'

'তাই নাকি? এখানে কত বছর আছেন?'

'তা প্রায় বিশ বছর হবে। পড়াশুনো করছিলুম, বাবা বিয়ে দিয়ে দিলেন, আর ব্যবসায় এনে লাগিয়ে দিলেন।'

'আপনার মেয়ের বয়স কত?'

'ওই রকমই। বিশ হবে।'

'একই মেয়ে আপনার?'

'হ্যাঁ। সে দিল্লিতে মামাবাড়ি থেকে পড়াশোনা করছিল। তা দিল্লির হালচাল তো জানেন। একদম সুবিধের নয়। তাই বছর খানেক হল এখানে এনে রেখেছি, বাড়িতেই পড়াশোনা করে প্রাইভেটে বিএ দেবে।'

'এ ঘর কি তারই সাজানো?'

কিছুটা স্নেহ কিছুটা গর্ব মেশানো হাসি হাসলেন রাজেশ। বললেন, হ্যাঁ। ওই কী সব বিলিতি বইটই দেখে সাজিয়েছে। আর কোনো কাজ তো বিশেষ নেই, এইসব করে সময় কাটায়। আমি বাধা দিইনি। যা করে করুক। এই তো একটা টিভি সেট বসিয়েছে। চলে না, কিছু না। কিন্তু ওই যে বইয়ে দেখিয়েছে ওখানে একটা টিভি সেট বসানো দরকার। তাই বসিয়েছে।'

'খুব সুন্দর লাগছে কিন্তু।'

বিগলিত হাসি হাসলেন রাজেশ। বললেন, 'আপনারা প্রশংসা করলেই ভালো লাগে।'

'আপনার আর সন্তান নেই?'

'আছে। তিনটি ছেলে। তারা ছোটো। তারাও দিল্লিতে থেকে পড়াশুনো করছে।'

'আচ্ছা, এবার কাজের কথায় আসা যাক। আপনার বাবা যেদিন মারা যান, সেদিনের কথা কিছু বলুন।'

দুঃখিত মুখে একটু চুপ করে থেকে রাজেশ বললেন, 'কি আর বলব, বলুন। অন্যান্য দিনের মতো সেদিনও সারাদিন উনি একতলায় অফিস ঘরে বসে কাজকর্ম করেন। আমার অফিস দোতলায়। সাড়ে ছটায় যেমন রোজ যাই, তেমনি অফিস বন্ধ করে খাতাপত্র নিয়ে নীচে নামি। দুজনে একসঙ্গে খাতাপত্র মিলিয়ে আলমারিতে চাবি দিয়ে আমি তিনতলায় চলে আসি। ওঁর হার্টের অসুখ ছিল বলে উনি তিনতলায় আসতেন না। এক তলাতেই অফিস ঘরের পাশে ওনার শোবার ঘর ছিল। আটটার সময় আমাদের কুক গিরিধারী ওঁর খাবার নিয়ে নীচে যায়। উনি খাওয়াদাওয়া করে শুয়ে পড়লে, ও ওপরে চলে আসে।'

'আপনার স্ত্রী কি জীবিত?'

'হ্যাঁ। তবে তিনি অত্যন্ত অসুস্থ। শয্যাশায়ী।'

'ও। তারপর?'

'তারপর রাত দশটা থেকে শুরু হল গোলমাল। টেলিফোন, পুলিশ, লোকজন— উঃ, সে একটা রাত কেটেছে বটে! গিরিজা ছিল তাই, না হলে যে কী হত জানি না। ও তো একাই প্রায় সমস্ত ব্যাপারটা সামলালো। আমি এত হতভম্ব হয়ে পড়েছিলুম যে আমার মাথার ভেতরটা সব জট পাকিয়ে গিয়েছিল। কোনো কিছু ভাববার মতো ক্ষমতাই ছিল না।'

'যখন টেলিফোন আসে, আপনি কী করছিলেন?'

'ঘুমোচ্ছিলুম। আমি সাড়ে আটটা থেকে নটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ি।'

'আচ্ছা, আপনার বাবাও নিশ্চয়ই ওই সময়েই শুয়ে পড়েন রোজ?'

'হ্যাঁ। সেই রকমই তো জানতুম।'

'তাহলে সেদিন ওই সময় তিনি রামনাথবাবুর বাড়িতে কেন যাচ্ছিলেন, সেটা আন্দাজ করতে পারেন কি?'

'না।' বলে ঘনঘন মাথা নাড়লেন রাজেশ।

'কিন্তু উনি তো মাঝে মাঝেই রামনাথবাবুর বাড়িতে যেতেন। তাই না?'

'হ্যাঁ, যেতেন। কিন্তু সে তো দিনের বেলায় আর দাবা খেলতে। অত রাতে কী জন্যে যাচ্ছিলেন, সেটা বোঝা বেশ কঠিন।'

‘উনি আগে কখনও অত রাতে গেছেন কি ও বাড়িতে?’

‘জানি না। তবে, মাঝে মাঝে উনি রাত্রিবেলা বেরোতেন রাস্তায় পায়চারি করবার জন্য। দারোয়ানকে বলে যেতেন, সে দরজা খুলে অপেক্ষা করত। ডাক্তারের বারণ সত্ত্বেও যখন উনি মাঝে মাঝে বেশি খেয়ে ফেলতেন, তখনই বেরোতেন। তা নয় তো উনিও নটার মধ্যে শুয়ে পড়তেন। তবে হ্যাঁ, বেড়াতে বেড়াতে কখনও ওবাড়ি গেছেন কিনা তা বলতে পারব না।’

‘সেদিন বেরোনোর সময় কি দারোয়ানকে কিছু বলে বেরিয়েছিলেন?’

‘না, তেমন কিছু নয়। যেমন বলেন, দরজা খোলা রাখতে, তেমনি আর কী!’

‘সেদিন আপনাদের কী কী ফোন এসেছিল, মনে পড়ে আপনার?’ মানে, আপনার বাবার বিশেষ করে?’

‘সে রাত্রে আমাকে দারোগাবাবুও এই প্রশ্ন করেছিলেন। আমার মনে আছে যে তেমন কিছু আসেনি, কয়েকটা অফিসের কাজের ছাড়া।’

‘রামনাথবাবুর পরিবারের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন?’

‘খারাপ নয়। তবে আমার বাবার সঙ্গে যতটা ঘনিষ্ঠ আমার সঙ্গে ততটা নয়, কারণ রামনাথবাবুর সঙ্গে ওঁর বাল্যকালের পরিচয়। আমি যখন বড়ো হয়েছি, তখন দুটো পরিবার দু-জায়গায় আলাদা হয়ে গিয়েছে। তবে রামনাথবাবুর নাতনি নম্রতার সঙ্গে গিরিজার বেশ ভাব আছে।’

‘বিশ বছর আগে বিয়ের পর আপনি যখন ফুলডিহিতে আসেন, তখন কি রামনাথবাবুর ছেলে জীবিত ছিলেন?’

‘হ্যাঁ। ছিলেন। কিন্তু সে কথা কেন? সে তো বহুদিনের পুরোনো ব্যাপার।’ রাজেশ গম্ভীর হয়ে গেলেন।

‘পুরোনো কথা বলেই কি তার আর দরকার আসে না, রাজেশবাবু? আচ্ছা, শুনেছি একই দিনে রামনাথবাবুর ছেলে আর জামাই নিহত হয়। ঘটনাটা কী ঘটেছিল?’

রাজেশ বেশ কিছু সময় চুপ করে থেকে বললেন, ‘আমার মনে নেই।’

‘মনে আপনার আছে রাজেশবাবু। কেন আপনি বলতে চাইছেন না?’

‘দেখুন, সেসব অন্য ঘরের ব্যাপার। অন্যের কেচ্ছা কেলেঙ্কারি নিয়ে আমি কোনো কথা বলা পছন্দ করি না। তবে সে ঘটনার সঙ্গে এ ব্যাপারের কোনো যোগ নেই বলেই মনে হয়।’

‘বিশ বছর আগে ঘটেছে বলেই তার কোনো রিফ্লেকশন এ ব্যাপারে থাকবে না— এটা মনে হওয়ার কি কোনো বিশেষ কারণ আছে? তা ছাড়া, সে ঘটনা অন্য ঘরের ব্যাপার বলে চাপা দেওয়াটা কি ঠিক? বিশেষত যেখানে আপনার বাবার হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সেই পরিবার জড়িত হতে পারে?’

রাজেশ আবার চুপ করে থেকে বললেন, ‘দেখুন, সে ঘটনার কথা সত্যিই আমার তেমন কিছু মনে নেই। তখন নতুন ব্যবসা আর নতুন সংসার নিয়েই ব্যস্ত ছিলুম। তবে রামনাথবাবুর ছেলে আর জামাইয়ের মৃত্যুর পর ফুলডিহিতে একটা জোর গুজব উঠেছিল যে তাঁরা দুর্ঘটনায় মারা যাননি, নিহত হয়েছিলেন। রামনাথবাবু পুলিশেমহলে তাঁর প্রভাব

খাটিয়ে পুরো ব্যাপারটা ধামাচাপা দিয়ে দেন। তা না হলে তাঁর আর তাঁর পরিবারের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখা যেত না।'

'কে তাঁদের খুন করেছিল বলে লোক সন্দেহ করেছিল?'

'সেটা আমার সত্যিই মনে নেই।'

দময়ন্তী মৃদু হেসে বলল, 'রাজেশবাবু, আপনি সত্যিই একজন ভদ্রলোক। আপনার যদি বলতে সংকোচ হয় তো আমি বলছি। দুর্গাদাস গোয়েঙ্কার ছেলে, তাই না?'

বিস্মিত দৃষ্টি তুলে রাজেশ ওপরে নীচে মাথা নাড়লেন, বললেন, 'হ্যাঁ। তবে তার কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ ছিল না। কাজেই সেটা নিতান্তই ভ্রান্ত একটা কুৎসা হতে পারে।'

'সাক্ষ্যপ্রমাণ লুপ্ত করা হয়েছিল, তাও তো হতে পারে?'

'তা হতে পারে অবশ্য। তা ছাড়া, ঘটনাটার কয়েক দিন পরেই দুর্গাদাসের ছেলে দ্বারকাদাস ফুলডিহি ছেড়ে চলে যাওয়ায় গুজবটা বহুদিন চালু ছিল।'

'রামনাথের ছেলের বউ কি তার সঙ্গে একসঙ্গে গিয়েছিল, না আগে পরে?'

'অত্যন্ত লজ্জিত মুখে মাথা নীচু করে রাজেশ বললেন, 'একসঙ্গে।'

'তাঁরা কি বিবাহ করেছিলেন?'

লজ্জায় প্রায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে যেতে রাজেশ বললেন, 'না। তবে তাঁরা একসঙ্গে থাকতেন। দ্বারকাদাস কমলজিৎ সরফের দুই ছেলেকে নিজের ছেলের মতোই মানুষ করতেন।'

'করতেন মানে? এখন করেন না?'

'না। দ্বারকাদাস বছর পাঁচেক আগে মারা গেছেন।'

'কমলজিতের স্ত্রী আর ছেলেরা কোথায়?'

'বম্বেতেই থাকে।'

'ছেলেরা কী করে?'

'এদিক-ওদিক ব্যবসাপাতি করে। অবস্থা আর বিশেষ ভালো নেই।'

'আপনি এত কথা জানলেন কী করে?'

'বাবার কাছে শুনেছি। দ্বারকাদাস আর আমার বাবা বন্ধু ছিলেন। তাঁদের মধ্যে চিঠিপত্রের আদানপ্রদান ছিল।'

'দ্বারকাদাস যা করেছিলেন তার পরেও?'

'পুরুষমানুষের ওরকম একটু এদিক-ওদিক হতেই পারে। তাতে সামাজিক সম্পর্কে নিষেধ আসতে পারে, বন্ধুত্বে নয়।'

দময়ন্তী আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই খাবারের ট্রে হাতে যিনি ঘরে ঢুকলেন, তাঁকে দেখে সমরেশ একেবারে চমৎকৃত হয়ে পড়ল। ঘরটি তো এমনিতেই বম্বে ফিলম-এর সেটিং বলে মনে হচ্ছিল, এখন ইনি তো যেন একেবারে ফিলম-এর পর্দা থেকেই নেমে এলেন বলে মনে হল। পরমাসুন্দরী একটি মেয়ে, পোশাক-আশাক উগ্র অথচ মুখটি নিষ্কলুষ কোমল লাবণ্যে ভরা। এই নিষ্কলুষ কোমলতা কতটা স্বাভাবিক এবং

কতটা প্রসাধনের মাধ্যমে তৈরি করা বলা শক্ত। মেয়েটি দু-হাতে দুটি সাদা গ্লাভস পরে ট্রেটি বহন করছিল।

রাজেশ মেয়েটিকে ঢুকতে দেখে স্নেহ-বিগলিত কণ্ঠে বলল, 'এসো গিরিজা, এসো। এই দেখো, তোমার অতিথিরা সবাই উপস্থিত। তাদের কিছু দেখাশুনো করো।'

বীণানিন্দিত অথচ ন্যাকা ন্যাকা গলায় গিরিজা বলল, 'আমি তো এসে গেছি ড্যাডি। আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে না?' বলে পদ্মপলাশ লোচন দুটি চট করে একবার সমরেশের ওপর বুলিয়ে দিল। সমরেশ তাতে বড়ই কাতর হয়ে পড়ল।

পরিচয় পর্ব শেষ হলে রাজেশ বললেন, 'হাতে ও দুটো পরেছ কেন?'

জলতরঙ্গের মতো হেসে উঠে গিরিজা বলল, 'ও ড্যাডি, তুমি কিচ্ছু জানো না। এটা একটা হাইজিনিক ব্যাপার। ইউরোপে খাবার দেবার সময় সবাই হাতে গ্লাভস পরে নেয়, জানো না বুঝি?'

রাজেশ দন্তবিকাশ করে বললেন, 'হবেও-বা। ও দুটো পেলে কোথায়? কিনেছ?'

'না। কাল বিকেলে নম্রতার কাছ থেকে ধার করে এনেছি। ও যখন ল্যাবরেটরিতে কাজ করত তখন এগুলো ব্যবহার করত।'

রাজেশ বললেন, 'তা ভালো। এবার তাহলে খাবারগুলো দিয়ে দাও, তারপর ও দুটো খুলে ফেল। আমার দেখতে কীরকম বিচ্ছিরি লাগছে।'

'ও-কে ড্যাড।' বলে গিরিজা সবাইকে প্লেট সরবরাহ করে গ্লাভস দুটো খুলে ফেলে ঝপ করে সমরেশের পাশে বসে পড়ে দময়ন্তীকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি আমাকে জেরা করবেন না? আপনি হয়তো জানেন না, আমিই আমার দাদুকে খুন করেছি।' বলে খিলখিল করে জলতরঙ্গের মতো হেসে উঠল। সমরেশ তাতে আরও কাতর হয়ে কাষ্ঠ হাসিতে দাঁত বের করল।

দময়ন্তী কিন্তু সে হাসিতে যোগ দিল না। বিব্রত রাজেশকে বাধা দিয়ে বলল, 'নিশ্চয়ই তোমাকে জেরা করব। আর যদি তুমি খুন করে থাকো, তোমাকে জেলেও ঢোকাব।'

গিরিজা এইবার একটু গম্ভীর হয়ে গেল। বোধ হয় এরকম জবাব সে প্রত্যাশা করেনি। বলল, 'বেশ শুরু করুন।'

'নম্রতা আর তুমি খুব বন্ধু, না?'

'হ্যাঁ। খুব। অবশ্য নম্রতা আমার চেয়ে বয়সে কিছু বড়ো, তবুও আমরা খুব নিকট বন্ধু।'

'রামনাথবাবুর সঙ্গে তোমার দাদুর বন্ধুত্বও কী খুব নিকট ছিল?'

'ছিল বই কী!'

'না, ছিল না। রামনাথবাবু তোমার দাদুকে পছন্দ করতেন না।'

'একদম বাজে কথা! আপনাকে যদি কেউ একথা বলে থাকে তো সে মিথ্যে কথা বলেছে। দাদুকে পছন্দ করত না নম্রতা কিন্তু রামনাথবাবু আর দাদু খুবই বন্ধু ছিলেন, রোজ দাবা খেলতেন দুজনে।'

'নম্রতা তোমার দাদুকে পছন্দ করত না কেন?'

'তা জানি না। তবে দাদুর কথা উঠলে বা তাঁর গলা শুনলে গম্ভীর হয়ে যেত।'

‘কেন তার কোনো ধারণাই তোমার নেই?’

‘না। তবে দ্বারকাদাস গোয়েঙ্কা বলে কোনো একজন লোক এর মধ্যে আছে। কারণ, নম্রতাকে একদিন বলতে শুনেছিলুম, ওই এলেন তোর দাদু দ্বারকাদাসের হয়ে ওকালতি করতে। আমি তখন জিজ্ঞেস করেছিলুম, যে দ্বারকাদাস কে। তার উত্তরে নম্রতা বলেছিল সে একটা বাজে লোক। পরে দাদুকেও জিজ্ঞেস করেছিলুম। দাদুও কোনো জবাব দেয়নি, গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল।’

‘কতদিন আগে এসব কথাবার্তা হয়েছিল?’

‘তা বছর খানেক হবে। অক্টোবর কী নভেম্বর মাসে। আমার মনে আছে সেদিন বেশ কুয়াশা হয়েছিল। আমি আর নম্রতা সন্ধেবেলা ওদের বাড়ির বারান্দায় র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে বসে গল্প করছিলুম। এমন সময় ঘড়াং ঘড়াং শব্দ করে গেটটা খুলে গেল। আমি উঠে দেখতে যাচ্ছিলুম কে এল, তখনই নম্রতা ওই কথাগুলো বলে। অন্ধ হয়ে ওর অন্যান্য অনুভূতিগুলো তো ভীষণ বেড়ে গেছে। অনেক সময় গেট খোলার আওয়াজ পেলেই ও বলে দিতে পারে যে কে আসছে।’

‘দেওরাজ চৌধুরী বলে কাউকে তুমি চেন?’

‘দেওরাজ? চিনি বই কী! ওহ, হি ইজ এ স্ক্রিম!’

‘স্ক্রিম? তার মানে?’

‘মানে? মানে ভীষণ বোকা, ভীষণ মজার একটা ছেলে। হি থিঙ্কস হি ইজ এ হিরো। কিন্তু আসলে ও একটা ইঁদুর।’ বলে হি হি করে হাসতে লাগল গিরিজা। ‘আপনারা যদি ওকে দাদুর হত্যাকারী বলে গ্রেপ্তার করেন, তাহলে যে ও কী খুশিই হবে, কী বলব। ওর অনেক দিনের স্বপ্ন সার্থক হবে। জয়ন্তবাবু কী সব হিসেব করে ওকে ছেড়ে দিয়ে ওকে খুব দুঃখ দিয়েছেন। পুয়োর সোল, কোথায় বস্টন স্ট্র্যাংগলার, জ্যাক দ্য রিপারদের সঙ্গে একসঙ্গে নাম লেখা হবে, তা নয়, সব ভেস্তে দিলেন আপনারা।’

‘তুমি ওকে ঘনিষ্ঠভাবে চেনো মনে হচ্ছে?’

গিরিজা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, আমাদের এখানে একটি অবিবাহিত মেয়ের পক্ষে একটি ভিন্ন পরিবারের অবিবাহিত ছেলেকে ঘনিষ্ঠভাবে চেনা অসম্ভব। তবে, নম্রতার সঙ্গে ওর পরিচয় খুবই ঘনিষ্ঠ, ওদের বাড়িতে ওর যাতায়াত খুব। আর যেহেতু আমি নম্রতার খুব বন্ধু, সেহেতু আমাদের মধ্যে একটা পরিচয় রয়েছে, কথাবার্তাও হয়েছে, নম্রতার কাছেও ওর সম্পর্কে কিছু কিছু কথা শুনেছি। আমি যেসব ধারণা করেছি, সেসব এই ভাবেই হয়েছে।’

দময়ন্তী রাজেশের দিকে ফিরে বলল, ‘দেওরাজ সম্পর্কে আপনার ধারণা কী? ছোটো জায়গা, এখানে আপনারা নিশ্চয়ই ভালো করেই ওকে চেনেন।’

রাজেশ বলল, ‘চিনি বই কী! ভালো করেই চিনি। ছেলেটা চোয়াড়ে কিন্তু বুদ্ধিমান। কাজকর্ম তেমন কিছুই করে না বটে, কিন্তু করলে উন্নতি করত। আর কাজকর্ম করার দরকারই বা কী? নন্দকিশোরবাবু এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ, চুটিয়ে ব্যবসা করছেন। দেওরাজ দু-চার বছর এখনও গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াতে পারে। তারপর ব্যবসায় ঢুকলেই হল।’

দময়ন্তী চিন্তিত মুখে বলল, ‘তা বটে।’ তারপর আবার গিরিজার দিকে ফিরে বলল, ‘নম্রতার সঙ্গে তোমার খুব বন্ধুত্ব কী করে হল? তোমাদের বাড়ি তো কাছাকাছি নয়।’

গিরিজা বলল, 'বাঃ, আমরা এক স্কুলে পড়েছি তো। একসঙ্গে গার্ল গাইড করেছি, ক্যাম্পে গেছি। ও অবশ্য আমার চেয়ে সিনিয়র।'

'আচ্ছা, বেশ।' বলে দময়ন্তী কিছুক্ষণ গম্ভীর অন্যমনস্কভাবে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, 'রাজেশবাবু আমি কি একবার নীচে আপনার বাবার ঘরটা একটু দেখতে পারি?'

রাজেশ বললেন, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। গিরিজা, নীচে নিয়ে যাও, গিয়ে দরজাটা খোলার ব্যবস্থা কর। খোলা হলে নীচ থেকে টেলিফোন করো, তারপর ওঁদের নিয়ে যাবে।'

গিরিজা তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ও-কে ড্যাড।' বলে তিন লাফে দরজা পার হয়ে নীচে চলে গেল।

রাজেশ সেদিকে তাকিয়ে সস্নেহ হেসে বললেন, 'এখনও একেবারে ছেলেমানুষ।'

৭

তেজপাল আগরওয়ালের ঘরটি মোটামুটি নিরাভরণ। একটা সিঙ্গল খাট, একটা প্রকাণ্ড সিন্দুক, একটা রাইটিং ডেস্ক, একটা আলমারি এবং একটা আলনা— এই হল আসবাব। ঘরের দেওয়ালে তিনটে ছবি, একটি সিদ্ধিদাতা গণেশের, একটি পুত্র রাজেশের যৌবনকালের এবং অপরটি সপরিবার রাজেশের।

দময়ন্তী চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করে গিরিজাকে প্রশ্ন করল, 'তোমার ঠাকুমার কোনো ছবি নেই?'

গিরিজা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'না নেই। বাবার ঘরে ওঁর একটি ছবি আছে অবশ্য। দেখবেন? নিয়ে আসব?'

দময়ন্তী মাথা নেড়ে বলল, 'না। দরকার নেই। আচ্ছা, তোমার দাদু কি বেরোতে গেলেই সিল্কের পাঞ্জাবি পরে বেরোতেন?'

'হ্যাঁ। সেই রকমই তো দেখেছি।'

'উনি কি মাঝে মাঝে কলকাতা যেতেন?'

উত্তরটা দিলেন রাজেশ। বললেন ,'হ্যাঁ। ঘনঘন না হলেও মাঝে মাঝে যেতেন।'

'উনি যেদিন নিহত হন, তার দু-দিন পরে কলকাতা যাবার টিকিট ওঁর পকেটে ছিল। উনি কি জন্য কলকাতা যাচ্ছিলেন, আপনি জানেন?'

'না। উনি কেন কবে কলকাতা যাবেন, তা আমাকে আগে থেকে জানাতেন না বা জানানো প্রয়োজন মনে করতেন না। যাবার দিন বলতেন, আমি চললুম, দু-তিন পরে ফিরব।'

'ওঁর হার্টের অসুখ ছিল। আপনারা একা যেতে দিতেন কেন?'

'ওঁর সঙ্গে ওষুধ থাকত। তা ছাড়া তিনি একা যাওয়াই পছন্দ করতেন।'

'আচ্ছা, গিরিজা এই ছবিতে দেখছি একটা স্কুল ইউনিফর্ম পরে রয়েছে। কোন স্কুল?'

গিরিজা বলল, 'সেন্ট বার্নাবাস কনভেন্ট স্কুল। এটাও কি দাদুর হত্যারহস্যের একটা সূত্র নাকি? না, এমনি কৌতূহলের বশে প্রশ্নটা করলেন?'

দময়ন্তী মৃদু হেসে বলল, 'বলব কেন?' তারপর রাজেশকে নমস্কার করে বলল, 'আচ্ছা, তাহলে আজ চলি রাজেশবাবু। আজকের মতো আমার কাজ শেষ। যদি প্রয়োজন মনে করি, তাহলে হয়তো ভবিষ্যতে আবার আপনাকে বিরক্ত করতে আসব।'

৮

দময়ন্তী চান-টান করে বসবার ঘরে ঢুকে দেখে জয়ন্ত অত্যন্ত ব্যাজার মুখ করে একটা চেয়ারে বসে আছে, আর সমরেশ এক মনে একটা স্পোর্টস জার্নাল পড়ে যাচ্ছে।

'কী হল জয়ন্ত তোমার? অমন মুখ করে বসে আছ কেন?' সহাস্যে জিজ্ঞেস করল দময়ন্তী।

'মুখের আর দোষ কী বলো?' জয়ন্ত বলল, 'ভাবছি। আর, যতই ভাবছি, ততই সব জট পাকিয়ে যাচ্ছে। আমি মাস্টার মশাইয়ের পরিবারকে যতটা ছেড়ে ছেড়ে তদন্ত করেছি, তুমি তো তা করোনি। কাজেই তোমার সঙ্গে থেকে অজস্র সূত্র এসে গেছে। কোনটা ছেড়ে কোনটা ধরব, বুঝতে পারছি না।'

দময়ন্তী একটা ডিভানের ওপর বসে বলল, 'কী কী সূত্র পেলে, শুনি?'

'এই তো দেখ না, সম্ভাব্য হত্যাকারীর সংখ্যা হঠাৎ ভীষণ বেড়ে গেল।'

'কীরকম?'

'প্রথমে ধরো, রামনাথ সরফের কথা। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে তিনি তেজপালকে পছন্দ করতেন না। কেন করতেন না তা তিনি বলেননি বটে, কিন্তু আমরা জানি দ্বারকাদাস, যে তাঁর সংসার ছারখার করে দিয়েছে, আর তেজপালের বন্ধুত্ব তাঁর পক্ষে সহ্য করা কঠিন ছিল। এবং হয়তো তেজপাল তাঁকে চাপাচাপি করেছিলেন তাঁর দুই নাতিকে ফেরত নেবার জন্য। সেটা হয়তো তাঁর পক্ষে আরও অসহ্য বলে মনে হয়েছিল। তা ছাড়া তেজপাল কেন সে রাত্রে তাঁর বাড়িতে আসছিলেন তাও সম্ভবত তিনি জানেন, কিন্তু বলতে অস্বীকার করেছেন। নিশ্চয়ই সেকথা গোপন করলে তাঁর লাভ আছে।

'দ্বিতীয়ত, নম্রতা। গিরিজার সাক্ষ্য অনুসারে সেও তেজপালকে পছন্দ করত না। সে বন্দুকবাজ পরিবারের মেয়ে। তার পক্ষে বন্দুক চালাতে জানা অসম্ভব নয়। রাত্রিবেলা গেটের শব্দ শুনে সে হয়তো শব্দভেদী গুলি ছুড়েছিল। হাতে গ্লাভস পরে নিয়েছিল বলে আঙুলের ছাপ পড়েনি বন্দুকে। সে অন্ধ। যদিও সে জানে তাকে কেউ সন্দেহ করবে না, তবু হয়তো সে উগ্রতা দেখিয়ে বেরিয়ে যেতে চাইছে। মানে, যাকে বলে অফেন্স ইজ দ্য বেস্ট ডিফেন্স।

'তৃতীয়ত, রামনাথের দুই নাতি। এদের বয়স চব্বিশ আর বাইশ। খুব ছোটোবেলা থেকে কুৎসিত পরিবেশে মানুষ। এখন এদের অবস্থা পড়ে গেছে। এরা যদি এই খুনটা সাজিয়ে থাকে, তাহলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। রামনাথ বা নম্রতা যে বারংবার বলছেন যে কেউ তোমাকে এই তদন্তে লাগিয়ে কোনো স্বার্থসিদ্ধি করতে চাইছে, তখন হয়তো এই দুজনকেই চিন্তা করছেন তাঁরা। রামনাথ বা নম্রতার যে কেউ ফেঁসে গেলে কাদের লাভ, বুঝতে তো কোনো অসুবিধে হয় না। রামনাথের সম্পত্তির প্রতি তাদের সংগত কারণেই লোভ থাকা স্বাভাবিক। আর পিতৃঘাতক বিপিতা দ্বারকাদাসের সঙ্গে তেজপালের বন্ধুত্ব থাকায় তাঁর ওপর ওদের প্রচণ্ড রাগ থাকাও অসম্ভব নয়। এই হত্যাকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে তারা হয়তো এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চাইছে।

‘চতুর্থত, দেওরাজ...’

দময়ন্তী বাধা দিল। বলল, ‘উঁহু। দেওরাজ বলবে না। আগে তার সঙ্গে দেখা করি, তারপর তার সম্বন্ধে কথা। কিন্তু তুমি আরও দুজনকে ছেড়ে যাচ্ছ।’

জয়ন্ত আরও বিমর্ষ মুখ করে বলল, ‘আরও দুজন? তারা আবার কারা?’

‘আনোয়ার আর নাসির। সেই রিক্সাওয়ালা দুজন।’

জয়ন্ত সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞেস করল, ‘তুমি ঠাট্টা করছ না তো?’

দময়ন্তী ফিকে হাসল। বলল, ‘মোটেই নয়। বাংলায় বলে জানো তো— যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখো তাই, পাইলেও পাইতে পার...’

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বলল, ‘যাই বলো না তুমি, আনোয়ার আর নাসির কক্ষণও তোমার ওই অমূল্য রতন হতেই পারে না।’

দময়ন্তী এবার একটু জোরে হেসে উঠল। বলল, ‘সে তো তুমি রামনাথ সম্পর্কেও এই একই কথা বলেছিলে, মনে আছে? আর শুধু আনোয়ার আর নাসির কেন? রাজেশ আগরওয়ালকেও তুমি বাদ দিতে পারো না। লক্ষ করে দেখো, তেজপাল মারা যাওয়াতে সদ্য সদ্য লাভ হয়েছে কিন্তু তাঁর। তা ছাড়া, অন্য একটা কারণেও হয়তো তাঁর বাপের প্রতি অসন্তোষ ছিল।’

‘কী কারণ?’

‘আমার বিশ্বাস, তেজপাল দুশ্চরিত্র লোক ছিলেন।’

‘চমৎকার! তুমি বেশ সুচারুভাবে আমাকে আপাদমস্তক গুলিয়ে দিয়েছ। এখন চলো তাহলে, মাথার কাজটা সাময়িকভাবে বন্ধ রেখে খাওয়াটা সেরে নেওয়া যাক। তারপর বিকেলবেলা আবার বেরোনো যাবে।’

সমরেশ অবিলম্বে স্পোর্টস জার্নাল বন্ধ করে বলল, ‘উত্তম প্রস্তাব।’

৯

নতুন লালকুঠিপাড়ার একেবারে মুখেই নন্দকিশোর চৌধুরীর অতি সুদৃশ্য বাংলো। আধুনিক আর্কিটেকচারের একটি সুন্দর নিদর্শন। সামনে প্রশস্ত লন বুক-সমান উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পেছনে ও দু-পাশে প্রচুর গাছপালা ও বাগান। গেটে একজন নেপালি ইউনিফর্ম পরিহিত দারোয়ান আর লনের চারদিকে পাথরে বাঁধানো রাস্তার ওপর সঞ্চরমান গোটা তিনেক ডোবারম্যান আর দুটো গ্রেট ডেন কুকুর। বাড়ির মালিক কেন যে পাঁচিলটা বেশি উঁচু করেননি, তা বেশ স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছিল।

দময়ন্তী গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। বলল, ‘আমি কিন্তু ভেতরে যাব না।’

জয়ন্ত আশ্চর্য হয়ে বলল, ‘কেন?’

‘এমনি। তুমি দেওরাজকে বাইরে আসতে বলো। আমরা এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলব।’

একটি সম্পূর্ণ অপরিচিত মোটা গলা পেছন থেকে বলল, ‘আপনি কুকুরগুলোকে ভয় পাচ্ছেন, না? ভয় নেই। আমি ব্যবস্থা করছি।’

তিনজন পেছন ফিরে বক্তার দিকে তাকাল। ইনি ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত একজন অবাঙালি ভদ্রলোক, অত্যন্ত সুপুরুষ যদিও মুখে বয়সের ছাপ আর অপ্রকট নেই, চকচকে কালো চুল স্পষ্টতই কলপ লাগানো, তীক্ষ্ন চোখে রিমলেস সোনার ফ্রেমের চশমা।

জয়ন্ত বলল, 'আরে নন্দকিশোরবাবু যে! আমরা এসে গেছি। আপনাকে তো আগেই বলে রেখেছিলুম।'

নন্দবাবু সোনা বাঁধানো দাঁত বের করে হাসলেন। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঠিক আছে। দেওরাজকেও বলে রেখেছি, সে বাড়িতেই আছে। আপনারা একটু দাঁড়ান, আমি কুকুরগুলোকে বেঁধে রেখে আসছি।' বলে ভদ্রলোক গেটের কাছে এগিয়ে গিয়ে জোরে ডেকে হিন্দিতে বললেন, 'দেওরাজ। কুকুর বাঁধো।'

অমনি ঘরের ভেতর থেকে একটা দীর্ঘ তীক্ষ্ন শিসের আওয়াজ ভেসে এল আর তৎক্ষণাৎ কুকুরগুলো একদৌড়ে ঘরের ভেতর চলে গেল।

নন্দবাবু হেসে বললেন, 'আমার ছেলের গুণ দেখেছেন তো? কুকুর ট্রেনিং দিতে সে ওস্তাদ। আর কিছু না পারুক, এটা পারে। এবার ভেতরে চলুন, কোনো ভয় নেই।'

নন্দকিশোরের বাড়ির ভেতরটা বাইরের মতোই সুদৃশ্য বটে, তবু দময়ন্তী ভেতরে ঢুকতে চাইল না। নার্ভাস হাসি হেসে বলল, 'আমরা এই লনেই বসি না? এই তো বেশ ভালো হাওয়া দিচ্ছে।'

নন্দকিশোরবাবু সহাস্যে বললেন, 'এখনও ভয় গেল না? আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি দেওরাজকে এখানেই পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনারা ততক্ষণ এই বেতের চেয়ারগুলোতে বসুন।' বলে ভেতরে চলে গেলেন।

দেওরাজ যখন বেরিয়ে এল, তখন সকলেই কিন্তু তাকে দেখে একটু আশ্চর্য হয়ে গেল। শোনা গিয়েছিল সে অত্যন্ত দুশ্চরিত্র, দরকচা মারা চেহারা, অতিশয় শয়তান ইত্যাদি, কিন্তু জলজ্যান্ত লোকটাকে কিন্তু অতটা ভয়ঙ্কর বলে মনে হল না। সে রোগা সন্দেহ নেই, বেশ লম্বা, মাথায় বড়ো বড়ো চুল কিন্তু মুখটা কেমন যেন বিষণ্ণ, অন্যমনস্ক। দুশ্চরিত্র লোকেদের সাধারণত চোখদুটি চঞ্চল আর সতর্ক হয়, কিন্তু এর চোখদুটি শান্ত, অনুগ্র।

মৃদু হেসে সবাইকে নমস্কার করে দেওরাজ একটি চেয়ার টেনে বসল। দময়ন্তীকে সম্বোধন করে বলল, 'আমাদের পরিচিত হবার দরকার নেই, কারণ আমি আপনাদের চিনি, আপনারাও আমাকে চেনেন। শুনেছি, তেজপাল আগরওয়ালের হত্যারহস্যের আপনি তদন্ত করছেন এবং আমার কাছে কিছু সংবাদ আপনি চান বা জেরা করতে চান। তাহলে দেরি না করে শুরু করে দিন।' কথাগুলো নীচু গলায় বলা হলেও তার মধ্যে যে একটা রূঢ় ঔদ্ধত্য ছিল সেটা সকলেরই কানে বাজল।

দময়ন্তী কিন্তু সেটাকে পাত্তা দিল না। বেশ সহজভাবে বলল, 'আমি আপনাকে জেরা করতেই এসেছি। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, যে কজনকে হত্যাকারী বলে সন্দেহ করা হচ্ছে, তার মধ্যে আপনি অন্যতম?'

'জানি। তাহলে জেরা করুন। আপনার সব প্রশ্নেরই সাধ্যমতো জবাব দেব আমি।'

দময়ন্তীর প্রথম প্রশ্ন শুনে সকলেই হতবাক। 'আপনি কী জানেন যে দুশ্চরিত্র বলে আপনার একটা ভয়ানক বদনাম আছে?'

রক্তিম মুখে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দেওরাজ বলল, 'তেজপালের মৃত্যুর সঙ্গে আপনার এই প্রশ্নের কী সম্পর্ক আছে আমি জানি না। আর যদিও এটা একটা ব্যক্তিগত

প্রশ্ন, তবু আমার বলতে বাধা নেই যে, হ্যাঁ, আমি জানি। তবে আমি কোনো পরিবারের মধ্যে হাত বাড়াই না, পেশাদার বাজারের মেয়েছেলের কাছে মাঝে মাঝে যাই বটে!'

'আপনার যেতে ভালো লাগে?'

অনেকক্ষণ নতমস্তকে নীরব থেকে দেওরাজ মুখ তুলে বলল, 'না। অত্যন্ত খারাপ লাগে।'

'তবু যান কেন?'

'মাঝে মাঝে ভেতরে একটা তীব্র আর্জ আসে। তখন যাই। কিন্তু, পরে মুখের ভেতরটা তেতো হয়ে থাকে। কিন্তু এসব জেনে আপনার লাভ কী?'

'পরে বলব। আপনি আদৌ এ পথে পা বাড়িয়েছিলেন কেন?'

বিষণ্ণ মুখ আকাশের দিকে তুলে দেওরাজ বলল, 'একটি মেয়ে আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। টাকার লোভে সে আমাকে অপমান করেছিল। তখন সমস্ত নারীজাতির ওপর আমার একটা প্রচণ্ড ঘৃণার সৃষ্টি হয়। একজনকে অপমান করে আমি গায়ের ঝাল মেটাতে চেয়েছিলুম। তাই গিয়েছিলুম। পয়সা দিয়ে যা খুশি অপমান করব, তাই।'

'পরে সেটা কিছুটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়?'

'হ্যাঁ।'

'সে মেয়েটি কে?'

'একটি বাঙালি মেয়ে। ফুলডিহি ব্যারাজের টাইম কিপারের মেয়ে, যার নাম ছিল রানি, কিন্তু তার মনোবৃত্তি ছিল ছোটোলোকের।'

'আপনি যে বিরাট বড়োলোক, সেটা সে জানত না?'

'না। আমি বলেছিলুম, আমি নন্দকিশোর চৌধুরীর একজন সরকার। সামান্য মাইনে পাই। আমার ধারণা ছিল, আমার অনেক টাকা আছে জানলে সে আর এগোবে না। আমার মস্ত ভুল হয়েছিল। হঠাৎ সে একদিন অদৃশ্য হয়ে যায়। যাবার আগে আমাকে একটা চিঠি লিখে রেখে যায়, তাইতে ব্যাপারটা বুঝতে পারি।'

'আপনি যে বাজে জায়গায় যান, সেটা কি প্রকাশ্যে না গোপনে?'

'আমাদের সমাজে প্রকাশ্যে যাওয়া কি সম্ভব?'

'না, তা অবশ্য নয়। তাহলে, আপনার এই বদনামটা রটাল কে?'

'কে আবার? যারা আমাকে ওখানে দেখেছে, তারাই। আমাদের সকলেই তো আর সাধুপুরুষ নয়।'

'যারা আপনাকে ওখানে দেখেছে বলছেন, তাদের কাউকে কি আপনি চেনেন?'

'কাউকে কাউকে চিনি।'

'তেজপাল আগরওয়াল কি তাদের মধ্যে একজন?'

বেশ কিছুক্ষণ স্তম্ভিত মুখে দময়ন্তীর দিকে তাকিয়ে রইল দেওরাজ, তারপর আস্তে আস্তে একটা ব্যঙ্গাত্মক বাঁকা হাসিতে মুখটা বিকৃত হয়ে গেল। বলল, 'ও, এতক্ষণ এতসব সহানুভূতিসূচক কথাবার্তার কারণটা এইবারে বুঝলুম। তেজপালকে খুন করার কি মোটিভ

আমার থাকতে পারে সেটা বের করাই আপনার আসল উদ্দেশ্য। সে আমার নামে বদনাম রটিয়েছে আর তাই আমি তাকে খুন করেছি।'

দময়ন্তী মৃদু হেসে বলল, 'আপনি যা বুঝেছেন তা খানিকটা সত্য, সর্বাংশে সত্য নয়।'

'সর্বাংশে সত্যটা কী?'

'সেটা পরে বলব। তবে আপনাকে এটুকু বলতে পারি, আমার প্রশ্নের জবাব দিলে আপনি অকারণে বিপদে পড়বেন না।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে জোরে জোরে হেসে উঠল দেওরাজ। বলল, 'সে কথা বিশ্বাস করা শক্ত। তা হোক, তবু আমি আপনার প্রশ্নের জবাব দেব। হ্যাঁ, তেজপাল আগরওয়াল আমাকে বেশ্যাপল্লিতে যাতায়াত করতে দেখেছেন, কারণ তিনিও সেখানে একদা নিয়মিত খরিদ্দার ছিলেন। তিনিই আমার নামে বদনাম রটান।'

'যেদিন তেজপাল নিহত হন, সেদিন লোড শেডিংয়ের মধ্যে আপনি রাস্তায় ঘোরাঘুরি করছিলেন কেন?'

'এ পাড়ায় সকলেই জানে যে রাত্রি ন-টার পর আমি রাস্তায় নিয়মিত পায়চারি করি আমার কুকুরগুলোকে নিয়ে। এতে তাদের স্বাস্থ্যও ভালো থাকে, আমারও থাকে।'

'সেদিন আপনার সঙ্গে কুকুরগুলো ছিল না কেন?'

'ছিল। আমার সঙ্গে দুজন রিক্সাওয়ালার ধাক্কাধাক্কি লাগার পর আমি যখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাই, তখন তারা বাড়ি চলে যায়।'

'প্রভুভক্ত কুকুরের পক্ষে এটা একটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক ব্যবহার নয় কি?'

দেওরাজ একটা ধাঁধা-লাগা হাসি হাসল। বলল, 'অস্বাভাবিক কি? জানি না। কিন্তু ব্যাপারটা কী? আপনার উদ্দেশ্য তো রামনাথকে হত্যাকারী বলে প্রমাণিত করা। তা আমাকে এসব প্রশ্ন করে ফাঁসিয়ে দেবার ভয় দেখিয়ে বা ব্ল্যাকমেল করে আপনি কি আমাকে দিয়ে সাক্ষ্য দেওয়াতে চান যে আমি দেখেছি রামনাথই হত্যাকারী? যেহেতু আমি সেখানে নিজে উপস্থিত ছিলুম, অতএব আমার সাক্ষ্যই সবচেয়ে জোরদার হবে, এই ভেবেছেন আপনি? কিন্তু, আমি আপনাকে স্পষ্ট জানিয়ে রাখছি যে প্রয়োজন হলে আমি সমস্ত দোষ নিজের ঘাড়ে নেব, তবু অন্যের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেব না।'

দময়ন্তী তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে দেওরাজের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। মৃদু গলায় বলল, 'আপনারা নিশ্চিত যে আমি রামনাথকে ফাঁসানোর জন্য এসেছি, তাই না?'

কোনো জবাব না দিয়ে দেওরাজ ওপরে নীচে ঘাড় নাড়ল।

দময়ন্তী বলে চলল, 'আপনি এ বিষয়েও নিশ্চিত যে রামনাথ হত্যাকারী নন, তাই না?'

দেওরাজ এবারও জবাব দিল না। পূর্ববৎ ঘাড় নাড়ল।

'কিন্তু, আপনি জানেন হত্যাকারী কে এ বিষয়েও আপনি নিশ্চিত, তাই না?'

এবার দেওরাজ বিরাট জোরে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে কোনোরকমে দম নিয়ে বলল, 'মিসেস দত্তগুপ্ত, আপনার বুদ্ধির খুব সুনাম শুনেছি। কিন্তু আজ দেখছি, দূর থেকে যতটা শোনা যায়, কাছে এলে ততটা আর মনে হয় না। আমি দুঃখিত মিসেস দত্তগুপ্ত, কে হত্যাকারী হতে পারে এ বিষয়ে আমার সামান্যতম ধারণাও নেই।'

দময়ন্তী আগের মতোই মৃদু গলায় বলল, 'মিস্টার চৌধুরী, আমার সামান্য বুদ্ধিতে আমি বুঝতে পারছি যে আপনি জানেন যে হত্যাকারী কে। আপনি তাকে স্বচক্ষে দেখেছেন এবং আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাকে আড়াল করে রাখতে চাইছেন।'

দেওরাজ আর হাসছিল না, অবিশ্বাসী দৃষ্টিতে দময়ন্তীর মুখের দিকে চেয়ে ছিল। দময়ন্তীর কথা শেষ হবার পরও অনেকক্ষণ গম্ভীর চিন্তিত মুখে চুপ করে রইল। তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'আমি কাউকে দেখিনি, আমি কিছু জানি না। আমার আপনাকে আর কিছু বলবার নেই।' বলে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে বাড়িতে চলে গেল।

১০

দেওরাজ ভিতরে চলে যাওয়ার পরও তিনজনে বসে রইল। দেওরাজের সঙ্গে ইন্টারভিউটা এরকম দাঁড়াবে স্পষ্টতই কেউই তা অনুমান করেনি।

জয়ন্ত বলল, 'আমি এটুকু বুঝতে পারছি যে তুমি তোমার সন্দেহভাজনদের লিস্ট থেকে দেওরাজের নামটা কেটে দিয়েছ, তাই না?'

দময়ন্তী মাথা নাড়ল। বলল, 'না, তোমার অনুমান সম্পূর্ণ ভুল। আমার লিস্টে দেওরাজের নাম আগে যেখানে ছিল, এখন তার চেয়ে আরও ওপরে উঠে এসেছে।'

'কী আশ্চর্য! আমি তো ভাবছিলুম তুমি কে হত্যাকারী তা ধরেও ফেলেছ বোধ হয়।'

'না, জয়ন্ত। এখনও ধরতে পারিনি। তুমি যাদের সন্দেহ করছ, আমিও তাদেরই সন্দেহ করছি। তবে, মনে হচ্ছে অন্ধকার কেটে যাবে। তার কিছু কিছু লক্ষণও দেখতে পাচ্ছি।'

'কি যে তুমি দেখতে পাচ্ছ তুমিই জানো। এখন আমরা তাহলে কী করব?'

'তুমি একবার ভেতরে গিয়ে নন্দকিশোরবাবুকে ডেকে আনতে পারো? তার সঙ্গে কিছু কথা বলতে পারলে ভালো হত।'

ডাকার দরকার হল না। দময়ন্তীর কথার মধ্যেই ভদ্রলোক বারান্দায় বেরিয়ে এসেছিলেন। তিনজনে একসঙ্গে তাঁর দিকে তাকাতে, বারান্দা থেকে নেমে এসে একটা চেয়ার অধিকার করে বসে দময়ন্তীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি আমাকেও জেরা করতে চান?'

দময়ন্তী মৃদু হেসে বলল, 'হ্যাঁ। যদি আপনি কিছু মনে না করেন।'

'না, না, মনে করব কেন? আপনি কি আমাকেও সন্দেহ করেন নাকি?'

'করি। ব্যবসাসূত্রে আপনার আর তেজপালের মধ্যে শত্রুতা থাকা অসম্ভব নয়।' দময়ন্তী তখনও হাসছে।

এবার নন্দকিশোরও হেসে উঠলেন। বললেন, 'তা হয়তো নয়। তবে তা যদি হত, তাহলে কি আর আমি তেজপালকে নিজে খুন করতুম? গুন্ডা লাগিয়ে ধানবাদ বা কলকাতার যেসব কুৎসিত পল্লিতে ওর যাতায়াত, সেখানেই ওকে শেষ করিয়ে দিতুম। তাতে রিস্ক অনেক কম হত। তবে তার চেয়েও বড়ো কথা, ওর আর আমার ব্যবসার মধ্যে কোনো স্বার্থের দ্বন্দ্ব নেই বা ছিল না।'

'আচ্ছা, ওকথা বাদ দিন। আসলে, আপনাকে আমি যে প্রশ্নটা করতে চাই তা হল, দেওরাজ তেজপালকে খুন করেছে বলে পুলিশ যে সন্দেহ করছে, সে বিষয়ে আপনি কী

বলেন?'

নন্দকিশোর হাত নেড়ে বললেন, 'আমি আর কী বলব বলুন? আমি ওর বাপ, ওর সম্পর্কে আমার ধারণা তো পক্ষপাতশূন্য হতে পারে না। তবু আমার ধারণা, যদি জানতে চান তো বলি। আমার বিশ্বাস ও খুন করেনি, কারণ খুন ও করতে পারে না, যতই ওর বদনাম থাক না কেন। তবে, যদি করত তাহলে ওকে আমি আশীর্বাদ করতুম।'

'তেজপাল কি এতই অসৎ লোক ছিলেন?'

'তেজপালের মতো এরকম আদ্যন্ত শয়তান দুনিয়ায় খুব বেশি জন্মায় না।'

'তাই যদি হবে, তাহলে আপনারা রামনাথকে সাবধান করে দেননি কেন?'

'করে দিয়েছিলুম, কিন্তু তাতে খুব লাভ হয়নি। তার কারণ, প্রথমত তেজপাল আর রামনাথের দুই পরিবার দীর্ঘদিনের পরিচিত, আর দ্বিতীয়ত, বৃদ্ধ বয়সে রামনাথকে দাবার নেশায় পেয়েছিল আর তেজপাল ভালোই দাবা খেলত। কাজেই, রামনাথের বাড়ির দরজা তেজপালের জন্য খোলাই থাকত। আমরা বন্ধ করাতে পারিনি। তবে, একথা বলব, রামনাথ তেজপালের সঙ্গে দাবা খেলতেন ঠিকই, কিন্তু তাকে কখনই বিশ্বাস করতেন না বা পছন্দ করতেন না।'

'একজন কিন্তু বলেছেন যে কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। রামনাথ আর তেজপালের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল।'

'কে বলেছে? রাজেশ তো? ও তো তা বলবেই। রামনাথ যদি ফেঁসে যান, মামলামোকদ্দমায় তাঁর টাকা পয়সা যদি লাটে ওঠে, তাহলে কমলজিতের দুই কুপুত্তুর ওর ঘাড়ে চড়তে পারে, এ ভয় তার আছে। কাজেই, সে রামনাথের বিরুদ্ধে কিছু তো বলবেই না এখন, এমনকী রামনাথের বিরুদ্ধে যেতে পারে এমন কোনো কথাও সে বলবে না।'

দময়ন্তীর চোখ দুটো ছোটো হয়ে এল। সংযত গলায় বলল, 'আর একটু খোলসা করে বলুন।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে নন্দকিশোর বললেন, 'খোলসা করে কী আর বলব। বড্ড নোংরা ব্যাপার। কমলজিতের স্ত্রী লতা তার স্বামীর মৃত্যুর পর দ্বারকাদাস গোয়েঙ্কা বলে একটা লোকের সঙ্গে দুই শিশুপুত্রকে নিয়ে ইলোপ করে। দ্বারকাদাসকে তার বাপ তৎক্ষণাৎ ত্যাজ্যপুত্র করেন এবং সে বোম্বাইতে গিয়ে সিনেমার ব্যবসা শুরু করে। এরকম লোকের সঙ্গে ভদ্রলোকেরা সাধারণত সংশ্রব রাখেন না, কিন্তু তেজপাল অন্য ধাতুর লোক ছিল। সে দ্বারকাদাসের সঙ্গে রীতিমতো সম্পর্ক বজায় রেখে চলল। দ্বারকাদাসও অত্যন্ত পাজি লোক ছিল, কিন্তু বোম্বাইতে গিয়ে সে বিশেষ কোনো সুবিধা করতে না পারায় একমাত্র বন্ধুরূপে পরিচিত তেজপালের জালে জড়িয়ে গেল। ফলে, লতার ওপর তার স্বত্বও ত্যাগ করতে হল। শুনেছি, তাকে সামনে শিখণ্ডী খাড়া করে তেজপাল লতার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা চালিয়ে গেছে। এবং এটাই তার আসল উদ্দেশ্য ছিল।'

'এ কথাটা আপনারা রামনাথকে জানিয়েছিলেন?'

'না। তবে তিনি সম্ভবত জানতেন।'

'এই কাহিনির বোধ হয় একটা অন্যরকম উপসংহার আছে, তাই না?'

'ঠিক তাই। লতা ছিল পরমা সুন্দরী, সেই জন্যে তেজপাল বোধ হয় তাকে ছাড়তে পারছিল না। আজ তার বয়স চল্লিশের ওপর হবে, কিন্তু শুনেছি এখনও তার সৌন্দর্যের

বিশেষ কোনো হানি হয়নি। সেই আগুনের চারদিকে দ্বারকাদাস ঘুরঘুর করেছে কিন্তু তেজপালের জাল কেটে এগোতে পারেনি। ফলে, মদ খেয়ে বছর পাঁচেক আগে সে নিজেকে শেষ করে। তারপর শুরু হয় একটা অপ্রত্যাশিত খেলা।

তেজপাল এতদিন লক্ষ করেনি যা, তা হল আজ এত বছরে কমলজিতের দুই ছেলে বড়ো হয়ে উঠেছে। তারা যে পরিবেশে মানুষ হয়েছে, তাতে তাদের মানুষ হয়ে ওঠা খুবই কঠিন ছিল, কিন্তু তারা দুজনে যা তৈরি হয়েছে তাকে অমানুষ বললে অত্যন্ত কম বলা হয়। শয়তানিতে তারা দুজনেই তেজপালকে টেক্কা দিতে পারে। দ্বারকাদাস মারা যেতেই তেজপাল যখন কেটে পড়তে চাইল, তখন এই দুই মূর্তিমান পথ রোধ করে দাঁড়াল।'

দময়ন্তী রুদ্ধনিশ্বাসে বলল, 'ব্ল্যাকমেল?'

'স্বাভাবিক। ব্ল্যাকমেল ছাড়া আর কীই-বা হতে পারে। তাদের কাছে তো কোনো কিছুই পবিত্র নয়, তাদের হারাবার কিছু নেই। কিন্তু, তেজপাল সমাজের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি, তার সংসার আছে, ব্যবসা আছে। কাজেই সে পড়ে পড়ে মার খেতে লাগল।'

সমরেশ বলল, 'নিজের পুত্রবধূস্থানীয় একটি মেয়ের সঙ্গে অসভ্যতা করলে এই রকমই হয়।'

'পুত্রবধূ! সমরেশবাবু, তেজপালের কাছে সম্পর্ক, বয়স, জাত, কোনো কিছুই বাধা ছিল না।'

জয়ন্ত প্রশ্ন করল, 'তিনি রামনাথকে তাঁর দুই নাতিকে আশ্রয় দেবার জন্য চাপাচাপি করেন নি? তাদের তো কোনো দোষ ছিল না।'

'তা জানি না। তবে চাপাচাপি করে কোনো লাভ হত না, কারণ আমরা সকলেই জানি যে আজ থেকে বহু বছর আগে রামনাথ তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তাঁর মেয়ে মণীষাকে দানপত্র করে দিয়ে গেছেন। সে উইল অতি জোরদার জিনিস, আদালতে চ্যালেঞ্জ করে কোনো লাভ হবে না।'

'সে উইলের একজন সাক্ষী কি আপনি?' দময়ন্তী প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ।'

'দেওরাজ অন্যতম সাক্ষী নয়? সে তো উকিল।'

'না। এই উইল যখন তৈরি হয়, দেওরাজ তখন ছেলেমানুষ।'

'অর্থাৎ নম্রতা আজ একটা বিরাট সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী:?'

'হ্যাঁ।' মৃদু হেসে বললেন নন্দকিশোর।

'আপনি দেওরাজের সঙ্গে নম্রতার বিয়ে দেন না কেন? দুটো বিরাট সম্পদ এক হতে পারে।'

নন্দকিশোর জোরে হেসে উঠলেন। বললেন, 'সেটা তো সম্ভব নয়। কারণ দেওরাজ আর নম্রতার মধ্যে একটা ভারি সুন্দর সম্পর্ক আছে। সেটা স্নেহের আর সহানুভূতির। দেওরাজ নম্রতাকে নিজের বোনের মতো ভালোবাসে। তার যত দুঃখের কথা সব নম্রতার কাছে বলা চাই আর নম্রতার সমস্ত অসুবিধের ভার তার নেওয়া চাই।'

দময়ন্তী কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। বলল, 'তেজপালের তো বুঝতে পারছি নিজের স্বার্থ ছাড়া দুনিয়ায় আর কিছুই পবিত্র নয়। সেক্ষেত্রে এত বড়ো সম্পত্তির মালিক, সুন্দরী অথচ অন্ধ, নম্রতাকে ফুসলাবার চেষ্টা তিনি করেছিলেন নিশ্চয়ই। তাই না?'

নন্দকিশোর অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। যখন মুখ তুললেন, তখন সে মুখ কোন অন্তর্গূঢ় যন্ত্রণায় কালো হয়ে গিয়েছে। ভগ্নকণ্ঠে বললেন, 'আমার তা জানা নেই।'

১১

বাড়ি থেকে বেরিয়ে জয়ন্ত জিজ্ঞেস করল, 'এবার কোথায় যাবে?'

দময়ন্তী বলল, 'আমি এবার বাড়ি যাব। মাথার মধ্যে সমস্ত কেমন উলটোপালটা হয়ে যাচ্ছে। কোনো কিছুই ঠিক মতো ধরতে পারছি না। একটু নির্জনে চিন্তা করা দরকার। কিন্তু তুমি একটু আমায় দুটো কাজ করে দাও। প্রথম, সেন্ট বার্নাবাস কনভেন্ট স্কুলে গিয়ে খোঁজ নিয়ে এসো যে গিরিজা আর নম্রতা কতটা বন্ধু ছিল। দ্বিতীয়, রানির একটা খোঁজ করো। অনেকদিন আগেকার ব্যাপার তো নয়, হয়তো অনেকেই ঘটনাটা মনে রেখেছে।'

জয়ন্ত বলল, 'বেশ। দুটো খবরই এনে দিচ্ছি।'

'আর একটা কথা। পুরোনো লালকুঠিপাড়া থেকে নতুন লালকুঠি পাড়ায় আসাবার কোনো শর্টকার্ট রাস্তা আছে?'

'আছে। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পায়ে চলা পথ আছে। খুব তাড়াতাড়ি আসা যায়। রাস্তাটা এসে নন্দকিশোরবাবুর বাড়ির পেছনেই শেষ হয়েছে। চাও তো দেখে নিতে পারো।'

দময়ন্তী মাথা নাড়ল। বলল, 'দরকার নেই।'

১২

জয়ন্ত টুপিটা খুলে একটা সোফার ওপর ধপ করে বসে পড়ল। অন্য একটা সোফার ওপর উপবিষ্ট দময়ন্তীকে সম্বোধন করে বলল, 'তোমার নির্জনে চিন্তা করা হল?'

মৃদু হেসে দময়ন্তী বলল, 'হ্যাঁ, হল।'

'কিছু পেলে?'

'তেমন কিছু নয়। তুমি কিছু খবর এনেছ?'

'হ্যাঁ। বেশ ইন্টারেস্টিং খবর। ব্যারাজের টাইম কিপার সুদর্শন সাহার মেয়ে রানি সাহা কলকাতার একটা ফার্মে একটা মোটা মাইনের চাকরি পায়, পরে সেই ফার্মের ম্যানেজার সুবল দত্তর সঙ্গে তার বিয়ে হয়। কিন্তু হঠাৎ কিছুদিন বাদে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে বসে। কলকাতা পুলিশের রিপোর্ট অনুযায়ী সেটা আত্মহত্যাই। এখন, ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে, রানি সাহাকে কলকাতায় চাকরিটা জোগাড় করে দিয়েছিলেন তেজপাল আগরওয়াল। সুদর্শনের সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ জমিয়ে তিনি তাঁর পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। তাঁদের মাঝে মাঝে টাকা পয়সা দিয়েও সাহায্য করতেন। এ সমস্ত ঘটনাটা ঘটে বছর দেড়েক আগে।'

দময়ন্তী বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে জয়ন্তর কথা শুনছিল। বলল, 'আমি এরকমই কিছু একটা অনুমান করেছিলুম বটে, তবে এতটা নয়। আর দ্বিতীয় খবরটা?'

‘দ্বিতীয় খবর হচ্ছে, সেন্ট বার্নাবাস কনভেন্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল মিস্টার জোসেফের মতে নম্রতা এবং গিরিজা অত্যন্ত অন্তরঙ্গ এবং প্রায় ইনসেপারেবল বন্ধু ছিল, যদিও নম্রতা লেখাপড়ায় খুবই ভালো ছিল আর গিরিজা মোটেই ভালো ছিল না, প্রায়ই ফেল টেল করত। আচ্ছা, তুমি কি গিরিজাকেও সন্দেহ করো?’

‘নিশ্চয়ই। ভীষণভাবে করি।’

‘নাতনি তার দাদুকে খুন করবে? ব্যাপারটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?’

‘তেমন তেমন নাতনি আর তেমন তেমন দাদু হলে ব্যাপারটা খুব অস্বাভাবিক থাকে কী?’

‘কি জানি। তুমি যে কি ভাবছ তুমিই জানো। একটু যদি বলতে তো সকলেরই বোধ হয় সুবিধে হত। কী বলেন সমরেশবাবু?’

সমরেশ প্রবলভাবে ঘাড় নেড়ে বলল, ‘ঠিক, ঠিক। আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।’

দময়ন্তী হেসে ফেলল। বলল, ‘কী করে বলি? সব তো এখনও পরিষ্কার নয়। তবে, আমার অনুমান আমরা শিগগিরিই কয়েক জন অতিথির দর্শন পাব। তখনই বোধ হয় ব্যাপারটা কিছুটা বোধগম্য হবে।’

জয়ন্ত জিজ্ঞেস করল, ‘কে আসবে বলে মনে করো?’

‘হয়তো সবাই। হয়তো শুধুই দেওরাজ আর নম্রতা। বা হয়তো রামনাথ। ঠিক জানি না। তবে আমার ধারণা, এই হত্যাকাণ্ডের জন্যে অনেক ভেবেচিন্তে তৈরি যে জটিল ছবিটা আমার অনেক কষ্টে দেখা উচিত ছিল, সেটা চট করে দেখে ফেলায়, কেউ বোধ হয় অস্বস্তি বোধ করছে। তার বা তাদের এখানে আসা অস্বাভাবিক নয়।’

‘অর্থাৎ তুমি বলতে চাইছ, এই হত্যাকাণ্ডের মূল ষড়যন্ত্রকারী দেওরাজ?’

‘হতে পারে। আবার অন্য কেউও হতে পারে।’

‘অর্থাৎ তুমি এখনও ঝেড়ে কাশবে না, এই তো? আচ্ছা বাবা, তাই সই। তা, বৈজুকে কজনের খাবার বানাতে বলব?’

দময়ন্তী হাসতে হাসতে বলল, ‘যতজনের ইচ্ছে। বেশি হলে সমরেশ আছে। নষ্ট যাবে না কিছুই।’

১৩

দেওরাজ নয়, এল রাজেশ। অতিকায় দেহটা কোনোরকমে একটা সোফার মধ্যে গুঁজে ম্লান গলায় বললেন, ‘মিসেস দত্তগুপ্ত, আপনাকে একটা কথা বলতে এলুম। যদি কিছু মনে না করেন—’

দময়ন্তী বলল, ‘না, না, মনে করব কেন। বলুন।’

‘দেখুন মিসেস দত্তগুপ্ত, আমার বাবাকে কেউ একজন খুন করেছে। কেন করেছে তা আমি জানি না। তবে এটুকু জানি, আমার বাবার অনেক শত্রু ছিল। তিনি অনেক সময় অনেক কাজ করেছেন যাতে অন্যের ক্ষতি হয়েছে। এখন, আপনি যদি ব্যাপারটা নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করেন, তাহলে তাদের মধ্যে প্রতিশোধস্পৃহা আরও বেড়ে যেতে পারে।

কাজেই, আমার অনুরোধ আপনি তদন্তটা ছেড়ে দিন। পুলিশ যা করছে, করুক। কিন্তু প্রাইভেটলি আপনি যদি তদন্ত চালিয়ে যান, অনেকে সন্দেহ করতে পারে যে আমিই আপনাকে লাগিয়েছি। ফলে, আমার বা আমার পরিবারের ক্ষতি হওয়া আশ্চর্য নয়।'

'আপনি কি এরকম কোনো সন্দেহের কথা শুনেছেন?'

'না। তা শুনিনি বটে, তবে শুনলে অবাক হব না। তা ছাড়া আরও একটা কথা আছে। আমরা জৈন। অহিংসা আমাদের ধর্ম। যা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে। আর শত্রুতা বাড়িয়ে কাজ কী?'

দময়ন্তীর গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ চিন্তা করল। তারপর বলল, 'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যে আপনি আমার বিবেকটা পরিষ্কার করে দিলেন, কিন্তু আসল সত্যটা কি না জেনেই তদন্তটা ছেড়ে দেব?'

কাতর মুখে রাজেশ হাতজোড় করে বললেন, 'প্লিজ!'

১৪

জয়ন্ত বলল, 'সত্যি সত্যি ছেড়ে দেবেন নাকি?'

দময়ন্তী জানলার কাছে দাঁড়িয়ে রাজেশের অপসৃয়মান গাড়িটার দিকে তাকিয়ে ছিল। বলল, 'ভাবছি। তবে তদন্তের বিশেষ তো আর বাকি নেই। ধাঁধার টুকরোগুলো প্রায় সবই জোড়া লেগে গেছে, কয়েকটা মাত্র বাকি। জয়ন্ত, আর একজন অতিথি আসছেন। ক্যাপ্টেন রামনাথ সরফ।'

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দিল। রামনাথ ঘরে ঢুকে ক্লান্ত ভঙ্গিতে একটা সোফার উপর বসে পড়লেন। দময়ন্তীকে পাশে বসতে ইশারা করে বললেন, 'আমাকে কেন আসতে হল, আপনি তা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন?'

দময়ন্তী চুপ করে রইল। মাথা নেড়ে বলল, 'না।'

'মিসেস দত্তগুপ্ত, আপনার সঙ্গে নম্রতা, দেওরাজ, রাজেশ, গিরিজা এবং নন্দকিশোরের যে কথাবার্তা হয়েছে, তা আমি শুনেছি। আমার সঙ্গে কথাবার্তা তো আগেই হয়ে গিয়েছে। আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় এটুকু বুঝতে পেরেছি যে আপনার কাছে সত্য বেশিদিন চাপা থাকবে না। সেজন্যে আমি নিজেই ধরা দিতে এসেছি। আমি বলতে চাই যে আমি জেনেশুনে, ঠান্ডা মাথায় আমার বন্ধু তেজপালকে গুলি করে হত্যা করেছি। এর জন্য যা শাস্তি আমার প্রাপ্য তা আমি নিতে প্রস্তুত আছি।'

জয়ন্ত হাঁ করে সোফা থেকে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াচ্ছিল। দময়ন্তী হাতের ইশারায় ওকে বসিয়ে দিয়ে মৃদু হেসে বলল, 'ক্যাপ্টেন সরফ, আপনি দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় কিন্তু একটি জিনিস ধরতে পারেন নি। আমাকে দেখলে যতটা গালিবল বা বোকাসোকা মনে হয়, ততটা বোধ করি আমি নই। আমাকে অত সহজে ধাপ্পা দেওয়া যায় না।'

'আপনি বলতে চান আমি এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত নই?'

'জড়িত কিনা জানি না, তবে একটা টেস্ট করে দেখতে পারি। জয়ন্ত, তোমার একটা বন্দুক ওঁকে দাও তো। আপনি হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে প্রায় পনেরো ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে বন্দুকটা উঁচু করে ধরে পনেরো সেকেণ্ড রাখুন তো? পারবেন?'

বিষণ্ণ, পরাজিত মুখে রামনাথ বললেন, 'না, পারব না।' ওঁর মাথাটা বুকের ওপর ঝুঁকে পড়ল।

দময়ন্তী বৃদ্ধের হাতের ওপর একটা হাত রেখে মৃদু চাপ দিয়ে বলল, 'আপনি বাড়ি চলে যান, ক্যাপ্টেন। কিচ্ছু চিন্তা করবেন না। আমি আবার আপনাকে বলছি, আমার উদ্দেশ্য আসল সত্যটা জানা, প্রতিহিংসা নেওয়া নয়। আমি বলছি, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমরাও আপনার বাড়ি যাব। নম্রতাকে বলবেন, আমাদের জন্য যেন সে চা করে রাখে।'

১৫

জয়ন্ত বলল, 'বাঁচলুম। স্যারকে যে খুনি বলে গায়ে হাত দিতে হয়নি সেটাই যা বাঁচোয়া। তাহলে কাণ্ডটি করল কে? দেওরাজ? তার তো মোটিভের কোনো অন্ত নেই। তা ছাড়া টর্চের কথা কী বলছিলে যেন?'

দময়ন্তী মাথা নেড়ে বলল, 'উঁহু! তোমার হিসাবেই তো দেখা যাচ্ছে যে তার পক্ষে হত্যাকারী হওয়া সম্ভবই না, টর্চ সম্বন্ধে যাই বলি না কেন।'

'তাহলে নম্রতা? শব্দভেদী গুলি চালিয়ে থাকে যদি গ্লাভস পরে?'

'শব্দভেদী গুলি চালানোর জন্য তার বারান্দা থেকে অতটা নেমে এসে ঝোপের ধারে হাঁটু গেঁড়ে বসে গুলি চালানোর দরকারটা কী ছিল? শব্দভেদী চালাতে হলে তো বারান্দা থেকেই চালাতে পারত। কুয়োটা বাড়ির পেছনে। বারান্দা থেকে সেখানে বরং বেশি তাড়াতাড়ি পৌঁছোনো যেত, তাই না? তা ছাড়া, দুটো গাছের ফাঁকে একফালি তিনকোণা তারাভরা আকাশটার কথা চিন্তা করে দ্যাখো। ওই পোজিশনটা একজন চক্ষুষ্মানের পক্ষে আদর্শ, একজন অন্ধের পক্ষে নয়। তাই না? অতএব যে গুলি চালিয়েছে, সে একজন চক্ষুষ্মান লোক।'

'তাহলে রামনাথের দুই জগাই মাধাই নাতি?'

'তারা তেজপালকে মারবে কেন? তারা তো তাঁকে ব্ল্যাকমেল করছিল।'

'বেশ। চমৎকার। তোমার তদন্ত প্রায় শেষ অথচ হত্যাকারীর পাত্তা নেই। তুমি গিরিজাকে সন্দেহ করেছিলে, তার কী হল? আর সে বেচারিকে সন্দেহ করেছিলেই বা কেন?'

'অত্যন্ত সংগত কারণে। ওদের বাড়িতে আমাদের সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্র ও আমাদের গ্লাভস দেখাল এবং সেটা যে নম্রতার সেটা শুনিয়ে দিল। আর, গেটটা যে ভীষণ শব্দ করে সেটা আমাদের মনে করিয়ে দিল পাঁচ মিনিটের মধ্যে। আর এও বলে দিল যে নম্রতা তার দাদুকে পছন্দ করত না। এখন যে কেউ একটু খোঁজ খবর করবে, সেই জানতে পারবে যে নম্রতা অন্ধ হওয়ার আগে পর্যন্ত বন্দুক চালানোয় অভ্যস্ত ছিল। তার ওপর এই সংকেতগুলো পেলে নম্রতার ওপরে তার সন্দেহ গভীর হওয়া উচিত। অর্থাৎ গিরিজা তার বন্ধুকে আমাদের সন্দেহের সামনে তুলে ধরতে চাইছে। কেন?

'তার দুটো কারণ থাকতে পারে। প্রথমত, সে জানে যে নম্রতাই তার দাদুকে হত্যা করেছে। সে ক্ষেত্রে এত ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে ব্যাপারটা জানাবার কোনো দরকার ছিল না। সোজাসুজি জানানোই স্বাভাবিক ছিল।

'দ্বিতীয় কারণ হতে পারে এই যে সে এইসব ইঙ্গিত করে সন্দেহটা নম্রতার ঘাড়ে চড়াতে চাইছে অন্য কাউকে আড়াল করবার জন্য। এখন, যেহেতু আমরা জানি যে নম্রতাকে হত্যাকারী বলে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়, অতএব এই সম্ভাবনাটা বেশ প্রবল। অর্থাৎ, সে কাউকে আড়াল করতে চাইছে। সে কে হতে পারে?'

'এক হতে পারে দেওরাজ। দেওরাজ সম্পর্কে স্পষ্টতই সে মিথ্যে কথা বলেছে। যে দেওরাজ নম্রতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ তাকে তার বন্ধু গিরিজা ভালো করে চেনে না— এটা অবিশ্বাস্য। তার ওপর গিরিজা যা ফরোয়ার্ড মেয়ে! সমাজকে সে ভীষণ ভয় পায় বলে যে ধারণাটা সে সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছিল সেটাও নিতান্ত মিথ্যা। হয়তো দেওরাজের সঙ্গে তার প্রেম আছে, গুপ্তই হোক বা ব্যক্তই হোক। কিন্তু দেওরাজ হত্যাকারী নয়, অতএব তাকে আড়াল করার প্রশ্নই ওঠে না।

'দুই, হতে পারে জগাই মাধাই। তারা তেজপালের বাড়িতে আসত কিনা সে বিষয়ে আরও খোঁজ খবর না নিয়ে কিছু বলতে পারি না। যদি ধরে নিই আসত, তাহলে এও ধরে নিতে পারি যে গিরিজার সঙ্গে তাদের কোনো একজনের ভালোবাসা হয়েছে অতএব তার জন্যই এত মিথ্যে বাহানা। কিন্তু, জগাই মাধাইও হত্যাকারী হতে পারে না।

'অতএব বাকি রইল সে নিজে।'

জয়ন্ত জিজ্ঞেস করল, 'তার মোটিভ কী হতে পারে?'

'ধরো, সে দেওরাজকে প্রেম নিবেদন করেছিল কিন্তু তেজপালের নাতনি বলে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যাত হয়। তখন পথের কাঁটা তেজপালকে সরিয়ে দিতে সে বদ্ধপরিকর হয়। এরকম হয়তো আরও অনেক কিছু হতে পারে!'

'কীভাবে সে খুন করে থাকতে পারে?'

'ধরো, কোনোরকমে সে জানতে পেরেছিল যে তেজপাল সেদিন নম্রতার বাড়ি যাবেন। উনি বেরিয়ে যেতেই সে একটা সাইকেল নিয়ে বনের শর্টকাটের মধ্যে দিয়ে নতুন লালকুঠিপাড়ায় গিয়ে উপস্থিত। রামনাথের বন্দুকটা হয়তো সে আগেই সরিয়ে লুকিয়ে রেখেছিল। এখন, নম্রতাদের বাগানে ঢুকে অপেক্ষা করে রইল যতক্ষণ না তেজপাল উদয় হন। তারপর গুলি, কুয়োয় বন্দুক নিক্ষেপ এবং সাইকেলে চড়ে প্রত্যাবর্তন।'

জয়ন্ত উজ্জ্বল মুখে বলল, 'বাঃ বাঃ চমৎকার! এই তো, সুন্দর রাস্তা পাওয়া গেছে। দিব্যি পরিষ্কার।'

দময়ন্তী সজোরে মাথা নেড়ে বলল, 'না। মোটেই পরিষ্কার নয়। দুটো প্রশ্নের জবাব এখনও পাওয়া যায়নি। প্রথমত, অত রাত্রে লোডশেডিংয়ের মধ্যে দারোয়ানের চোখ এড়িয়ে ওই দুর্গপ্রতিম বাড়িটা থেকে সে বেরোল কী করে? দ্বিতীয়ত, নম্রতাকে ফাঁসানোর চেষ্টা কেন? তার এই চেষ্টার কথা যখন দেওরাজ জানতে পারবে, তখন কি সেটা একটা আনন্দজনক ব্যাপার হবে?'

সমরেশ বলল, 'আরও একটা প্রশ্ন আছে। গিরিজার বাবা কি বললেন শুনলে না? ওঁরা জৈন। অহিংসাই ওঁদের পরম ধর্ম।'

দময়ন্তী মৃদু হেসে বলল, 'হ্যাঁ। সেও একটা কথা বটে। গিরিজা যতই নম্রতার বন্ধু হোক না কেন, তাকে বন্দুক চালানো শেখাতে তার বাবা রাজি হবেন বলে তো মনে হয় না। আর যেমন তেমন শেখা তো নয়, এ তো একেবারে পাকা হাতের কাজ। এবার তাহলে তুমিই বলো জয়ন্ত, কি সিদ্ধান্ত আমি নিতে পারি?'

জয়ন্ত হতাশ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'প্রশ্নটা আমাকে না করে বরং পেছনের এই দেওয়ালটাকে করো। উত্তর পেলেও পেতে পারো হয়তো।'

জয়ন্তর কথার মধ্যেই একটি নারীকণ্ঠ দরজার কাছে প্রশ্ন করল, 'আসতে পারি?'

তিনজন একসঙ্গে লাফিয়ে উঠল। দময়ন্তী হর্ষোৎফুল্ল গলায় বলে উঠল, 'এসো, এসো, গিরিজা, ভেতরে এসো। আমরা এতক্ষণ তোমার কথাই আলোচনা করছিলুম।'

'আমার কথা? ভুরু দুটো ওপরে তুলে জিজ্ঞেস করল গিরিজা। 'আমার আবার কোন কথা আলোচনা করছিলেন আপনারা?'

দময়ন্তী বলল, 'আমরা আলোচনা করছিলুম যে তোমার দাদুকে সম্ভবত তুমিই হত্যা করেছ।' বলে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

বিবর্ণ স্তম্ভিত মুখে সোফার ওপর বসে পড়ে গিরিজা একবার সকলের মুখের দিকে তাকাল। তারপর দময়ন্তীর দিকে তাকিয়ে সন্ত্রস্ত গলায় বলল, 'আপনি ঠাট্টা করছেন? আমি কেন আমার দাদুকে খুন করতে যাব?'

'সেটা আমরা পরে বিবেচনা করব। এখন বলো তো, তুমি কি দেওরাজকে বিয়ে করতে চাও?'

'দেওরাজ কে? তাকে তো আমি ভালো করে চিনিই না?'

'তাই নাকি? আচ্ছা, ঘটনাটা যখন ঘটে, তখন তুমি কোথায় ছিলে?'

'বাড়িতেই ছিলুম।'

'এটা কি সত্যি কথা?'

'একদম সত্যি কথা। বিশ্বাস করুন। আপনি বাবাকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন। আমাদের দারোয়ান, কুক, চাকর সবাইকে জিজ্ঞেস করতে পারেন।'

'তুমি বন্দুক চালাতে জানো?'

'না। নম্রতা আমাকে কয়েকবার শেখাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আমার বড্ড ভয় করত তাই শিখতে পারিনি।'

'তুমি নম্রতাকে ফাঁসাতে চাও— এটা দেখাতে চাইছ কেন? যাতে আমি তোমাকে সন্দেহ করি, সেই জন্য?'

কিছুক্ষণ নির্বাক বিস্ময়ে দময়ন্তীর মুখের দিকে চেয়ে রইল গিরিজা। বলল, 'আপনি কী বলতে চাইছেন আমি বুঝতে পারছি না।'

'তুমি ঠিকই বুঝতে পারছ। তুমি ভালো করেই জানো যে তোমাকে সন্দেহ করলে কিছুই প্রমাণ করা যাবে না। তুমি নিজেকে সামনে এগিয়ে দিয়ে আসল হত্যাকারীকে আড়াল করতে চাইছ। তাই না?'

গিরিজা চুপ। দময়ন্তী আবার বলল, 'আচ্ছা, ওসব কথা বাদ দাও। এখন বলো তো, তুমি আমার কাছে এসেছ কেন?'

গিরিজা তার হ্যান্ডব্যাগের ভেতর থেকে একটুকরো কাগজ বের করে সসংকোচে বলল, 'দাদুর টেবিলের ড্রয়ারের ভেতর এটা পেলুম। ভাবলুম, এটা হয়তো আপনার কাজে লাগবে।'

দময়ন্তী কাগজটা নিয়ে দেখল, তাতে দুটো নাম আর একটা ঠিকানা লেখা। নাম দুটো গোকুলচাঁদ আর অমরনাথ সরফের। ঠিকানাটা কলকাতার প্রফুল্ল ভট্টাচার্য লেনের। দময়ন্তী মৃদু হেসে কাগজটা জয়ন্তর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এই নাও তোমার জগাই মাধাইয়ের ঠিকানা।' তারপর গিরিজার দিকে ফিরে বলল, 'আমরা এখন ক্যাপ্টেন সরফের বাড়িতে যাব। তুমিও আমাদের সঙ্গে চলো।'

১৬

নতুন লালকুঠিপাড়ার মুখে জয়ন্তকে গাড়ি দাঁড় করাতে বলল দময়ন্তী। তারপর গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। গিরিজাকে নেমে আসার ইঙ্গিত করে জয়ন্তকে বলল, 'তোমরা এগিয়ে যাও। আমি আর গিরিজা হেঁটে আসছি।'

নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে নেমে এল গিরিজা। বলল, 'হেঁটে যাবেন? অনেকটা পথ কিন্তু।'

'তাতে কী আছে? আমি হাঁটতে খুব ভালোবাসি। আর তুমি তো বাচ্চা মেয়ে। হাঁটতে ভয় পাবে? তা ছাড়া রাস্তায় একটা কাজ আছে, সেটাও সেরে নেব।'

দময়ন্তীর কথার মধ্যেই জয়ন্ত সমরেশকে নিয়ে জিপ চালিয়ে এগিয়ে গেল। দময়ন্তী হাঁটা শুরু করল। গিরিজা পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কী কাজ আছে আপনার?'

'চলো না, দেখতেই পাবে।'

একটুখানি এগোতেই নন্দকিশোরের বাড়ি। গেটের কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেল দময়ন্তী। গিরিজাকে বলল, 'আমাদের সঙ্গে দেওরাজেরও যাওয়া দরকার। যাও তো, ওকে একটু ডেকে আনো।'

'আচ্ছা।' বলে গিরিজা গেট খুলে এগিয়ে গেল। সঙ্গেসঙ্গে দুটো প্রকাণ্ড কুকুর ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। গিরিজা তাতে কিছুমাত্র বিচলিত হল না। ওদের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে এগিয়ে গেল। ঠিক তখনই দেওরাজ এসে বারান্দায় দাঁড়াল। সে একবার গিরিজার দিকে দেখল, একবার গেটের বাইরে দণ্ডায়মান দময়ন্তীকে দেখল, তারপর চাপা ক্রুদ্ধ গলায় গর্জন করে উঠল, 'স্টুপিড গার্ল! তুমি কী করছ তার খেয়াল আছে?'

গেটের বাইরে থেকে দময়ন্তী সহাস্যে বলল, 'গিরিজা কী করেছে তা আমি দেখিনি মিস্টার চৌধুরী। আমরা নম্রতাদের বাড়ি যাচ্ছি। আপনি কি আমাদের সঙ্গে যাবেন?'

দেওরাজ গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করল, 'সেখানে গিয়ে কী হবে?'

'কিছুই না। চা খাব সবাই মিলে।'

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে একবার সংকুচিত গিরিজাকে ভস্ম করে দিয়ে দেওরাজ বলল, 'বেশ। আসছি আমি।'

১৭

সেই বিশাল বসবার ঘরে তাঁর অভ্যস্ত চেয়ারে রামনাথ স্থির হয়ে বসে ছিলেন। আজ আর তাঁকে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বপূর্ণ বলে মনে হচ্ছিল না। বরং একটু সন্ত্রস্ত, চিন্তাকুল।

দময়ন্তীকে সম্বোধন করে বললেন, 'আজ সকলে মিলে আমার বাড়িতে কী উদ্দেশ্যে মিসেস দত্তগুপ্ত?'

দময়ন্তী মৃদু হেসে বলল, 'উদ্দেশ্য তেমন কিছু নয়। আপনাদের জানাতে এলুম যে আমার তদন্তের আজ শেষ দিন।'

বিবর্ণ মুখ তুলে রামনাথ বললেন, 'জয়ন্ত কি তাহলে এবার গ্রেপ্তারি পরোয়ানাগুলো জারি করতে শুরু করবে?'

'না। কারণ কোনো গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নেই।'

'কেন? আপনি কি হত্যাকারীর নাম পুলিশের কাছে এখনও প্রকাশ করেননি?'

'না।'

'কেন? আপনার উদ্দেশ্য বা কর্তব্য কি পুলিশকে হত্যাকারীকে ধরতে সাহায্য করা নয়?'

'একেবারেই না। আমার উদ্দেশ্য বা কর্তব্য হচ্ছে রহস্যের সমাধান করা, আসল সত্যটা জানা। পুলিশকে সাহায্য করবার জন্য এই তদন্ত আমি শুরু করিনি।'

'আসল সত্যটা কি তা জানতে পেরেছেন?'

'আমার ধারণা পেরেছি।'

'জয়ন্ত, তুমি জানো আসল ঘটনাটা কি ঘটেছিল?'

প্রবলভাবে মাথা নেড়ে জয়ন্ত বলল, 'একদম না। দময়ন্তী যেভাবে চিন্তা করে আর আমরা যেভাবে চিন্তা করি, তার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। ও যে কী ভেবেছে, তা বুঝে ওঠা আমার কম্ম নয় স্যার।'

সবাই একসঙ্গে হেসে উঠল মনে হল, যেন অনেকদিন খাঁচায় বন্দি এক ঝাঁক পাখি হঠাৎ মুক্তি পেয়ে ডানা ঝটপটিয়ে আকাশে উড়ে গেল।

দেওরাজ হাসতে হাসতেই বলল, 'জয়ন্তবাবুকে সরিয়ে দিয়ে আমাদের আসল সত্যটা বলতে পারেন না, মিসেস দত্তগুপ্ত।'

দময়ন্তী মৃদু হেসে বলল, 'অত কৌতূহল ভালো নয় উকিল মশায়। তা ছাড়া আপনার তো অজানা থাকার কথা নয় যে সত্যের রূপটা সবসময় সুখপ্রদ হয় না।'

জয়ন্ত বলল, 'না, না, দময়ন্তী, তুমি যদি ওদের কিছু আমার অনুপস্থিতিতে বলতে চাও, বলতে পারো। আমি না হয় একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসছি।'

দময়ন্তী মাথা নেড়ে বলল, 'না জয়ন্ত। যা বলব, তোমার সামনেই বলব।'

দেওরাজ বলল, 'তাহলে শুনিই না ব্যাপারটা কী।'

নম্রতার মুখ থেকে আগের দিনের দেখা কাঠিন্যের পর্দাটা সরে গিয়ে নম্রতা ফিরে এসেছিল এইমাত্র। আবার ওর মুখটা কঠিন হয়ে উঠল। বলল, 'থাক-না।'

দময়ন্তী নীচু গলায় বলল, 'আপনি বুঝতে পারছেন না কেন যে ওঁর ইগোতে লাগছে? আমি সত্যি বলছি না মিথ্যে বলছি, সেটা না জানলে যে রাত্রে ঘুম হবে না। ঠিক আছে মিস্টার চৌধুরী। আমি একটা গল্প বলি, শুনুন। যদি কোনো ভুলভ্রান্তি থাকে তো বলে দেবেন।

‘এক দেশে এক রাজা ছিল। তার ছিল এক রাজপুত্তুর। রাজার হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া কিন্তু রাজপুত্তুরের চিত্তে সুখ নেই। কারণ তার রাজত্বের বাইরে জঙ্গলের ভেতর এক দুর্গের মধ্যে থাকে এক ভয়ঙ্কর দৈত্য। তার অত্যাচারে রাজপুত্তুরের জীবন যৌবন ছারখার হয়ে গেল। সেই দৈত্য যেন তার জীবনের একটা দুষ্টগ্রহ, যেখানেই সে যায়, সেই দৈত্য তার পেছনে পেছনে এসে তার সর্বনাশের চেষ্টা করে। রাজপুত্র মনে মনে স্থির করে সেই দৈত্যকে সে মারবেই! কিন্তু মারতে চাইলেই তো আর মারা যায় না, দেশের আইনকানুন পুলিশ সব এড়িয়ে যা-কিছু করার করতে হবে নইলে নিজেরই ফেঁসে যাওয়ার সম্ভাবনা। কাজেই সাবধানে এগোয় রাজপুত্র। আইনের মধ্যেই আইন এড়াবার রাস্তা খোঁজে।

‘সেই দৈত্যপুরীতে ছিল এক রাজকন্যা। তার এমন একটা বয়স যখন সব মানুষেরই চোখে থাকে মানুষ হবার স্বপ্ন, অন্যায়কে ঘৃণা করার সংকল্প। সেই রাজকন্যার সঙ্গে একদিন দেখা হল রাজপুত্রের। দৈত্য ততদিনে তাকে নরকের ক্লেদোক্ত পঙ্কে ডুবিয়ে দিয়েছে। কিন্তু কী তার চোখে ছিল কে জানে, রাজকন্যা তাকে ভালোবেসে ফেলল। তাকে সে টেনে তুলল সেই নরকের ভেতর থেকে। তাকে নিয়ে এল সুস্থ মুক্ত জীবনের মধ্যে। দৈত্যের তা মোটেই পছন্দ হল না। সে রাজকন্যার পথে পদে পদে বাধার সৃষ্টি করতে লাগল। ফলে সেই নৃশংস নিষ্ঠুর দৈত্যটার প্রতি রাজকন্যার মনে রাগ এবং ক্ষোভ আস্তে আস্তে জিঘাংসায় পরিণত হতে লাগল।

‘এই মিলিত দুই আগুন একদিন ফেটে বেরোল যেদিন দৈত্যটা তার জঘন্য থাবা বাড়াল তাদের উভয়ের বন্ধু আর এক রাজকন্যার দিকে। সে ছিল অন্ধ, তাদের দুজনেরই অসীম স্নেহ আর ভালোবাসার পাত্রী। তাদের সহ্যশক্তির সমস্ত সীমা এবার ছাড়িয়ে গেল। তারা স্থির করল এই নারকীয় বীভৎসতাকে চিরকালের মতো শেষ না করলে পৃথিবীটা আর মানুষের বাসের উপযোগী থাকবে না। এই সিদ্ধান্তটা ঠিক ছিল না ভুল ছিল তা বলতে পারব না, জানি না আইন এ বিষয়ে কী বলে, কিন্তু বলেছি তো, এ এমন একটা বয়স যখন মানুষের দুঃখ দেখলে অবিচলিত থাকতে পারে না, অদ্ভুত হয়তো বা অন্যায় সংকল্প করে বসে আর তা সফলও করে বসে। সেখানে আত্মীয় বা অন্য কোনো সম্পর্কই সেই সংকল্পসাধনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না।

‘অতএব দৈত্য কর্তৃক লাঞ্ছিত তিন বন্ধু বসল পরামর্শ করতে যাকে বোধ হয় ষড়যন্ত্র বলা চলে। রাজপুত্র আইনজ্ঞ, অতএব সেই হল মুখ্য ষড়যন্ত্রকারী।

‘অনেক পরামর্শের পর স্থির হল যে যদি দু-নম্বর রাজকন্যাকে দিয়ে দৈত্যনিধন করানো যায়, তাহলে সে অন্ধ বলে কারুরই সন্দেহের উদ্রেক করবে না। সে একসময় এক্সপার্ট শ্যুটার ছিল, অতএব তার সেই স্কিলটা কাজে লাগানো যাবে। সেটা করতে হবে লোডশেডিংয়ের মধ্যে যাতে সে কারুর নজরে না পড়ে। আবার সে ক্ষেত্রে তার অন্ধত্বটাও কাজে লাগবে, কারণ ওই অন্ধকারেও সে নির্বিঘ্নে বাগানের মধ্যে দিয়ে বন্দুকটা কুয়োয় ফেলে দিয়ে আসতে পারবে। তার কাছে লোডশেডিং অর্থহীন।

‘কিন্তু প্ল্যানটা এখনও ফুলপ্রুফ হল না। অন্ধকারে শব্দভেদী গুলি ছোড়া দেখে কারুর মনে সন্দেহ হতে পারে। অতএব উকিল রাজপুত্র স্থির করলেন গুলিটা এমন জায়গা থেকে ছোড়া হবে যে জায়গাটা একজন চক্ষুষ্মান লোকের পক্ষেই বেছে নেওয়া স্বাভাবিক। আদালতে স্রেফ এই প্রশ্নটার ওপরেই দ্বিতীয় রাজকন্যার বেনিফিট অব ডাউট পেয়ে যাওয়া আটকানো যাবে না।

‘এখন এই প্ল্যানটা কাজে লাগাতে গেলে, দৈত্যকে লোডশেডিংয়ের মধ্যে দ্বিতীয় রাজকন্যার বাড়িতে আনতে হয়। দৈত্য অত্যন্ত ঘুঘু এবং তার শত্রুরও শেষ নেই। এইখানে প্রথম রাজকন্যাকে কাজে লাগানো হল। তাকে দৈত্য অবিশ্বাস করতে পারেই না। সে দৈত্যকে কী বলেছিল আমার জানা নেই, কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস সেই কোনরকমে অ্যালিওর করে তাকে এখানে নিয়ে আসে। খুব সম্ভব সে বলেছিল যে দ্বিতীয় রাজকন্যা দৈত্যকে ডাকছে কোনো গোপন কারণে। দৈত্য তাতে মহা পুলকিত হয়েছিল।

‘এবার রাজপুত্রর ভূমিকা। সে রোজ রাস্তায় পায়চারি করে সবাই জানে। সেদিনও সে রোজকার মতো অন্ধকারেই পায়চারি করতে করতে একসময় এসে টুক করে লুকিয়ে পড়ল দু-নম্বর রাজকন্যার বাড়ির সামনে। হয়তো তার হাতে ছিল একটা লোহার ডান্ডা বা অন্য কিছু যা যদি গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তাহলে ব্যবহৃত হবে। কথা ছিল, গুলি করার পর দৈত্যটা পড়ে গেলে তারই টর্চ দিয়ে তার অবস্থাটা দেখে নিয়ে রাজপুত্র সেটা ছুড়ে দেবে ভেতরে। সেটাই সঙ্কেত। রাজকন্যা টর্চের শব্দ শুনে সেটা কোথায় পড়েছে বুঝে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে বন্দুকটা কুয়োয় ফেলে ভেতরে চলে যাবে। আর রাজপুত্র এক দৌড়ে বাড়িতে চলে যাবে। ঘটনাটা নির্বিঘ্নে ঘটে গেলে সবার সন্দেহ গিয়ে পড়বে দ্বিতীয় রাজকন্যার দাদু বুড়ো রাজার ওপর। কিন্তু তিনি যে এ কাজ করতে পারেন না সেটা কোনো থার্ড ক্লাস উকিলও আদালতে স্বচ্ছন্দে প্রমাণ করে দিতে পারবে।

‘ঘটনাটা নির্বিঘ্নে ঘটে গিয়েছিল প্রায়, কেবল দুটো উটকো লোকের সঙ্গে ধাক্কা লেগে রাজপুত্র একটু ফ্যাসাদে পড়ে গিয়েছিল। তাতে অবশ্য অসুবিধে কিছু হয়নি। পুলিশ, যারা সাধারণত কোনো ঘটনার খুব গভীরে যায় না, তারাও বুঝতে পারল যে তার পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব নয়। কাজেই তারা তাকে ছেড়ে দিল। আর তাদের সন্দেহ, যেমন ভাবা গিয়েছিল, বুড়ো রাজার ওপরেই গিয়ে পড়ল, কিন্তু সেটা যে প্রমাণ করা যাবে না— এটা বুঝে তারা তাঁকেও কিছু করতে পারল না। ফলে, রাজপুত্রের উকিলি বুদ্ধির জয় হল, রহস্যটা অন্ধকারেই রয়ে গেল।

‘তাহলে, মিস্টার দেওরাজ চৌধুরী, এবার বলুন এ পর্যন্ত গল্পটার মধ্যে কোনো ভুলভ্রান্তি কি পাওয়া গেল?’

সম্মোহিতের মতো মাথা নাড়ল দেওরাজ। বলল, ‘না। কিন্তু আপনি কী করে...’

‘বলছি, গল্পটা এখনও শেষ হয়নি। এইবার এই গল্পে প্রবেশ ঘটল এক ইতিহাসের অধ্যাপিকার, ছেঁড়াখোঁড়া পাণ্ডুলিপি জোড়া দিয়ে কিছু কিছু কল্পনার প্রলেপ লাগিয়ে একটা আস্ত ইতিহাস গড়ে তোলা যার কাজ।’

রামনাথ বললেন, ‘লেট’স কল হার দা সরসারেস বা জাদুকরী—’

দময়ন্তী মাথা নাড়ল। বলল, ‘না। জাদুকরী ভেলকি দেখায়, শূন্য থেকে নানারকম জিনিসপত্র বের করে। এর কাজ তো তা নয়। এর নেশা সত্য উদঘাটন— মিথ্যে ছায়াবাজীর ভেলকি দেখানো নয়। আমরা একে বরং বাইরের লোক বলব।

‘বাইরের লোকটির প্রথমেই সন্দেহ হয়, স্বভাবতই বুড়ো রাজাকে। তার মনে হল তিনি দুটো মিথ্যে কথা বলেছেন। এক, দৈত্যটা কেন তাঁর বাড়ি আসছিল তা তিনি জানেন না। দুই, তাঁর হারিয়ে যাওয়া দুই নাতি কোথায় আছে তা তিনি জানেন না। কিন্তু খটকা লাগল দু-জায়গায়। এক, তিনি যে দৈত্যকে অপছন্দ করতেন সেটা অসংকোচে বললেন, আর দুই, দৈত্যটার ওপর তাঁর এমন রাগ ছিল না বলে মনে হল যাতে তাঁর পক্ষে এ কাজ

করা জরুরি হয়ে পড়ে। পরে দেখা গেল, যে দুটো কথা তিনি মিথ্যে বলেছেন বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল সেটা সত্যি বলে মেনে নেওয়াই সমীচীন।

'এখন দেখা গেল বুড়ো রাজা বা দ্বিতীয় রাজকন্যা, দুজনেই নিঃসন্দেহ যে কোনো স্বার্থান্বেষী লোক বাইরের লোকটিকে নিয়োগ করেছে তাঁদের ফাঁসাবার জন্য। খোঁজখবর করে জানা গেল এরকম লোক একমাত্র হতে পারে রাজত্বের অংশ থেকে বঞ্চিত দুই নাতির। দৈত্যটার সঙ্গে তাদের একটা সম্পর্কও ছিল। অতএব তাদের সন্দেহের আওতার মধ্যে আনা হল। কিন্তু দেখা গেল, বুড়ো রাজা আর তার নাতনিকে ফাঁসানোর চেয়েও তাদের পক্ষে বেশি লাভজনক দৈত্যকে বাঁচিয়ে রাখা। অতএব তারা বাদ গেল, বাদ গেলেন বুড়ো রাজাও। কারণ বলাই বাহুল্য। তবে তীক্ষ্ণধী বুড়ো রাজা ব্যাপারটা বোধ হয় গোড়া থেকেই জানতেন।

'তাহলে বাকি রইল রাজপুত্র আর দুই রাজকন্যা। যদিও দু-নম্বর রাজকন্যার দিকেই এখন পাল্লটা ভারী, কিন্তু তাহলেও ছবিটা কিছুতেই সম্পূর্ণ হয় না। কী তার মোটিভ, কী করে সে একা সব কাজ সারল, কীভাবে সে এমন জায়গায় এল যেখানে তাকে কেউ সন্দেহ করতে না পারে? এইখানে একটা ষড়যন্ত্রের আভাস পাওয়া গেল। দেখা গেল, দৈত্যটাকে মারার প্রবলতম বাসনা থাকার কথা রাজপুত্রের, সে উকিল, সমস্ত ঘটনাটার পেছনে আইন বাঁচাবার চেষ্টা, এসবই এই ষড়যন্ত্রে তার অংশগ্রহণের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে। এই দুজনকে ষড়যন্ত্রে নিলে ছবিটা কিঞ্চিৎ পরিষ্কার হয় কিন্তু পুরোটা হয় না। দৈত্যটা ওখানে এল কীভাবে? কে তাকে নিয়ে এল? রাজপুত্র হতে পারে না, দ্বিতীয় রাজকন্যাও হতে পারে না, কারণ সেখানে ধরা পড়ার একটা সম্ভাবনা আছে। এখানেই এল তৃতীয় ব্যক্তির প্রয়োজন। এবং এখানেই বোঝা গেল কী অসীম ঘৃণায় এবং গভীর যন্ত্রণায় এই ষড়যন্ত্রের জাল পাতা হয়েছিল।

'এটা ধরা বেশ কঠিন হত যদি না রাজপুত্র প্রথম রাজকন্যাকে সন্দেহের ঊর্ধ্বে তোলার জন্য তাকে দিয়ে তার বন্ধুকে ফাঁসানোর ভানটা না করাতো। দৈত্যের প্রতি তার ঘৃণাটা এ না হলে প্রকাশ পেত কিনা সন্দেহ। রাজপুত্র এখানেই ভুলটা করেছিলেন। এটা না করলে পুরো ছবিটা পরিষ্কার হত কিনা সন্দেহ।

'কিন্তু কেবল ঘৃণাই দ্বিতীয় রাজকন্যাকে তার নিকটাত্মীয় দৈত্যটাকে শেষ করতে উদবুদ্ধ করতে পারে না। সেখানে একটা গভীরতর প্রাণের টান থাকতে বাধ্য। এইখানে কল্পনা দিয়ে শূন্য জায়গাটা ভরাট করতে হল। কিন্তু পরে দেখা গেল কল্পনাটা মিথ্যে নয়। প্রমাণিত হল দুই যুবক-যুবতী তাদের অন্ধকারের জাল ছিঁড়ে মুক্ত হবার পথ খুঁজছে। দ্বিতীয় রাজকন্যা, যার জীবনের একটা দিক চিরকালের জন্য অন্ধকার হয়ে গেছে, একটা কুৎসিত বীভৎস দৈত্যকে নিধন করে তার দুই বন্ধুর জীবনকে এক আলোকিত পথে উত্তরণ করতে সাহায্য করেছে। আইন বা সমাজ কী বলবে আমি জানি না, কিন্তু আমার বিবেক বলছে, অনেকগুলো প্রাণ গেছে, অনেক জীবন নষ্ট হয়ে নরকের আগুনে জ্বলছে, এবার এখানেই তার পরিসমাপ্তি হোক, এখানেই যবনিকা পড়ুক।'

দময়ন্তীর কথা শেষ হল। সবাই নীরবে স্তব্ধ বিষণ্ণ মুখে বসে রইল। অনেকক্ষণ পরে সমরেশ জয়ন্তকে প্রশ্ন করল, 'কি জয়ন্তবাবু, দময়ন্তী যে গল্পটা বলল, তার পাত্র-পাত্রীদের চিনতে পারলেন নাকি?'

জয়ন্ত প্রবলবেগে মাথা নেড়ে বলল, 'ক্ষেপেছেন? দময়ন্তীর যত সব আজেবাজে গপ্পো! তাদের পাত্র-পাত্রীদের পরিচয় খোঁজার চেষ্টা করাই পণ্ডশ্রম। চলো হে, দময়ন্তী, এবার

বাড়ি যাওয়া যাক। তাড়াতাড়ি খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়তে হবে। কাল ভোরে তোমাদের তোপচাঁচি লেকে পিকনিকে যাবার কথা, মনে আছে তো?’

ইজ্জত

ভাঙা ভাঙা গলায় ধীরে ধীরে ভদ্রলোক বললেন, 'তুমিই তো বোধহয় সমরেশ, তাই না? আমাকে বোধহয় তুমি চিনতে পারলে না?' ভদ্রলোকের জিভে কোনো জড়তা আছে, কথাগুলো জড়ানো, অস্পষ্ট।

সমরেশ ভদ্রলোককে আপাদমস্তক ভালো করে দেখল। শীর্ণদেহ, বৃদ্ধ, মাথার চুল সব সাদা, ডান হাতের একটা মোটা বেতের লাঠির ওপর ভর দিয়ে কোনোরকমে নিজেকে খাড়া রেখেছেন। সঙ্গে একটি ষোলো-সতেরো বছরের ছেলে, সম্ভবত কাজের লোক, তাঁর বাঁ হাতটি ধরে আছে। পরনে থান আর গরদের পাঞ্জাবি— তা থেকে সেন্টের মৃদু সুবাস আসছে বেমানান ভাবে। ভদ্রলোকের মুখে ক্লিষ্ট ক্লান্তি, বোধহয় দোতলায় সিঁড়ি ভেঙে ওঠার জন্য।

এঁকে কোনোদিন দেখেছে বলে মনে করতে পারল না সমরেশ। মাথা নেড়ে বলল, 'আজ্ঞে না, চিনতে পারলুম না। ভেতরে এসে বসুন।'

ভদ্রলোক বাঁ পা'টা টেনে টেনে ঘরের ভেতর ঢুকলেন। একটা সোফার ওপর সঙ্গীটির সাহায্যে বসতে বলতে বললেন, 'আমি তোমার বড়দার সঙ্গে পড়তুম এক ক্লাসে, এক ইস্কুলে। কলেজেতে একসঙ্গে পড়েছি, অবশ্য আলাদা আলাদা বিষয়ে।'

বিস্মিত কণ্ঠে সমরেশ বলল, 'আপনি আমার বড়দার সঙ্গে একসঙ্গে পড়েছেন?'

সমরেশের বিস্মিত হওয়াটা স্বাভাবিক, কারণ সমরেশের বড়দা যদিও ওর চেয়ে দশ বছরের বয়েসে বড়ো, তবু এখনও প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পৌঁছতে শারীরিক ও মানসিক উভয় দিকেই যথেষ্ট দেরি আছে। আর এই বৃদ্ধ তো মনে হয় তাঁর চেয়েও অন্তত পঁচিশ বছরর বড়ো।

ভদ্রলোক ম্লান হাসলেন, বোধহয় সমরেশের মনের কথাটা বুঝতে পেরেই। বললেন, 'হ্যাঁ, হয়তো ওর কাছে আমার নামও শুনে থাকতে পার। আমার নাম অরবিন্দ আচার্য।'

একটা সোফায় বসতে যাচ্ছিল সমরেশ, বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো খাড়া হয়ে দাঁড়াল। বিস্ফারিত চোখে বলল, 'আপনি অরবিন্দ আচার্য?'

'হ্যাঁ, কিংবা বলতে পার তার ধ্বংসাবশেষ। তোমার বড়দা খেলত সেন্টার ফরোয়ার্ডে, আর আমি খেলতুম সেন্টার হাফ। দারুণ বোঝাপড়া ছিল আমাদের মধ্যে। এখন আমাকে দেখলে তা আর বিশ্বাস হয় না, না?'

সমরেশ নীরবে মাথা নাড়তে লাগল, ওর বিস্ময়ের ঘোর কাটতে সময় লাগবে।

এই অরবিন্দ আচার্যের শুধু নামই শোনেনি সমরেশ, এক সময় ইনি ছিলেন ওর উপাস্য হিরো। ভবানীপুরের আচার্যবাড়ির ছেলে অরবিন্দ চেহারায়, কথাবার্তায়, লেখাপড়ায়, খেলাধুলায় হিরো হবারই উপযুক্ত ছিলেন। সিল্কের পাঞ্জাবি পরে যেমন সাহিত্যের আসর জমাতে পারতেন, তেমনি 'ভবানীপুর ইয়ংস'-এর লাল-কালো জার্সি পরে সারা মাঠে বিপক্ষ দলকে ব্যস্ত রাখতে পারতেন। সেই প্রাণচঞ্চল, ক্ষুরধার অরবিন্দ আচার্য ইনি? ধ্বংসাবশেষই বটে, ভীষণ অথচ করুণ।

সমরেশের চিন্তায় বাধা দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'আমি শেষ তোমাদের বাড়ি গিয়েছিলুম তোমার বড়দার বিয়েতে, তাই না? তখন তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়েছ কি? হওনি। আর আজ এতদিন বাদে তোমাকে দেখলুম। আমিও কিন্তু তোমাকে চিনতে পারতুম না, নেহাত ঠিকানাটা জানা ছিল, তাই সাহস করে জিজ্ঞেস করে ফেললুম। এখন শোন, একটা কাজের কথা বলি। আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসিনি, এসেছি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে। একটা বিপদে পড়েছি যে, ওঁর একটু সাহায্য চাই। করবেন কিনা সেটা অবশ্য উনিই বিবেচনা করবেন।'

সমরেশ বলল, 'নিশ্চয়ই করবে। আপনি বিপদে পড়েছেন আর সাহায্য করবে না? দাঁড়ান আমি এক্ষুনি ওকে ডেকে আনছি।'

দময়ন্তী শোবার ঘরে চুল বাঁধছিল, সমরেশ গিয়ে ওকে খবর দিয়ে ফিরে এল। অরবিন্দ আচার্যের সামনে এসে বলল, 'আমি আপনাকে আগে অনেক বারই দেখেছি। আমাদের বাড়িতে, খেলার মাঠে, দাদার কলেজের থিয়েটারে। কিন্তু আপনার এখন এরকম...!'

সমরেশ সংকোচে কথাটা শেষ করতে পারল না। অরবিন্দ হাসলেন, বললেন, 'আমার এরকম দশা কী করে হল, জিজ্ঞেস করছ? সেরিব্রাল থ্রমবোসিস। মহাভারত পড়নি? সত্যবানের হয়েছিল— সাবিত্রী তাকে বাঁচায়। আমায় বাঁচিয়েছিলেন ডাক্তার সুভাষ গুহ।'

'কিন্তু মাথার চুলগুলো সব পেকে গেল কী করে?'

'ওরকম হয়। সন্ন্যাসরোগ হয়েছিল, চেহারাটাও সন্ন্যাসী মার্কা করে দিয়ে গেল। এখন বনে গেলেই হয়। নেহাত শহুরে জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি, তা না হলে হয়তো তাই যেতুম।' বলতে বলতে অরবিন্দের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, কম্পিত কণ্ঠে স্পষ্ট বেদনার আভাস।

সমরেশ আর কথা বাড়াল না। দময়ন্তী এসে ঢোকা পর্যন্ত গম্ভীর বিষণ্ণ মুখে দুজনেই চুপ করে বসে রইল।

নমস্কার ও প্রাথমিক পরিচয় আদান-প্রদানের পর সমরেশ বলল, 'বলুন অরবিন্দদা, কী আপনার বিপদ!'

কিছু সময় চুপ করে রইলেন অরবিন্দ। তারপর বললেন, 'শুনেছি, এরকম ক্ষেত্রে নাকি সমস্ত কথা বিস্তারিতভাবে বলতে হয়। কিন্তু ঘটনাটা সামান্য, তাই সংক্ষেপে বলছি। আমার কাহিনিটি শুনে হেসো না তোমরা, শুধু মনে রেখো, আমি কিন্তু বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছি এ ঘটনাটি নিয়ে।

'ভবানীপুরে আমাদের বাড়িটা তোমরা দেখেছ কিনা জানি না। শরৎ বোস রোড আর ধ্যানেশ মিত্তির রোডের মোড় থেকে একটু পশ্চিম দিকে গেলে শ্যামাচরণ গাঙ্গুলী লেন পাবে। তার তৃতীয় বাড়িটা আমাদের। মান্ধাতার আমলের বাড়ি, আমার ঠাকুরদার বাবা বানিয়েছিলেন।

আমাদের ঠিক পাশের বাড়িটার কথাও তোমাদের বলি। সেটাও আমাদের বাড়িরই প্রায় সমসাময়িক, কেবল অনেক বেশি ভাঙাচোরা। গত পঞ্চাশ-ষাট বছরে ও-বাড়িতে কেউ থাকেনি। আর যেভাবেই হোক হানাবাড়ি বলে একটা বদনামও রটে গেছে। বাড়িটা নিজেই একটা ভূতের মতো প্রায় এক বিঘে জমির ওপর জবুথবু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আমার শোবার ঘর থেকে বাড়িটার উত্তর দিকের দেওয়ালটা চোখে পড়ে। ওদিকটা আগে ছিল অন্দরমহল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব জানলা, আমি তো জন্ম থেকে দেখে আসছি

— বন্ধ। শুনেছি, লোকে বলে মাঝে মাঝে রাত্তিরবেলা নাকি জানলাগুলোর ফাঁক দিয়ে আলো দেখা যায়, গানবাজনা ভেসে আসে, তবে আমি কোনোদিন সেরকম কিছু দেখিওনি, শুনিওনি।

মাসখানেক আগে হঠাৎ একদিন দেখি, আমার ঘরের ঠিক উলটো দিকে একটা জানলা খোলা। বাইরে আলো, ঘরের ভেতরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার, কাজেই ভেতরটা কিছু দেখবার জো নেই। অবিশ্যি তখন আমি দেখবার চেষ্টাও করিনি। ভেবেছিলুম, পুরোনো জানলা কবজা-টবজা ভেঙে গিয়ে খুলে গেছে। কিন্তু রাত্তির বেলা দেখি জানলাটা বন্ধ। তাতে আমার কেমন সন্দেহ হল। কোনো লোক এল নাকি ও-বাড়িতে?'

দময়ন্তী এখানে বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার শোবার ঘর কি একতলায়?'

'না, দোতলায়। ও-বাড়িটাও দোতলা, তারই ওপরতলার একটা জানলা খোলা ছিল।'

'বাড়ির অন্যান্য জানলা-দরজা একটাও খোলা ছিল না?'

'না। এই আমার চাকর পঞ্চানন বা পঞ্চা, ও বাড়ির চারদিকে কাঁটাঝোপ মাড়িয়ে দেখে এসেছে যে, অন্য কোনো জানলা বা সদর দরজা খোলা নয়।'

দময়ন্তী বলল, 'বেশ, তারপর?'

'তার পরদিন দেখি, আবার জানলা খোলা। আমি বেকার লোক, তার ওপর অসুস্থ। আমার সারাদিনই প্রায় ঘরের মধ্যে, বাইরের জগতের সঙ্গে সংস্রবহীন অবস্থায় কাটে। এহেন লোকের কৌতূহলটা একটু বেশি হয়। আমারও তাই। ইজিচেয়ারে বসে মাঝে মাঝেই তাকাই ওদিকে, যদি কারোর সাক্ষাৎ পাই। ভূত কখনই নয়, ভূতে আমি বিশ্বাসও করি না। তবে নতুন কোনো প্রতিবেশী হতে পারে। কিন্তু, কাকস্য পরিবেদনা। কেউ জানলায় এসে দাঁড়ায় না।'

'আপনাদের দুটো বাড়ির মধ্যে দূরত্ব কত?' দময়ন্তী আবার প্রশ্ন করল।

'তা প্রায় ষাট ফুট হবে।'

'আপনার দৃষ্টিশক্তি কীরকম? চশমা নেই?'

'দৃষ্টিশক্তি আমার ভালোই। চশমা একটা আছে বটে, সেটা রাত্রিবেলা বই পড়বার সময় ব্যবহার করি, অন্য সময় খালি চোখেই দেখি। তবে, চোখ ভালো-খারাপ যাই হোক না কেন, ষাট ফুট দূরে একটা জানলায় একটা মানুষ এসে দাঁড়ালে, সেটা বুঝতে পারব ঠিকই। তা ছাড়া, আমি একবার একটা দূরবিনও ব্যবহার করেছিলুম। সে-কথাই বলছি পরে।

তার পরদিন আবার সেই ব্যাপার। রাত্রিবেলা জানলা বন্ধ, দিনেরবেলা খোলা। কে খোলে? পঞ্চা ইতিমধ্যে রিপোর্ট করে গেছে যে, সদর দরজা দিনেরবেলাতেও বন্ধ। কোন অসাধু লোক এসে আশ্রয় নিল কি? চোর-ছ্যাঁচোড় বা জেলপালানো কয়েদি নয় তো? খালি বাড়ি পেয়ে এসে জুটেছে!

আমার একজোড়া খুব শক্তিশালী দূরবিন আছে, কিন্তু সেটা ব্যবহার করতে পারছি না; কারণ কোনো উদ্বাস্তু পরিবার যদি এসে ওখানে আশ্রয় নিয়ে থাকে আর তাদের সঙ্গে যদি মেয়েছেলে থাকে, তাহলে তো বিপদ। ওরা যদি দেখতে পায় তো কেলেঙ্কারি করে ছাড়বে। তবু দূরবিনটা বের করে বালিশের পাশে রাখলুম। যদি কখনো সুযোগ আসে তো ব্যবহার করা যাবে।

দিন চার-পাঁচেক পরেই সুযোগ এসে গেল। সেদিন, মানে গত ষোলোই হঠাৎ দুপুরবেলা আকাশ অন্ধকার করে বৃষ্টি এসেছিল, মনে আছে? আমি পঞ্চাকে বললুম তাড়াতাড়ি সমস্ত জানলা বন্ধ করে দিয়ে শুধু দক্ষিণের একটা জানলা অল্প একটু খুলে রাখতে। তারপর আমি দূরবিন হাতে একটা চেয়ার টেনে জানলার সামনে বসলুম। বসে চোখে দূরবিন লাগাতেই যা দেখলুম, তাতে পিলে চমকে উঠল।'

'কী দেখলেন?' সমরেশ উদ্বিগ্ন।

'দেখলুম একটা লোক ওই ঘরের অন্ধকারের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে জানলাটা টেনে বন্ধ করল। এক লহমার জন্য তার মুখ আমি দেখতে পেলুম। অতি কদাকার সে মুখ— মাথায় খোঁচা খোঁচা চুল, ঘন লোমশ ভুরুর নীচে ধূর্ত কুতকুতে চোখ, থ্যাবড়া নাক, মোটা মোটা ঠোঁট আর সবমিলিয়ে একটা হিংস্র পাশবিকতা।'

'অত দূর থেকে এক লহমায় আপনি অত সব দেখতে পেলেন?' হাসি চেপে দময়ন্তী জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, পেলুম। কারণ দূরত্বটা তো তখন কয়েক ইঞ্চি মাত্র। আর অমন মুখ এক লহমায় দেখার পক্ষেই যথেষ্ট। তুমি ভাবছ, সব আমার অলস মস্তিষ্কের কল্পনা, না? কিন্তু সত্যি তা নয়। আমার মস্তিষ্ক যা নথিভুক্ত করেছে, তা একদম বাস্তব; কল্পনার ছিটেফোঁটাও নেই। যা হোক, আমি এটুকু স্থির নিশ্চয় হলুম যে আমার একজন প্রতিবেশী এসেছেন এবং তিনি যেমন অশরীরী নন, তেমনি খুব সুবিধের লোকও নন। তবে আমি আপন মনে আছি, তিনিও আপন মনে আছেন হয়তো। তাই আমি আর উচ্চবাচ্য করলুম না। তবু লক্ষ করলুম, সকাল আটটা থেকে নটার মধ্যে জানলা খোলে আর সন্ধে সাতটা থেকে আটটার মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়। এই খোলা-বন্ধটা হয় খুব আস্তে আস্তে এবং কাউকে দেখা যায় না জানলায়। সম্ভবত কোনো দড়ি বা আঁকড়ার সাহায্যে তা করা হয়। সেদিন হঠাৎ বৃষ্টি এসেছিল বলেই, আস্তে আস্তে করা যায়নি, প্রতিবেশীমশাইকে দৌড়ে জানলার কাছে আসতে হয়েছিল।

সাত-আটদিন এরকম চলার পর খেলাটা বন্ধ হল। যথাপূর্বং জানলা বন্ধই রইল। অমন একজন সুদর্শন প্রতিবেশীকে বাড়িতে এনে খাওয়াতে পারলুম না বলে আফশোস রয়ে গেল। তার দিন সাতেক পরেই আমার ঘরে চোর এল।'

'কী সর্বনাশ!' সমরেশ অস্ফুট স্বরে বলল।

'হ্যাঁ, তবে চোর ঘরে ঢুকতে পারেনি। আমার ঘুম খুব পাতলা। অসুখের পর থেকে এরকম হয়ে গেছে। জানলায় একটা আওয়াজ হতেই ঘুম ভেঙে গেল, পঞ্চাকে ডাকলুম, বেল বাজালুম। চোরটা ধুপ করে নীচের বাগানে লাফিয়ে পড়ে চম্পট দিল।

এর চার-পাঁচদিন পরে আবার চোর এল। প্রথমবারে এসেছিল শেষ রাতে, এবার এল রাত দুটো নাগাদ। এবারেও প্রথমবারের মতোই বেচারি সফলকাম হতে পারল না।

তার দুদিন পরে আবার। এবার রাত একটা। জানলা খুলে ফেলে ভেতরে লাফিয়ে পড়তে যাবে, এমন সময় আমার ঘুম ভেঙে যায়। আমি ওই দৃশ্য দেখে আতঙ্কে বোধহয় এমন চিৎকার করেছিলুম যে নীচ থেকে পদমবাহাদুর পর্যন্ত ছুটে এসেছিল। চোরটা অবশ্য তৎক্ষণাৎ জানলা টপকে পালায়, পঞ্চা আর পদম তাকে তাড়া করেও ধরতে পারেনি।'

অরবিন্দ চুপ করে রইলেন। উনি আরও কিছু বলবেন এই আশায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সমরেশ প্রশ্ন করল, 'তারপর কী হল?'

‘তারপর আমি তোমাদের কাছে এলুম। ভাবলুম, পুলিশে গিয়ে কোনো লাভ হবে না। তারা আমায় নিয়েই টানাহ্যাঁচড়া করবে। অসুস্থ লোক, মরেই যাব হয়তো। দময়ন্তীর নাম শোনা ছিল, মনে হল, আমার এই বিপদে যদি কেউ সাহায্য করতে পারে তো সে দময়ন্তী।’

দময়ন্তী বলল, ‘কিন্তু আমি আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি?’

অরবিন্দ বলল, ‘তোমার কী মনে হচ্ছে জানি না, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সামনের বাড়ির যে লোকটা আড়াল থেকে আমায় লক্ষ করত, সেই হচ্ছে চোর। এবং সে একজন জেল পালানো সাংঘাতিক চোর। আমি শক্তিহীন, অসুস্থ লোক। কতদিন তাকে ঠেকাব বলো দেখি? একথা জেনেই সে আমাকে তার আক্রমণের যোগ্য পাত্র বিবেচনা করেছে। যদি তাকে বারংবার বাধা দিই, তাহলে সে হয়তো আমাকে খুন করতেও দ্বিধা করবে না। এত আটঘাট বেঁধে সে যখন নেমেছে, তখন এটাই স্বাভাবিক, তাই নয় কি?

‘এখন তোমরা আমাকে কীভাবে সাহায্য করতে পার, সেটাই বলছি। তোমরা একবার সামনের বাড়িটায় যাও। উত্তর দিকের তেতলায় চারটে ঘর আছে, তার পুব দিক অর্থাৎ শ্যামাচরণ গাঙ্গুলী লেনের দিক থেকে দ্বিতীয় ঘরটায় সেই লোকটা থাকত। সেখানে এখনও নিশ্চয়ই তার থাকার কিছু না কিছু চিহ্ন পড়ে আছে। দময়ন্তী তা থেকে অনায়াসে তার পরিচয় বের করতে পারবে এবং অবিলম্বে পুলিশে ধরিয়ে দিতে পারবে। তোমাদের খরচ-খরচা যা হবে...’

দময়ন্তী হেসে ফেলল। বলল, ‘খরচার কথা বাদ দিন। আপনি তো বললেন, সে-বাড়ির আগগোড়া বন্ধ। আমরা ঢুকব কী করে?’

‘তা আমি কী করে বলব?’ অরবিন্দ অধৈর্য কণ্ঠে বললেন, ‘তা জানলে আর তোমার কাছে আসব কেন? আমিই তো পঞ্চাকে পাঠিয়ে লোকটাকে বাড়িতে ডেকে আনতে পারতুম।’

সমরেশ বলল, ‘ঠিক, ঠিক, ওসব খুব বড়ো সমস্যা হবে না। শিবেনকে বলে সমস্ত ব্যবস্থা করে ফেলব।’

অরবিন্দের মুখের ছায়া কেটে গেল। বললেন, 'বেশ, বেশ, তাহলে কতদিন বাদে টেলিফোন করব? খবরটা জানতে হবে তো। আর, শিবেন কে?'

সমরেশ বলল, 'শিবেন আমার বাল্যবন্ধু, ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের বড়ো অফিসার। এসব ব্যাপারে ও-ই আমাদের মুরুব্বি।'

অরবিন্দ আবার গম্ভীর হয়ে গেলেন। কম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'পুলিশ? আমার পুলিশ সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। তারা যে সংবাদটুকুর প্রয়োজন, সেটুকু ছাড়া অন্য সব ব্যাপারে নাক গলায় এবং যে দোষী তাকে বাদ দিয়ে অন্য নিরীহ লোককে থানায় পুরে রাখে। ওদের সংশ্রব যত এড়ানো যায় ততই ভালো।'

'না, না, শিবেন সেরকম নয়। যাতে আমাদের আপত্তি বা অসুবিধে, তা ও কখনোই করবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

'বেশ, তাহলে ভালই।' অরবিন্দের ভাঙা গলা ব্যাঙের ডাকের মতো শোনাল : 'আমার পাশের বাড়ির ওই চোর বাসিন্দাটিকে ধরে জেলে পোরা ছাড়া অন্য ব্যাপারে নাক না গলালেই হল। আমি ডাল দিয়ে ভাত খাই কি না, সন্ধেবেলা কী করি... ইত্যাদি আমার ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ব্যাপারে যেন তদন্ত না হয়। আশা করি আমার এইটুকু অনুরোধ তোমরা রাখবে।'

অসন্তুষ্ট মুখে দময়ন্তী অরবিন্দের উদ্ধত উপদেশ শুনছিল। বলল, 'কিন্তু যদি দেখা যায় যে চোর আপনার পরিবারেরই কেউ, তাহলে কী হবে? তদন্ত কি বন্ধ করে দেওয়া হবে?'

ক্রুদ্ধ রক্তবর্ণ চোখে দময়ন্তীর দিকে তাকালেন অরবিন্দ। হাতের লাঠিটা মাটিতে ঠুকে গর্জন করে উঠলেন, 'ঈশ্বর রণদেব আচার্যের পরিবারে কোনদিন চোর জন্মায়নি, জন্মাবেও না।' বলতেই হঠাৎ তাঁর ক্রুদ্ধ চোখের ওপর একটা করুণ মিনতির অপ্রত্যাশিত ছায়া পড়ল। গলা নামিয়ে আনত চক্ষে বললেন, 'আমার ওপর তুমি রাগ করেছ, না? আমার মাথার ঠিক নেই, কখন কী বলতে কী বলে ফেলি, তা কি ধরতে আছে? দেখ, একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা কর। ভবানীপুরের আচায্যিবাড়ির বয়স একশো আট বছর। মুকুন্দপুরে আমাদের ভদ্রাসনে এখন গভর্নমেন্ট কলেজ হয়েছে, হোস্টেল হয়েছে, তাতেও কাজে লেগেছে বাড়িটার অর্ধেক। তা, সে বাড়িটার বয়সও প্রায় শ' দুয়েক বছর হবে। কাজেই আমাদের বাড়ির প্রতি ইট-কাঠে, আমাদের প্রতি রক্তকণায় কত ইতিহাস, কত ঘটনা, কত বিচিত্র বিবরণ যে লুকিয়ে আছে, তার কি কোনো ইয়ত্তা আছে? সেইসব ঘটনার সবগুলোই যে প্রীতিকর তা নয়, তাদের অনেকগুলোই অপ্রীতিকর, হয়তো বা বর্ণনা কিংবা প্রকাশেরও অযোগ্য। তা হলেও সেই সমস্ত ঘটনা, প্রীতিকর বা অপ্রীতিকর, পতন বা উত্থান, নীচ বা মহান— সমস্ত মিলেই তো আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের ইতিহাস?

'এমন কিছু লোক আছে যারা কৃমিকীটের মতো কেবল আবর্জনা খোঁজে। সাধারণ লোকের কাছে তারা যায় না, কারণ সেখানে তো স্তূপীকৃত ইতিহাস নেই— যার ভেতর থেকে টেনে বের করা যাবে উত্তেজক নোংরামো। আমাদের মতো অসাধারণ পরিবার দেখলে তারা তৎক্ষণাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাই আমাদেরও সসংকোচে দূরে থাকতে হয়— বাঁচিয়ে চলতে হয় আমাদের ইতিহাস, আমাদের ইজ্জত।'

দময়ন্তী বিতৃষ্ণ চিত্তে অরবিন্দের কথা শুনতে শুনতে ভাবছিল, একটা লোকের কাতর আর্ত মিনতিও যে কতদূর স্পর্ধিত আর অহংকৃত হতে পারে, এ বোধহয় স্বকর্ণে না

শুনলে বিশ্বাস করা যেত না। কিন্তু এমন সব ভয়ানক অসাধারণ লোকেরা কেন যে নেহাত সাধারণ চোরের পাল্লায় পড়েন, কে জানে?

অরবিন্দ তখনও বলে চলেছেন, 'একজন অসহায়, অথর্ব, পঙ্গু লোককে তুমি সাহায্য কি করবে না, দময়ন্তী? আমি বেশিদিন আর বাঁচব না ঠিকই, কিন্তু এমনভাবে আমি মরতে চাই না। শুধু একটু খোঁজ করে দেখ। যদি কিছু বের করা সম্ভব না হয়, তাহলেও আমি এটুকু সান্ত্বনা পাব যে আমার জন্য কিছু করা হয়েছিল। শুধু তার জন্যেই আমি তোমাকে জীবনের বাকি কটা দিন আশীর্বাদ জানাব।'

সমরেশ তার প্রাক্তন পূজনীয় হিরোকে এহেন কাকুতি-মিনতি করতে দেখে খুব নরম হয়ে পড়েছিল। বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, অরবিন্দদা, দময়ন্তী নিশ্চয়ই সাহায্য করবে আপনাকে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

দময়ন্তী অপ্রসন্ন চোখে সমরেশের দিকে তাকাল বটে, কিন্তু খুব একটা রাগও করতে পারল না। বলল, 'আচ্ছা, অরবিন্দবাবু, আমরা একবার না হয় চেষ্টা করে দেখব। এখন কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই আপনাকে। কতকগুলো বিষয় পরিষ্কার করা দরকার।

প্রথমত আপনি বললেন— আপনার পাশের বাড়ি আপনি জন্মাবধি বন্ধ দেখে আসছেন; অথচ তার উত্তর দিকে চারটে ঘর আছে, আপনি জানলেন কী করে? বাইরের জানলায় সার দেখে তো জানা যায় না ভেতরের ঘরের সংখ্যা কত?'

অরবিন্দ খানিকক্ষণ ঘোলাটে দৃষ্টিতে দময়ন্তীর দিকে চেয়ে রইলেন, তারপর জড়িত কণ্ঠে বললেন, 'ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি ওদিকে চারটে ঘর— সেটা সত্যি না-ও হতে পারে।'

'আচ্ছা। দ্বিতীয়ত, আপনার বাড়ির দক্ষিণ দিকের ঘরের সংখ্যা কত?'

'তিন। একদম ধারেরটায় আমি থাকি, মাঝেরটায় থাকে পঞ্চা ওর বুড়ি মা-কে নিয়ে, আর শেষেরটা তালাবন্ধ— আমার বোন আর ভগ্নীপতি মাঝে মাঝে এলে ও-ঘরে থাকে।'

'আপনার ঠিক নীচে একতলায় কে থাকেন?'

'একতলাটা শরৎ বোস রোডের হিমালয়ান টি-কনসার্নের চায়ের গুদোম। রাত্রে কেউ থাকে না। ওদের দারোয়ান পদমবাহাদুর থাপা ওই গুদোম আর আমার বাড়ি দুটোই পাহারা দেয়। দিনেরবেলা একটা বুড়ো স্টক কিপার থাকে। সে আবার মাঝে মাঝে কাজ না থাকলে ওপরে এসে আমার সঙ্গে সুখ-দুঃখের গল্প করে। তবে সে লোকটা পাজি, অত্যন্ত ইতর। আমি নেহাত নিঃসঙ্গ, তাই ওকে সহ্য করি।'

'আচ্ছা, আপনার বাড়িতে মোট ঘর কটা?'

'বারোটা। কেন? চোর এল কেবল আমার ঘরে, তার সঙ্গে বাড়ির বাকি কটা ঘরের কোনো সম্পর্ক আছে কি?' কাষ্ঠ হেসে অরবিন্দ বললেন, গলায় সুস্পষ্ট বিরক্তি।

'আছে। দেখুন, কিছু মনে করবেন না, আপনি যদি আমার সাহায্য চান, তাহলে কিন্তু আপনাকেও আমাকে সাহায্য করতে হবে। আপনি যদি আমার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে অপারগ হন, তাহলে আমার বোধহয়, আমাদের আলাপ-আলোচনার এখানেই সমাপ্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়।' দময়ন্তী শান্ত ঠান্ডা গলায় বলল।

বিমর্ষ মুখে অরবিন্দ বললেন, 'না, না, আমি তোমার সমস্ত প্রশ্নেরই জবাব দেব, শুধু, দেখ, যেন খুব ব্যক্তিগত প্রশ্ন না হয়।'

‘দেখা যাক। আচ্ছা, আপনি বললেন, আপনার বাড়িতে ঘরের সংখ্যা বারো। সে কি একতলায় ছটি আর দোতলায় ছটি?’

‘হ্যাঁ।’ অসহায়, ক্লান্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন অরবিন্দ।

‘দোতলার উত্তর দিকের ঘরগুলোতে কে থাকেন?’

‘সে তিনটে ঘর একটা আলাদা ফ্ল্যাট। তা ছাড়া আমার পাশের বাড়ি থেকে তো সে ঘরগুলো দেখাও যায় না।’

‘তা না যাক। তবু আমার জানা দরকার আপনার অব্যবহিত প্রতিবেশী কে। ভাড়াটে আছে?’

‘না, ও-ফ্ল্যাটে থাকেন আমার স্ত্রী।’

‘আপনার স্ত্রী?’ স্তম্ভিত দময়ন্তী কোনো রকমে বলল। এরকম একটা সম্ভাবনার কথা ও ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করেনি।

‘হ্যাঁ, আর কিছু জানবার আছে তোমার?’ অরবিন্দের ভাঙা গলায় আবার ব্যাঙ ডেকে উঠল, তবে এবার যেন বিষণ্ণ ব্যাঙ।

দময়ন্তী অল্প সময় চুপ করে রইল। তারপর বলল, ‘হ্যাঁ, এটাই শেষ। আপনার ঘরে কি কোনো মূল্যবান জিনিস আছে?’

অরবিন্দ বাঁ হাতটা তুলে তার পেছন দিকটা দময়ন্তীর দিকে ফিরিয়ে বললেন, ‘এই দুটো আংটির মোট দাম এখন চার হাজার টাকা, আর যে পিংক মার্বেল-টপ টেবিলে আমার ওষুধ থাকে তার দাম হাজার আড়াই হবে। এছাড়া আরও কিছু টুকিটাকি আছে বেশি দামের মধ্যে।’

সমরেশ চট করে মুখ তুলে পঞ্চার দিকে তাকাল। সদ্যোজাতশ্মশ্রু সে মুখ ভাবলেশহীন। অরবিন্দ বোধহয় সমরেশের মনের ভাব বুঝতে পারলেন। বললেন, ‘পঞ্চা ছেলেটি বুদ্ধিমান। ও জানে আমার যা আছে, তার তুলনায় এগুলো কিছুই নয়, আর যে হাঁস সোনার ডিম পাড়ে তাকে সযত্নে লালনপালন করাই শ্রেয়। তাই না রে পঞ্চা?’

পঞ্চার মুখ পূর্ববৎ ভাবলেশহীন।

‘নে তোল আমাকে। আর কতক্ষণ এঁদের বিরক্ত করবি? আচ্ছা, দময়ন্তী, আমি তাহলে এখন চলি। দেখ, তোমরা যদি কিছু করতে পার। আর তোমার ওই বাচ্চা ঝি-টি যে আমাকে চা দিয়ে গেল, তাকে আমার ধন্যবাদ জানিও, আর বোলো যে আমার কুত্রাপি কিছু খাওয়া একেবারে নিষিদ্ধ।’

২

শিবেন বলল, ‘আগাগোড়া আদিখ্যেতা।’

সমরেশ মাথা নেড়ে বলল, ‘না, না। দেখ, তুই যাই বল না কেন, যে চোর দুবার বাধা পেয়েও তৃতীয়বার আসে তাকে কিছুতেই সাধারণ চোর বলা চলে না।’

‘কেন চলবে না? আসলে এসব বড়োলোকি ভণ্ডামো। বাড়িতে চোর এসেছে, থানায় খবর না দিয়ে এসেছেন নাটুকেপনা করতে। গিন্নিটি তো বুঝতে পারছি ভিন্ন হেঁশেল। সেটা লুকোনোর জন্য এত মশকরা করবার দরকার কী? পুলিশের আর খেয়ে-দেয়ে কাজ

নেই, চোর ধরতে গিয়ে বউ ধরবে। আর তোরই বা কীরকম আক্কেল? দাদার বন্ধু শুনে গলে গেলি? ভাগিয়ে দিতে পারলি না?'

সমরেশ বলল, 'যা বুঝিস না, তা নিয়ে বকবক করিস না। অরবিন্দ আচার্যকে তুই দেখেছিস আগে, তার টপ ফর্মে? দেখলে আর একথা বলতিস না। একটা মুমূর্ষু হাতিকে দেখলে যদি তোর দুঃখ না হয়, বুঝব তুই একটা হৃদয়হীন পাষণ্ড। কিন্তু হাতি হাতিই, মরবার সময়ও তার গজদন্তর গৌরব ক্ষুণ্ণ হয় না।'

শিবেন হাত নেড়ে বলল, 'তোর হাতির নিকুচি করেছে। যেমন তোর মোটা বুদ্ধি, উপমা দিতে হলেও হাতি নিয়েই টানাটানি করিস। এই তোদের মতো লোকেদেরই কমিউনিস্টরা বলে স্যাঁতসেঁতে পাতি বুর্জোয়া।'

দময়ন্তী হাসতে হাসতে বলল, 'না, না, ওর মোটেই দোষ নেই। ভদ্রলোককে তো আমারও বেশ খারাপই লেগেছিল। কিন্তু ওঁর মধ্যে এমন একটা আকর্ষণী শক্তি আছে যে, যদি কিছু অনুরোধ করেন তো কিছুতেই না বলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে, আমিই রাজি হয়ে গিয়েছিলুম।'

'বেশ করেছিলেন।' শিবেন বলল, 'এখন যাবেন নাকি চোর ধরতে?'

'হ্যাঁ, যাব। শুধু চোর ধরতে নয়, আমার মনে হচ্ছে, এর মধ্যে আরও ব্যাপার আছে। অনেকগুলো জায়গায় খটকা লাগছে। যেমন ধরুন, প্রথমত, ভদ্রলোকের যে চিৎকারে একতলা থেকে দারোয়ান দৌড়ে আসে, তাতেও পাশের ফ্ল্যাট থেকে তাঁর স্ত্রী আসেন না? ধরে নিলুম, তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কোনোরকম সম্পর্ক নেই, সেক্ষেত্রে এই স্ত্রীটি একই বাড়িতে একটা পুরো ফ্ল্যাট নিয়ে থাকেন কী করে? এবং কেন? আচার্যবাড়ির বিশাল সম্পত্তির ওপর কি তাঁর কোনো অধিকার আছে? অথবা, পঙ্গু স্বামীটি মরে গেলে সমস্ত সম্পত্তিটি অধিকার করবেন, এই আশায়ই কি তিনি এক বাড়িতে অবস্থান করছেন? ভদ্রলোককে তাঁর স্ত্রী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জিজ্ঞেস করতে পারলুম না, পারলে সুবিধে হত।

'দ্বিতীয়ত, পাশের বাড়িটি যদিও বাহ্যত তালাবন্ধ, কিন্তু অরবিন্দবাবু তার ভেতরে গেছেন এবং তার ভেতরটা ভালো করেই জানেন। হয়তো ছেলেবেলায় খেলতে গিয়ে পাঁচিল টপকে বা অন্য কোনোভাবে ভেতরে ঢুকে সব দেখেছিলেন। কিন্তু আজ সে-কথা প্রকাশ করতে তিনি কুণ্ঠিত হচ্ছে কেন?

'তৃতীয়ত পঞ্চা ছেলেটি কে? আপাতদৃষ্টিতে সে অরবিন্দবাবুর চাকর। অথচ, ভীরু প্রকৃতি সাবধানি অরবিন্দ তার সামনেই অসংকোচে তাঁর মূল্যবান জিনিসপত্রগুলো দেখান, তাদের হদিশ দেন, এটাই বা কীরকম? স্বর্ণডিম্বপ্রসবিনী হংসকে লালনপালন করা কর্তব্য হতে পারে, কিন্তু সে হংস বেচারিকে যে বেঘোরে প্রাণ হারাতে হয়েছিল, সে ইতিহাস কি তাঁর জানা নেই? আর লক্ষ করে দেখেছি, পঞ্চা ছেলেটি কক্ষনো হাসে না। কেন?

'চতুর্থত, পুলিশের প্রতি তাঁর এত অ্যালার্জির কারণ কি শুধুই নিজের ভাঙা হাঁড়িটা লোকচক্ষুর আড়ালে রাখা? যেখানে তিনি মৃত্যুভয়ে কাতর সেখানেও, তাঁর যে ইজ্জত আর নেই, তার জন্য নিজের প্রাণরক্ষায় সমস্ত রকম সাবধানতা অবলম্বন করার অনিচ্ছাটাও কেমন যেন অস্বাভাবিক, তাই না?'

অসহায় মুখে সমরেশ বলল, 'ভয়ানক কঠিন প্রশ্নমালা, তার ওপর সবগুলো কমপালসারি। নে রে শিবেন, টেবিল-চেয়ারগুলো ভাঙতে শুরু কর। যুগধর্মকে অস্বীকার করিসনি।'

শিবেন বলল, 'চুপ কর। এই এতগুলো প্রশ্ন থেকে আপনি কী সন্দেহ করেন, বৌদি?'

'কিছুই না, আবার অনেক কিছু। তবে একটা ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ যে, চোর আসাটা এখানে কোনো একটা বড় ঘটনা নয়। তার পেছনে অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে।

'দেখুন, ক্যাশ টাকা আজকাল বড়ো কেউ বাড়িতে রাখে না। ভদ্রলোক থাকেন একা, চাকর আর তার বুড়ি মাকে নিয়ে। যদি স্ত্রী থাকতেন তো গয়নাপত্র কিছু থাকবার সম্ভাবনা ছিল। তাও নেই। আড়াই হাজার টাকার টেবিল আর চার হাজার টাকার আংটি, এসব চুরি করার জন্য চোর উলটোদিকের ভূতুড়ে বাড়িতে অন্ধকারে বসে বসে দিনের পর দিন গোয়েন্দাগিরি করছে, আর বাধার পর বাধা পেয়েও আবার ঘুরে আসছে, এটা বিশ্বাস করা কঠিন। অবিশ্যি চোরেদের মনস্তত্ত্ব আমার ভালো জানা নেই, তাহলেও কেমন যেন মনে হচ্ছে, চোরের উদ্দেশ্য স্রেফ চুরি করাই নয়, অন্য কিছু।'

'আপনার সন্দেহ, অরবিন্দের গৃহিণী স্বামীটিকে সাবাড় করবার জন্য লোক লাগিয়েছে, তাই না?' শিবেন প্রশ্ন করল।

'এরকম একটা সন্দেহ যে আমার হচ্ছে না, তা নয়। তবে জোর করে কিছুই বলা যায় না। যেটুকু জেনেছি, তাতেই তো সন্দেহভাজন লোক অনেকগুলো। ওঁর স্ত্রী ছাড়াও, পঞ্চানন আছে, পদম আছে, আছে একতলার বুড়ো স্টক-কিপার।'

'তাহলে আপনি এখন কী করতে চান?'

'চোরটার পরিচয় চাই অথবা যে লোকটা উলটো দিকের বাড়িতে বসে ছিল, তার। একথাটা আমার মনে দৃঢ়মূল হয়েছে যে অরবিন্দ আচার্য নামক আত্মাভিমানী, অকালবৃদ্ধ, নিঃসহায় লোকটি এক ঘোরতর বিপদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। তাঁকে সাহায্য করতে চাই। এজন্য নয় যে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে তাই, বরং তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীরা ঘৃণ্য জীব বলে আমার সন্দেহ হচ্ছে, সেই জন্য। আপনি আমাদের সাহায্য করবেন তো?'

'করতেই হবে।' শিবেন সনিশ্বাসে বলল, 'তা আমাকে কী করতে বলেন?'

'আপনাকে একবার ওই ভূতুড়ে বাড়িটাতে সরেজমিনে তদন্তে যেতে হবে। আচার্যিমশায় ঠিকই বলেছেন, পুবদিকের দ্বিতীয় ঘরটায় নিশ্চয়ই কোনো চিহ্ন বা সূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে।'

'বেশ, তাহলে আগামী শনিবার বিকেল নাগাদ যাওয়া যাবে। আপনারা রেডি হয়ে থাকবেন, আমি এসে নিয়ে যাব।'

দময়ন্তী শঙ্কিত মুখে বলল, 'আমার যাওয়ার কি কোনো দরকার আছে? আপনি গেলেই তো যথেষ্ট। সঙ্গে না হয় সমরেশকেও নিয়ে যাবেন।'

ঘনঘন মাথা নাড়ল শিবেন। বলল, 'সে হবে না। যেতে আপনাদের দুজনকেই হবে। তা ছাড়া, সেই ভূতের বাড়িতে আমি একা যাব? নৈব, নৈব চ। জানেন তো, পুলিশ হলে কী হয়, আমার আবার ভীষণ ভূতের ভয়।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে দময়ন্তী বলল, 'সে কি আর আমারই নেই?'

দুই বন্ধু একসঙ্গে সশব্দে ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠল। অপ্রস্তুত হয়ে রেগে গেল দময়ন্তী। চোখ পাকিয়ে সমরেশকে বলল, 'চুপ কর। তোমার মতন অমন লোহার মতো শক্ত শক্ত হাত-পা হলে আমিই কি ভূতকে ভয় পেতুম নাকি? আর রাত্রিরবেলা তেমন তেমন জায়গায় পড়লে ওই পিলে চমকানো হাসি বেরিয়ে যাবে, বুঝেছ স্যার?'

সমরেশ হাসতে হাসতেই বলল, 'সব বুঝেছি। শুধু বুঝতে পারছি না যে, এতসব রহস্যের তুমি সমাধান করবে কী করে! অরবিন্দদা তো গণ্ডি কেটে চোরের পরিচয় রহস্যটুকুর মধ্যেই তোমাকে বিচরণ করতে বলে গেছেন। তার বাইরে যাবে কি করে?'

দময়ন্তী গম্ভীর হয়ে বলল, 'দেখা যাক। চোরকে যদি ধরতে পারি, তাহলে হয়তো তার সঙ্গে আরও অনেক রহস্যেরই সন্ধান পাওয়া যাবে।'

শিবেন বলল, 'হ্যাঁ, যেমন কান টানলে মাথা আসে।'

৩

শনিবার বিকেলে দুয়ার দেশে ধুতি পাঞ্জাবি শোভিত শিবেন দেখা দিল, পেছনে সুসজ্জিতা রমলা। সমরেশ খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠল, 'এ কী ? চোর ধরতে যাবি বলে এসেছিস, না বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে? বৌটাকে বগলদাবা করে আনলি কেন আবার?'

রমলা বলল, 'এ যে রীতিমতো অপমান! অতিথিকে কোথায় সম্বর্ধনা করবেন, তা না বাড়িতে ঢুকতে না ঢুকতেই অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে দিলেন? আপনার গিন্নি কোথায়? যাই, তার কাছে ফরিয়াদ করে আসি।' বলে সমরেশের পাশ কাটিয়ে শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

শিবেন বলল, 'লাইট হাউসে চারটে টিকিট কেটে এনেছি, বুঝলি? গোয়েন্দাগিরিতে তো বড়োজোর দশ মিনিট সময় লাগবে। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে অনন্তর মোগলাই পরোটা খেয়ে সোজা লাইটহাউস। কী বলিস?'

'এতে আর বলবার কী আছে?' সমরেশ উজ্জ্বল মুখে বলল, 'শুধু গোড়ায় ওই গোয়েন্দাগিরিটুকু না থাকলেই সর্বাঙ্গসুন্দর হত। ভেবেছিলুম শনিবারের বিকেলটা ভূতুড়ে বাড়ির শতাব্দীর পুরোনো ধুলো খেয়েই কাটবে, কিন্তু তার সঙ্গে মোগলাই পরোটা, আহা...' বলতে বলতে ভাবের ঘোরে উঠে গিয়ে রেকর্ড প্লেয়ারে মুনাব্বর হোসেন খাঁ-র একটা বৃন্দাবনী সারং বসিয়ে দিল।

একটু পরেই দময়ন্তী আর রমলা বসবার ঘরে এসে ঢুকল। দময়ন্তীর প্রসাধন শেষ। রমলা আসাতে যে ও খুব পুলকিত হয়েছে, সেটা ওর হাস্যোজ্জ্বল মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু কর্তব্যবোধ জিনিসটা এমনই যে খুব সযত্ন রক্ষিত বাগানেও অবধারিত আগাছার মতো সেটা মাথা তুলে দাঁড়ায়। তারই তাড়নায় দময়ন্তী বলল, তোমার খাঁ সাহেবকে একটু থামাও বাপু। শিবেনবাবুর সঙ্গে একটা জরুরি কথা সেরে নিই, তারপর বেরোব।'

শিবেন বলল, 'আহা, খাঁ সাহেব চলুক না, তার সঙ্গে আপনার জরুরি কথাটাও চলুক।'

দময়ন্তী বলল, 'আচ্ছা বেশ। মানে ব্যাপারটা হচ্ছে, আমরা যে ইনভেস্টিগেশনে যাচ্ছি, সেটা হবে কীভাবে? মানে শ্যামাচরণ গাঙ্গুলী লেনের বাড়িটায় যেসব সূত্রের সন্ধানে যাচ্ছি, তার জন্য তো বাড়িটার ভেতরে ঢোকা দরকার। সেটা হবে কী করে? আপনি যে পোশাকে এসেছেন, তাতে তো পাঁচিল টপকানো সম্ভব নয়।'

শিবেন বলল, 'পাঁচিল টপকানোর কোনো প্রয়োজনই হবে না। ভেবেছেন কী? আমি কি এতদিন চুপ করে বসে ছিলুম? এই দেখুন, সিংহদরজার চাবি আমার পকেটে।' বলে পকেট থেকে একটা বোম্বাই সাইজের চাবি বের করে দেখাল।

সমরেশ বলল, 'বাঃ, বাঃ! ভালো দিয়েছিস। কোত্থেকে পেলি চাবিটা?'

‘খোদ মালিকের কাছ থেকে, আবার কোত্থেকে! পুলিশের অসাধ্য কি কোনো কাজ আছে? খোঁজ নিয়ে জানা গেল বাড়িটার বর্তমান মালিক চম্পালাল হীরালাল নামে একজন মাড়োয়ারি ভদ্রলোক। বছর খানেক হল বাড়িটা কিনেছেন। তাঁর কাছ থেকেই আনা গেল।

এই চম্পালাল হীরালাল কিন্তু মোটেই হোঁতকা মোটা, কপালে লাল সিঁদুরের ফোঁটা কাটা মাড়োয়ারি নন, রীতিমতো আলোকপ্রাপ্ত, আগাগোড়া সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়া আধুনিক মাড়োয়ারি। পার্ক স্ট্রিটে এঁর অফিস, তাতে আবার সুন্দরী বিড়ালাক্ষী রিসেপশনিস্ট। ইনি পরেন ফ্লেয়ার্স, যান ক্যালকাটা ক্লাবে আর অতিথি এলে, বিশেষত যদি পুলিশ হয়, তো অফার করেন ‘কিং অব কিংস।’

‘কীসের ব্যবসা ভদ্রলোকের?’ সমরেশ জিজ্ঞেস করল।

‘অনেক কিছুর।’ কেমিক্যালস, কাগজ, কোল্ড স্টোরেজ ইত্যাদি। ইদানীং নেমেছেন বাংলা সিনেমা প্রযোজনায়। কিছুদিন আগে যে ‘এবার অবগুণ্ঠন খোলো’ বলে সিনেমা এসেছিল, ইনি ছিলেন তার প্রযোজক।’

দময়ন্তী বলল, ‘তাই নাকি? রমু, তুই তো বাংলা সিনেমার এনসাইক্লোপিডিয়া। ‘এবার অবগুণ্ঠন খোলো’ সম্পর্কে কিছু আলোকপাত কর।’

রমলা বলল, ‘আমি আবার কী বলব! শিবেনকেই জিজ্ঞেস কর না।’

শিবেন স্তম্ভিত। বলল, ‘আমি! আমি কী বলব?’

‘কেন?’ রমলা কটকট করে বলল, ‘মনে নেই তোমার? সেই যে গত বছর তোমার জন্মদিনে গিয়েছিলুম? রাত্রে ফিরে এসে সে কী কাতরানি! বিছানায় শুয়ে সে কী ছটফটানি! চোখে দেখা যায় না।’

দময়ন্তী শঙ্কিত হয়ে বলল, ‘সে কী রে! কী হয়েছিল?’

‘প্রেমজ্বর! সংস্কৃতে পড়িসনি, সে-যুগে নায়করা সব নায়িকাদের দেখে কেউ উন্মাদ হয়ে হাত পা ছুড়তেন, কেউ ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়তেন, কেউ কেউ আবার মরেও যেতেন? ওই সব স্বেদ, স্তম্ভ, মূর্ছার ব্যাপার আর কী! ওঁর তাই হয়েছিল। এমনিতে তো আমার পাশে শুলেই ঘঁৎ ঘঁৎ করে নাক ডাকে, সেদিন সারারাত ওঁর দীর্ঘশ্বাসের ঠেলায় ঘুমোতে পারি নে! এতদিন ভাবতুম সংস্কৃত কাব্যে যত সব বাড়াবাড়ির ব্যাখ্যান, সেদিন বুঝলুম মোটেই তা নয়।’

সমরেশ পুলকিত মুখে শিবেনের দিকে ঘুরে বসল। বলল, ‘ব্যাপারটা কী বন্ধুবর? একটু খুলে বলতে হচ্ছে।’

শিবেন মিটিমিটি হাসছিল। বল, ‘সেই বইটাই ‘এবার অবগুণ্ঠন খোলো’ নাকি? আমি তো নামটা ভুলেই গিয়েছিলুম। অতি ওঁচা বই। তবে হ্যাঁ, মনে আছে একজন সহনায়িকা ছিল বটে! একেবারে চরিত্র- ধ্বংসকারী চেহারা। যাকে বলে, শ্রোণীভারাদলস গমনা স্তোকনম্রা...’

দময়ন্তী বলল, ‘থাক থাক। নায়িকা কে ছিল?’

‘ভুলে গেছি। কে ছিল গো?’

দময়ন্তী বলল, ‘নায়িকা কে ছিল ভুলে গেছেন, অথচ সহনায়িকাকে মনে আছে? আশ্চর্য তো?’

‘থাকবে না? বললুম যে চরিত্র-ধ্বংসকারী...’

‘তা সেই মহিলার নামটা মনে আছে?’

‘না, তাও ভুলে গেছি।’

‘হুঁ, নামটা জোগাড় করতে পারেন?’ দময়ন্তীর গলাটা গম্ভীর শোনাল।

‘পারি। আপনি কি একেবারে গোড়া থেকেই ”সার সে লা ফম” শুরু করলেন নাকি? সে যাক গে, এ প্রসঙ্গে আরেকটা কথা জানিয়ে রাখি। চম্পালাল হীরালালের কাছ থেকে চাবি জোগাড় করতে আমাকে একটা মিথ্যে কথা বলতে হয়েছে। তদন্ত করতে যাচ্ছি বললে কীরকম তার ভাব হবে জানি নে তো, সেই জন্যে বলেছি যে আমার এক প্রযোজক বন্ধুকে নিয়ে ওই বাড়িটা দেখাতে চাই, তিনি পুরোনো আগাছা জঙ্গলে ভরা অথচ শহরের মধ্যে একটা বাড়ি খুঁজছেন লোকেশন শ্যুটিংয়ের জন্য। হীরালাল শুনে উৎসাহিত হয়ে চাবিটা দিয়ে দিয়েছেন। তা আমরা এখন যে যাচ্ছি, যদি দৈবাৎ ওখানে হীরালালের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তো সমরেশ হবে সেই প্রযোজক। তুই তাপ্পি দিয়ে ম্যানেজ করত পারবি তো?’

সমরেশ তেজের সঙ্গে বলল, ‘আলবত।’

৪

শিবেনের সাদা ফিয়াট ধ্যানেশ মিত্তির রোড থেকে বাঁ দিকে ঘুরে শ্যামাচরণ গাঙ্গুলী লেনে ঢুকল। গাড়ির গতি কমই ছিল। আরও কমিয়ে শিবেন ট্যুরিস্ট গাইডের মতো ঘোষণা করল : ‘এই যে আমাদের ডান দিকে দ্বিতল গৃহটি দেখা যাচ্ছে, সেটিই হচ্ছে ইতিহাস প্রসিদ্ধ আচার্য-ভবন, বর্তমানে শ্রীল শ্রীযুক্ত অরবিন্দ আচার্য্যের বাসভূমি। ...উঃ, তোমাদের বকবকানি একটু থামাবে?’

দময়ন্তী আর রমলা পেছনের সিটে বসে বাহ্যজ্ঞানলুপ্ত হয়ে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছিল, শিবেনের কথা আর ধমক শুনে ঘাড় ফিরিয়ে ডান দিকে তাকাল।

ফুটপাথের শেষে ঢালাই লোহার ফুট আষ্টেক উঁচু রেলিং থেকে প্রায় পঁচিশ ফুট দূরে আচার্য-ভবন। রেলিংয়ের ভেতর দিয়ে বাড়িটা স্পষ্ট দেখা যায়, কারণ চারদিকে যদিও যথেষ্ট জমি, কিন্তু কোথাও কোনো গাছ বা হেজ কিচ্ছু নেই। কেবল অযত্নরক্ষিত রুক্ষ মাঠ আর তার ওপর গাদা করা ভাঙা চায়ের পেটি কোথাও, কোথাও বা ইট-পাটকেল। এসব সত্ত্বেও বাড়িটা কিন্তু মনকে নাড়া দেয়। তার বর্তমান মালিকের মতোই— এক কালে রাজসিক বাড়িটা এখন অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অকরুণ প্রকৃতির খুনি আঙুলের থেকে নিজেকে বাঁচাবার নীরব লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। বাড়িটার ফসাড কলোনিয়াল ঢঙের। মাটি থেকে দোতলার ছাদ পর্যন্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড থাম আর খিলেন করা রঙিন কাচ বসানো বিশাল বিশাল দরজা-জানলা নিয়ে তার অতীত আভিজাত্যের আর ঐশ্বর্যের সাক্ষ্য বহন করে হাস্যকর অহংকারে দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটা। গেট বন্ধ, কিন্তু তালা দেওয়া নেই। কোনো লোকজনের কোথাও চিহ্নমাত্র দেখা যাচ্ছে না।

শিবেনের গাড়ি আরও দক্ষিণে এগিয়ে যে বাড়িটার সামনে দাঁড়াল সেটাও প্রায় তার প্রতিবেশীর মতোই প্রাচীন, তেমনি অযত্নরক্ষিত, তেমনি বিশাল, কেবল চারপাশের জমিটা আরও বেশি জঙ্গলাকীর্ণ আর তাদের মধ্যে বেশ কয়েকটা বড়ো বড়ো গাছ। তফাত আরো একটা আছে। আচার্য ভবনের মতো এর সামনে কোনো থাম-টাম নেই, একেবারে

চাঁচাছোলা ওপরে নীচে দুসার রং ওঠা জানলার সারি কেবল। সে জন্যই হোক বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক, সমস্ত বাড়িটারই কেমন যেন বিষণ্ণ দম আটকানো ভাব।

সমরেশ বলল, 'এই তোর জহরলাল পান্নালালের বাড়ি? বাপরে, এ যে আগাপাশতলা হানাবাড়ি রে!'

শিবেন বলল, 'জহরলাল পান্নালাল নয়, চম্পালাল হীরালাল। আর হানাবাড়ি নয় তো কী? চারদিকে তাকিয়ে দেখ, এ-রাস্তায় প্রায় সব কটি বাড়িই তো অমনি— একেকটা মিউজিয়াম পিস। তার মধ্যে ইনি আবার একেবারে খাতায় নাম লেখানো হানাবাড়ি।'

রমলা শঙ্কিত কণ্ঠে বলল, 'ওর মধ্যে আমাদের যেতে হবে?'

মাথা নেড়ে শিবেন বলল, 'হ্যাঁ, যেতে হবে। কারণ অরবিন্দ আচার্য যৌবনে ফুটবল খেলতেন আর কাব্যি করে কথা বলতে পারতেন।' বলতে বলতে শিবেন ডান ডিকে গাড়ি ঘোরাল। সমরেশ নির্বিকার, কথাটা গায়েই মাখল না।

ফুটপাথের ধারে দাঁত বের করা ইটের দেওয়ালের মাঝখানে প্রবেশপথ। দুপাশে প্রকাণ্ড দুটো ভগ্নপ্রায় থাম, তাদের গায়ে নানা রকমের গাছ অপ্রতিহত ভাবে বংশবৃদ্ধি করছে। ফটক-টটক কিচ্ছু নেই। শিবেনের গাড়ি সেই দরজাহীন সিংহদরজার মধ্য দিয়ে ভেতরে ঢুকে চোরকাঁটায় ঢাকা মাঠের ওপর দাঁড়াল।

বাড়িটার চারদিকের জমিটা অপরিষ্কার হলেও মূল দরজার সামনেটা বেশ পরিচ্ছন্ন। চৌকো পাথর বসানো চত্বরটা যেন মাত্র কিছুক্ষণ আগেই কেউ পরিষ্কার করেছে।

দময়ন্তী ভুরু কুঁচকে চারদিকে তাকাল। স্বগতোক্তি করল, 'মনে হচ্ছে, চম্পালাল হীরালাল বাড়িটা বাসোপযোগী করতে শুরু করে দিয়েছেন।' বলে গাড়ি থেকে নেমে সাবধানে মাঠের ওপর দাঁড়াল।

সূর্য অনেকক্ষণই মধ্যগগন ছেড়ে পশ্চিমে পা বাড়িয়েছেন। বাড়িটার ছায়া দীর্ঘ হয়ে সামনের ফুটপাথের দিকে এগোচ্ছে। শিবেন সকলকে নিয়ে সেই ছায়ায় এসে দাঁড়াল।

পাড়াটা অসম্ভব নির্জন। অনেক দূরে শরৎ বোস রোডে ডবলডেকার বাসের শব্দ মাঝে মাঝে শোনা যায় বটে, কিন্তু মনে হয় সময় যেন এখানে ঊনবিংশ শতাব্দী পার হয়ে আর অগ্রসর হত পারেনি। একই জায়গায় থেকে থেকে কেমন স্যাঁৎসেঁতে হয়ে গেছে, পচন ধরেছে ভেতরে— একটু চেষ্টা করলেই তার দুর্গন্ধও যেন পাওয়া যায়। এই বিকেলবেলাতেই ছমছম করছে হাওয়া, আর পাঁচটা মড়িঘরের মতোই।

চারদিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে পকেট থেকে চাবি বের করল শিবেন। বলল, 'দেখি, তালা খোলে কিনা এই চাবিতে।'

দময়ন্তী বলল, 'ভয় নেই, ঠিক খুলবে।'

দরজা থেকে কিছুটা দূরে চত্বরের ওপরে তিনজন দাঁড়িয়ে পড়ল, শিবেন এগিয়ে গিয়ে লকের ফুটোয় চাবি গলাতে ঝুঁকে পড়ল সামনে। কিন্তু লকে চাবি লাগাতে পারল না। ওর হাতটা যতই দরজার দিকে এগোতে লাগল, দরজার পাল্লাটা নিঃশব্দে ততই পিছিয়ে যেতে লাগল। এবং সেই খোলা পাল্লার ভেতর ঝুঁকে থাকা শিবেনের চোখে পড়ল একজোড়া লোমশ জুতোবিহীন পা।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো সোজা হয়ে দাঁড়াল শিবেন। দরজার ফাঁকে একটি মানুষ— অবশ্য যদি তাকে মানুষ বলা যায়! বেঁটে, কিন্তু অসম্ভব পেশিবহুল চওড়া শরীর, মাংসল মুখ,

মাথায় শুয়োরের কুঁচির মতো খোঁচা খোঁচা চুল আর পরনে একটি খাকি হাফপ্যান্ট আর বটলগ্রিন রঙের হাতকাটা গেঞ্জি। মোটা মোটা ঠোঁট ফাঁক করে লোকটা দন্তবিকাশ করল — সেটা হাসি না দাঁত খিঁচানো ঠিক বোঝা গেল না। তবে তার এফেক্টটা হল ভয়ঙ্কর, আনন্দজনক কোনোমতেই নয়।

শিবেন সহজাত প্রবৃত্তিতে আক্রমণ আশঙ্কা করে একলাফে পিছিয়ে এসে দৃঢ়বদ্ধ মুষ্টিতে দাঁড়াল, ওর গলার শিরা ফুলে উঠেছে, দপদপ করছে উত্তেজনায়।

এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার আকস্মিকতায় পেছনের তিনজনের অবস্থা খুব উল্লসিত হবার মতো কিছু নয়। দময়ন্তী গলার মধ্যে সজোরে নিশ্বাস টানার শব্দ করে বিদ্যুৎবেগে সমরেশের প্রকাণ্ড পিঠের আড়ালে চলে গেছে আর রমলা সমরেশের একটা হাত জড়িয়ে ধরে ক্রমাগত 'ভূ...ভূ...ভূ...' করে চলেছে, 'ত' টা কখন আসবে তার ঠিক নেই। এ অবস্থায় সমরেশ অবশ্য প্রায় কদমতলায় কেষ্টঠাকুরটির মতোই শোভমান হয়েছে, কিন্তু রাসলীলার মধ্যিখানে হঠাৎ নন্দ ঘোষকে সদলবলে সেদিক আসতে দেখলে কেষ্ট ঠাকুরের যেমন মুখভঙ্গি হত, বিস্ফারিত চোখে সমরেশের মুখেও তেমনি বিস্ময় আর আতঙ্ক।

লোকটি বলল, 'রাম, রাম।'

ভূতের মুখে রাম নাম শুনে রমলা সমরেশের হাত ছেড়ে 'ভূ...ভূ...ভূ...' ছেড়ে 'তু... তু...তু...' করতে আরম্ভ করল। ওর অবশ্য করণীয় ছিল 'তুম কোন হ্যায়' জাতীয় কোনো প্রশ্ন, কিন্তু বুকের ধড়ফড়ানির ঠ্যালায় বক্তব্যটা গুছিয়ে রাখা যাচ্ছিল না।

প্রশ্নটা কমপ্লিট করল শিবেন। প্রথম বিস্ময়ের ধাক্কাটা কেটে যাওয়াতে ও এখন ক্রুদ্ধ।

লোকটা ভোজপুরি বাংলায় বলল, 'আমার নাম নাগেশ্বর সিং। হীরালালবাবু আমাকে ভেজিয়ে দিয়েছেন এখানে আপনাদের দেখভাল করবার জন্য। আপনারা ভেতরে এসে বসুন, আমি চা বানিয়ে ফেলেছি, এক্ষুনি লাগিয়ে দেব।' বলে বিনীত ভঙ্গিতে দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল।

ততক্ষণে সমরেশের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে দময়ন্তী। এবার সামনে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'হীরালালবাবু কি আসছেন?'

'আসতে পারেন। কোনো ঠিক নেই।'

'তুমি হীরালালবাবুর কাছে কী কাজ কর?'

'আমি ওঁর দারোয়ান। আর্মি থেকে ডিসচার্জ হয়ে ওঁর কাছে আছি। এ-বাড়িটা মেরামত হয়ে ঠিকঠাক হলে আমি এ-বাড়ির দারোয়ান হয়ে আসব, এরকম ঠিক আছে।'

বাড়ির বাইরেটা যেমন সাদামাঠা, ভেতরটা কিন্তু সেরকম নয়। দরজা দিয়ে ঢুকে প্রথমে একটা চওড়া প্যাসেজ, তার দুপাশে দুটো মস্ত বড়ো ঘর। ঘর দুটো তালাবন্ধ, কিন্তু কাচের দরজার ভেতর দিয়ে দেখা যায় তাদের দেওয়ালে নানা জটিল কারুকার্য।

চওড়া প্যাসেজটা গিয়ে শেষ হয়েছে বাড়ির ভেতরে একটা প্রশস্ত উঠোনে। শ্বেতপাথরে বাঁধানো উঠোনটা ঘিরে তিনদিকে বাড়িটার চওড়া বারান্দা, ওপরে সবুজ রং করা কাঠের ঝিলিমিলি আর নীচে কারুকার্য-করা ঢালাই লোহার রেলিং। বারান্দার গায়ে সার সার ঘর, সব কটাই তালাবন্ধ। কেবল পশ্চিম দিকে প্রায় বারো ফুট উঁচু পাঁচিল, তার মাঝখানে একটা চওড়া দরজা।

সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়ায়, পাঁচিলের ছায়া ভরে ফেলেছে উঠোনটা। তার মধ্যে একটা বেতের টেবিলের চারদিকে গোটা ছয়েক চেয়ার পাতা। নাগেশ্বর সিং তার অতিথিদের এনে বসাল সেখানে। বলল, 'আগে চা খেয়ে নিন, তারপর ঘুরে ফিরে দেখবেন।' বলে উত্তর দিকের বারান্দায় এককোণে গিয়ে উবু হয়ে বসল। রেলিং-এর ফাঁকে সেখানে একটা জনতা স্টোভ, কিছু অ্যালুমিনিয়ামের আর কাচের বাসনপত্র আর একটা গুটোনো বিছানা দেখা গেল।

রমলা গুটিশুটি হয়ে একটা চেয়ারে বসে বলল, 'কী দরকার বাপু চা খাবার? আমার একটুও ভালো লাগছে না। এই দময়ন্তী, চল চলে যাই।'

দময়ন্তী বলল, 'দাঁড়া না, যাবি 'খন। ভালো তো আমারও লাগছে না। কিন্তু কয়েকটা জিনিস জেনে যাওয়া দরকার মনে হচ্ছে।'

রমলা বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, চটপট সেরে নে সেগুলো। তারপর চল কেটে পড়ি।'

দময়ন্তী তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে একবার চারিদিক তাকাল, তারপর উচ্চকণ্ঠে বলল, 'নাগেশ্বর! আমরা আসবার আগে কি তুমি সারা বাড়ি পরিষ্কার করেছ নাকি?'

বারান্দার কোণ থেকে উত্তর এল, 'জি হাঁ। পরিষ্কার তো মাঝে মাঝেই করি। হীরালালবাবু মাঝে মাঝে বন্ধুবান্ধব নিয়ে আসেন, তখন পরিষ্কার করতেই হয়।'

রমলা প্রশ্ন করল, 'বন্ধুবান্ধব নিয়ে আসেন কেন?'

'খানাপিনা হয়, গানবাজনা হয়।'

সমরেশ বিরক্ত কণ্ঠে বলল, 'হুঁঃ! বন্ধুবান্ধব নিয়ে আসেন কেন? কোন আক্কেলে এরকম একটা প্রশ্ন করলে? বিয়ে তো কম দিন হয়নি, এখনও এরকম একটা অপাপবিদ্ধ ভঙ্গি করলে চলবে কেন?'

প্রত্যুত্তরে রমলা সমরশেকে একটা ভেংচি কেটে আবার বিমর্ষ মুখে চুপ করে বসে রইল।

'তুমি কি সব ঘরই পরিষ্কার কর?' দময়ন্তী আবার প্রশ্ন করল।

একটু নীরবতা, তারপর উত্তর এল, 'জি হাঁ। সারা বাড়িই করতে হয়। কার কখন কোন ঘরের দরকার হয়, বলা তো যায় না।'

রমলা নিম্নকণ্ঠে পুনরায় যোগ দিল, 'থাকে কী করে ঘরের মধ্যে? বাইরের দিকের জানলাগুলো তো কোনোদিন খোলা হয় বলে মনে হয় না।'

শিবেন বলল, 'অনাবশ্যক প্রশ্ন। এদিকের দরজার ওপরে দ্যাখো, প্রকাণ্ড স্কাইলাইট। সেটি খোলা থাকলে ঘরের মধ্যে হাওয়া চলাচলের কোনো অভাব হয় না। তা ছাড়া দরজার তলায় ফিকসড ল্যুভর লাগানো, কাজেই ঘরের হাওয়া কোনো সময়েই দূষিত হয়ে উঠতে পারে না।'

দময়ন্তী বলল, 'কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে পারছেন? আমাদের বাড়ির ভেতরে কোন সূত্র খুঁজে দেখতে যাওয়াটা সম্পূর্ণ বরবাদ হয়ে গেল। কিছুই পাওয়া যাবে না।'

শিবেন বলল, 'হুঁ, তাইতো মনে হচ্ছে। দাঁড়ান, আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে, সেটা চেক করে নি। আচ্ছা নাগেশ্বর, গত মাসে তুমি বা তোমার ভাই-বেরাদর কেউ কি ওপরের ওই ঘরটায় কিছুদিন ধরে একনাগাড়ে ছিলে?'

বারান্দার কোণে বাসনপত্র নাড়াচাড়া করার ঠংঠঙানি বন্ধ হয়ে গেল। দীর্ঘ নীরবতার পর দ্বিধাজড়িত ছোট্ট উত্তর এল, 'না, হুজুর।'

চারজনে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। দময়ন্তী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'নাগেশ্বর, তোমার জল ফুটতে তো দেরি আছে, আমরা ততক্ষণ বাড়ির বাইরেটা একবার ঘুরে দেখে আসি!'

নাগেশ্বর বলল, 'পাঁচ মিনিট দেরি করুন। জল এক্ষুনি ফুটে যাবে। আমি সঙ্গে না থাকলে, যদি কোনো বিপদ-আপদ হয় তো বাবু আমাকে শেষ করে ফেলবেন।'

রমলা জিজ্ঞেস করল, 'বিপদ-আপদ? কী বিপদ-আপদ, নাগেশ্বর?'

'চারদিকে ঝোপঝাড়, সাপউপ থাকতে পারে! তা ছাড়া, জানেন তো, এ বাড়িটার নানা বদনাম।'

'কোনো চিন্তা নেই তোমার, আমরা খুব সাবধানে থাকব।' বলে দময়ন্তী রওনা দিল। ওর পেছনে বিমর্ষ মুখে রমলা, তারপর বাকি দুজন।

৫

বাড়িটার চারদিকে একটা চক্কর মেরে ওরা এসে উত্তর দিকের দেওয়ালের নীচে দাঁড়াল। ওদের সামনে প্রায় তিরিশ ফুট চওড়া বড়ো বড়ো ঘাস আর কাঁটাঝোপে ঢাকা জমির পর আট ফুট উঁচু পাঁচিল আচার্য-বাড়ির সীমানা নির্দেশ করছে। পাঁচিল বরাবর কতগুলো রঙ্গন, কামিনী আর করবী ফুলের গাছ থাকায় পাঁচিলটা প্রায় চোখেই পড়ে না।

দময়ন্তী নীরবে শিবেনকে ওর সামনের জমিটা দেখাল। ঘাসের মধ্যে অস্পষ্ট সরু একটা পায়ে চলার পথ, দুটো ঝুপসি রঙ্গন গাছের তলা থেকে বেরিয়ে ঘুরে বাড়ির পেছন দিকে চলে গেছে।

শিবেন পথটা ভালো করে নিরীক্ষণ করে বলল, 'হুঁ, মনে হচ্ছে, ওখানে যেন একটা দরজা আছে। ওই রঙ্গন গাছদুটোর আড়ালে ঢাকা পড়েছে।'

দময়ন্তী বলল, 'হ্যাঁ, এবং আরও মনে হচ্ছে, পথটায় লোক চলাচল থাকলেও খুব বেশি ব্যবহৃত হয় না বা সম্প্রতি হতে আরম্ভ করেছে। অর্থাৎ এই দুই বাড়ির মধ্যে যাতায়াত আছে। কবে থেকে?'

শিবেন বলল, 'হীরালাল বাড়িটা কিনেছেন বছরখানেক হল। এমন তো হতে পারে যে, তার আগে বাড়িটা যখন পরিত্যক্ত ছিল, তখন হয়তো কেউ আসত।'

'তা হতে পারে।' দময়ন্তী বলল, 'তবে পথটা এখনও ব্যবহার হয়। যাকগে, চলুন, দরজাটা দেখ আসি।'

'নীরবে ওরা পাঁচিলটার দিকে এগোল। রঙ্গন গাছদুটোর চার-পাঁচ গজের মধ্যে আসতেই হঠাৎ ঘটাং করে একটা লোহার দরজা বন্ধ হবার শব্দ হল এবং তারপরেই একটা হুড়কো লাগানোর আওয়াজ।

শিবেন দ্বিরুক্তি না করে একলাফে এগিয়ে গিয়ে মাথা নীচু করে গাছ-দুটোর পেছনে অদৃশ্য হয়ে গেল। বাকি কজন দ্রুতপায়ে এগিয়ে এল।

গাছ-দুটোর ডালপালার মধ্য দিয়ে একটা শুঁড়িপথের মতো, মাথা খাড়া করে চলা যায় না। পথের শেষে পলেস্তারা বিহীন পাঁচিলের গায়ে একটা লাল রঙের লোহার ছোটো দরজা। এদিকটায় কোনো হুড়কো লাগানোর ব্যবস্থা নেই। দরজাটা বহু পুরোনো, কিন্তু রংটা সাম্প্রতিক।

শিবেন কোমরে দু-হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখেশুনে বলল, 'যা দেখলেন আর যা শুনলেন, তাতে কী বুঝলেন বৌদি?'

দময়ন্তী হেসে বলল, 'আর যা শুঁকলুম, তার কথা জিজ্ঞেস করবেন না?'

সমরেশ বলল, 'ঠিক, ঠিক! একটা খুব মৃদু সুগন্ধ। পাচ্ছিস না তুই?'

এক বুক নিশ্বাস টেনে শিবেন বলল, 'হুঁ পাচ্ছি। কীসের গন্ধ?'

দময়ন্তী বলল, 'ল্যাভেন্ডার। ও কথা থাক, কীসের গন্ধ তা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। ও আমাদের লাইন। এখন বলুন, কী বুঝলেন।'

শিবেন বলল, 'চলুন বাড়ির ভেতরে যাওয়া যাক। তারপরে আলোচনা করা যাবে।'

৬

সমরেশ বলল, 'একজন মহিলা আসছিলেন, আমাদের দেখে পালালেন। এটুকু ঠিক আছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, তিনি কার কাছে আসছিলেন? নাগেশ্বরের কাছে? ল্যাভেন্ডার মেখে নাগেশ্বরের কাছে? ব্যাপারটা বাড়াবাড়ি নয়?'

'মোটেই না', শিবেন বলল, 'আজকাল ফুটপাথে সেন্ট বিক্রি হয়। এমন কিছু দাম নয়। পদমবাহাদুরের বৌ হয়তো আসছিল একটু চিনি নিতে।'

দময়ন্তী মাথা নেড়ে বলল, 'তাহলে আমাদের দেখে পালাবে কেন? দ্বিতীয়ত, সেন্টটা ফুটপাতের সস্তা সেন্ট নয়— অত্যন্ত দামি। আমার কথায় আস্থা রাখতে পারেন, কারণ বললুম যে ওটা আমাদের লাইন।'

শিবেন বলল, 'বেশ, তা না হয় রাখলুম। এখন ভদ্রমহিলা কে বলে আপনার মনে হয়?'

'পদমবাহাদুরের বৌ হতেও পারে, সে হয়তো মিসেস আচার্যর সেন্ট গোপনে মেখে থাকে। মিসেস আচার্য হতে পারেন, অন্য কোনো মহিলাও হতে পারেন। সেটা ও-বাড়িতে ঢুকতে না পারলে বোধহয় সঠিক জানা যাবে না।'

শিবেন বলল, সে আশার গুড়ে তো বালি। যাক, চা খাওয়া তাড়াতাড়ি সারুন, তারপর চলুন যাওয়া যাক। ওপরের ঘরগুলো যখন দেখলেনই না, তখন খামোখা এখানে সময় নষ্ট করে লাভ কী? অরবিন্দ আচার্যের চোর ধনে-পুত্রে লক্ষীলাভ করুক আর নরকে যাক, আমরা আর তা নিয়ে মাথা ঘামাই কেন? তার চেয়ে লাইটহাউসের সিনেমাটা অনেক জরুরি।'

সমরেশ চায়ের কাপে প্রকাণ্ড একটা চুমুক লাগিয়ে বলল, 'ঠিক, ঠিক, তবে আমার একটা প্রশ্নের জবাব চাই। তুমি কি মনে কর যে, নাগেশ্বরই অরবিন্দদার ওপরে নজর রেখেছিল? আর আজ ও-বাড়ি থেকে এ-বাড়িতে একজনের গমনাগমনের যে চিহ্ন দেখতে পেলুম, তার সঙ্গে ওই নজর রাখার কি কোনো যোগসূত্র আছে?'

শিবেন বলল, 'বাঃ, বাঃ।' ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারের মুখে একেবারে অপরাধবিজ্ঞানীর ভায়রাভাইয়ের মতো কথাবার্তা শুনছি যে! ব্যাপারটা কী?'

সমরেশ দাঁত খিঁচিয়ে কী যেন একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু ওর কথায় বাধা পড়ল। সদর দরজার কাছে একটা বিনীত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'এই যে, আপনারা এসে গেছেন? আমি অত্যন্ত দুঃখিত, আমার একটু দেরি হয়ে গেল।'

সবাই একসঙ্গে ঘাড় ফিরিয়ে বক্তার দিকে তাকাল। তাঁর মুখটা প্রথমে দেখা গেল না, কারণ তাঁর পেছনে প্রকাণ্ড দরজাটার বাইরে পৃথিবী সূর্যাস্তের আভায় লাল হয়ে রয়েছে আর সেই রক্তাভ পশ্চাদপটে তাঁকে দেখাচ্ছে একটা দীর্ঘাকৃতি কালো ছায়ার মতো।

রমলা বিড়বিড় করে বলল, 'একদিনে একটা মানুষ কত সইতে পারে?'

ভদ্রলোক যখন প্যাসেজ পার হয়ে উঠোনে এসে দাঁড়ালেন, তখন তাঁকে স্পষ্ট দেখা গেল। দীর্ঘদেহ, গৌরকান্তি, চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা, পরনে সাদা চকচকে কোনো অত্যন্ত দামি কাপড়ের বেলবটম ট্রাউজার্স আর ঊর্ধ্বাঙ্গে— গোলাপি আর নীল রঙের ফুলকাটা হাওয়াই শার্ট। বয়েস চল্লিশ কী তার বেশিই হবে, তবে সেটা চাপা দেবার আপ্রাণ প্রয়াসটা চোখে পড়ে।

শিবেন তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আসুন, আসুন, হীরালালবাবু। আপনার আবার দেরি কী? আপনি তো আসবেন বলেননি?'

খুব নাটকীয় ভঙ্গিতে বুকের ওপর দু হাত জোড় করে অতিথিদের কাছে এগিয়ে এলেন হীরালাল। বললেন, 'বলার তো দরকার করে না। বাড়িতে অতিথি আসছেন আর আমি আসব না, এ কি হয়? কি বলেন?' বলে সহাস্যে রমলার দিকে তাকালেন।

রমলা অবাক হয়ে ভদ্রলোককে পর্যবেক্ষণ করছিল। চমকে উঠে হেঁ হেঁ করে হাসল।

দময়ন্তী বলল, 'আপনি তো ভারি চমৎকার বাংলা বলেন!'

হীরালাল হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, 'বলেন কী? আমি তো বাঙালিই। আমরা তিনপুরুষ কলকাতার লোক। সিনিয়ার কেমব্রিজ পরীক্ষায় বাংলা আমার একটা সাবজেক্ট ছিল, ভালো নম্বর পেয়েছিলুম। সে-কথা থাক। শিবেনবাবু, আপনার বন্ধুদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবেন না?'

শিবেনের মুখে বিদ্যুতের মতো একটা দুষ্টুমির হাসি ফুটেই মিলিয়ে গেল। গম্ভীর গলা করে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই যে মিস্টার সমরেশ দত্তগুপ্ত, ইনিই প্রযোজক। ইনি মিসেস দত্তগুপ্ত। আর ইনি? ইনি হচ্ছেন এঁর নায়িকা। এঁর নামটা যেন কী দিয়েছ, সমরেশ?' বলে ঝপ করে সমরেশকে চোখ মারল।

সমরেশের মুখের একটা রেখারও পরিবর্তন হল না। তৎক্ষণাৎ বলল, 'ঠিক মনে পড়ছে না, বোধ হয় আম্রপালী-টালি গোছের কিছু হবে। তাই না, নেত্যকালী?' বলে অর্ধ্ব-নীমিলিত চোখে রমলার দিকে তাকাল।

রমলা প্রথমে বিস্মিত, তারপর বিব্রত, তারপর স্তম্ভিত, তারপর ক্রুদ্ধ, তারপর আরও ক্রুদ্ধ হয়ে অগ্নিগর্ভ আগ্নেয়গিরির মতো মুখ করে বসে রইল। কোনো জবাবই দিল না।

হীরালাল রমলার মুখের দিকে তাকিয়ে বোদ্ধার হাসি হাসলেন। বললেন, 'আপনার আগের নামটি বলে ফেলেছেন উনি, তাতে আপনি কিছু মনে করবেন না। নৃত্যকালী নামটা তো কিছু খারাপ নয়। তবে আম্রপালী নামটি আপনাকে এত চমৎকার মানিয়েছে যে তা বলার নয়। আপনার প্রথম বই বুঝি?'

রমলা জ্বলন্ত দৃষ্টিতে একবার দুই বন্ধুর দিকে তাকাল, কোনো জবাব দিল না। এটা যদি সত্য বা ত্রেতা যুগ হত, তাহলে দুই বন্ধু এতক্ষণে দুটো ছাইয়ের গাদায় পরিণত হত, সন্দেহ নেই।

সমরেশ বলল, 'ওর মুখ দেখে বুঝছেন না যে এটা ওর প্রথম বই? মুখ দিয়ে কথাটি বেরোচ্ছে না, এমন লাজুক মেয়ে।'

'তা তো বটেই, তা তো বটেই। তা বাড়িটা দেখেছেন, সমরেশবাবু? পছন্দ হয়েছে?'

সমরেশ একটু চিন্তা করে বলল, 'দেখুন, বাড়িটা অতি চমৎকার, তবে আমি যেরকম চাইছিলুম, এটা ঠিক সেরকম নয়— মানে ঘরগুলোর কনফিগারেশন আমার স্ক্রিপ্টের সঙ্গে মেলে না। তবে তাতে অবশ্য বড় যায় আসে না। যদি অন্য বাড়ি না পাই তো আমার স্ক্রিপ্টটাই একটু পালটে নেব না হয়।'

সমরেশের কথা শুনে শিবেন আর দময়ন্তী চমৎকৃত। হীরালাল বললেন, 'ঠিক কীরকম বাড়ি আপনার চাই বলুন, আমার সন্ধানে যদি থাকে তো জানাতে পারি।'

হাত নেড়ে সমরেশ বলল, 'না, না, সে আমরা ঠিক খুঁজে বের করে নেব। শিবেন যখন আছে, তখন ও অনেক খোঁজ দিতে পারবে। পুলিশ তো! তবে আমি আপনার কাছে অন্য একটা সংবাদ চাই। আপনার 'এবার অবগুণ্ঠন খোল' ছবিটায় যিনি সহনায়িকা ছিলেন, তাঁর সম্বন্ধে আর কী! আমার একজন ওই রকম সহনায়িকা দরকার।' বলে পুনরায় অর্ধ্বনিমীলিত চোখে রমলার দিকে তাকাল।

হাস্যবিগলিত হীরালালের মুখটা হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠল। হিমশীতল কণ্ঠে বললেন, 'কে? বকুল? কেন, তার সম্বন্ধে আপনারা জানেন না কিছু? অন্তত শিবেনবাবুর তো জানা উচিত।'

প্রত্যেকে কান খাড়া করে উঠে বসল। শিবেন সাবধানে বলল,'কই, আমি তো জানি না কিছু!'

হীরালাল একবার সকলের মুখের দিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকালেন, তারপর তাচ্ছিল্যভরে বললেন, 'তেমন কিছু নয়। শি ওয়াজ মার্ডার্ড।'

দময়ন্তী আঁতকে উঠে বলল, 'মার্ডার্ড! বলেন কী?'

'হ্যাঁ, বছরখানেক আগে পাঞ্জাব এক্সপ্রেসের একটা ফার্স্ট ক্লাস কুপের মধ্যে দুটো ট্রাঙ্কের মধ্যে ওকে পাওয়া যায়।'

শিবেন তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে হীরালালের কথা শুনছিল, বলল, 'হ্যাঁ, মনে পড়েছে। বকুল সাঁতরা, হাওড়ায় বাড়ি ছিল। সে-ই আপনার ছবিতে সহনায়িকা ছিল?'

ওপরে নীচে মাথা নাড়ল হীরালাল। বললেন, 'হ্যাঁ, খুন হয়ে গেল, নইলে ওকে দিয়ে অনেক কাজ হত আমার।'

'খুন হল কেন? স্বভাবচরিত্র ভালো ছিল না বুঝি?' খুব ভালোমানুষের মতো জিজ্ঞেস করল সমরেশ।

'স্বভাবচরিত্র?' বলে হীরালাল বোধ হয় অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিদ্রুপমিশ্রিত একটা তিক্ত হাসি হাসলেন। বোঝা গেল, অনেক ঘাটের জল খাওয়া হীরালালের অন্তত মেয়েদের এই দুটি সদগুণের ওপর একদমই আস্থা নেই। 'স্বভাবচরিত্র ভালো না হলে খুন হবে কেন? তা নয়। আসলে কেন যে খুন হয়েছিল তা কেউই জানে না। পুলিশ চেষ্টা করছে, দেখা যাক ভেতরের খবর বের করতে পারে কি না। তবে মেয়েটার একটা দোষ ছিল। লোভ বড্ড বেশি ছিল। আর সেই জন্যেই বোধহয় দুটো ট্রাঙ্কের মধ্যে সমাপ্তিটা হল!'

হীরালাল তাঁর শেষ কথাটা ঠিক কী উদ্দেশ্যে বললেন বোঝা গেল না। যদি রসিকতার সঙ্গে বলে থাকেন, তার ফলটা অন্য রকমই হল। কেউ হাসল না, রমলা দু হাতে মুখ ঢাকল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হীরালাল আপন মনে হেসে উঠলেন। বললেন, আমি একটা গাধা। অতিথিদের এমন সব অপ্রীতিকর কথা শোনাচ্ছি, যা কক্ষনো কাউকে শোনানো উচিত নয়। আসুন প্লিজ আম্রপালী, আমরা অন্য আলোচনা করি। এই তো আপনার প্রথম বই? ভয় ভয় করছে নিশ্চয়ই। কিচ্ছু ভয় পাবেন না। নায়ক যদি অভিজ্ঞ আর ওস্তাদ হন তো তিনিই সব কায়দা করে ঠিক করে দেবেন। আপনার নায়ক কে, মিস আম্রপালী?'

মিস আম্রপালী আঙুল তুলে শিবেনকে দেখিয়ে দিল।

'মিস্টার সেন! বলেন কী?' অট্টহাসি হেসে উঠলেন হীরালাল : 'পুলিশের কাজ করতে করতে একেবারে নায়ক? তারপর শেষ জীবনে আত্মজীবনী লিখবেন, 'যখন ডিটেকটিভ ছিলুম'— অ্যাঁ? তা পরিচালক কে হচ্ছেন?'

মিস আম্রপালীর নীরব আঙুল এবার দেখাল দময়ন্তীকে।

তৎক্ষণাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন হীরালাল : 'আপনি পরিচালক? বাঃ, বাঃ, বাঃ! তবে তো বই দারুণ জমবে। ভয়ানক জটিল একটা রহস্য থাকবে নিশ্চয়ই, মিসেস দত্তগুপ্ত?'

'তার মানে?' তিনজনে প্রায় একসঙ্গে প্রশ্ন করল।

'তার মানে রহস্যসন্ধানী মিসেস দময়ন্তী দত্তগুপ্ত যার পরিচালক, তাঁর স্বামী প্রযোজক, ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের মিস্টার শিবেন সেন সস্ত্রীক যার নায়ক-নায়িকা, সেই ছবিতে জটিল রহস্য থাকবে না তো কি আমার ছবিতে থাকবে? সেই কথাই বলছিলুম আর কী!'

বলতে বলতে আবার সশব্দে হেসে উঠলেন হীরালাল। বাকি চারজন স্তম্ভিত, কিন্তু আগে থেকে মহড়া দেওয়া না থাকলেও প্রায় তৎক্ষণাৎ একসঙ্গে দুই বন্ধু সেই অট্টহাসিতে যোগ দিল। তা না হলে কেলেঙ্কারি হয়ে যেত।

৭

রমলা বলল, 'উঃ, কী ভীষণ ঘোড়েল লোকটা। কেমন কায়দা করে বুঝিয়ে দিল যে তোকে ও আগাগোড়াই চিনত!'

চিন্তিত মুখে দময়ন্তী বলল, 'হুঁ। কিন্তু লোকটা অভিনয় করল, না শিবেনবাবুর কথাটা সত্যি বিশ্বাস করেছে, বুঝতে পারলুম না তো। যদি বিশ্বাস করে না থাকে, তাহলে এই চালটার উদ্দেশ্য কী? আমার বাপু ভালো ঠেকছে না। প্রথমে ওই ল্যাভেন্ডারের গন্ধ আর তারপর বকুল সাঁতরার কথা, সবমিলিয়ে কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছে। এই সমরেশ, কী তোমার বন্ধু ওখানে ওই লোকটার সঙ্গে বকর বকর করছে? হাত নেড়ে ডাকো তো ওকে, বল চলে আসতে।'

সমরেশ গাড়ির বনেটে হেলান দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। বলল, 'দিব্যি জুত করে ভেতরে বসে আছ, ঝামেলা করছ কেন? শিবেন ঠিকই আসবে। বেকার সময় নষ্ট ও করে না।'

সূর্য কিছুক্ষণ হল অস্ত গেছে। বাড়ির পেছনে পশ্চিম আকাশে ঘন নীল আর বেগুনি রঙের আলো-আঁধারে অন্ধকার নেমে আসছে। বাড়ির ভেতরে নাগেশ্বর হয়তো কোনো আলো জ্বালিয়েছে, কিন্তু বাইরে তার চিহ্ন মাত্র নেই। আবছা অন্ধকার প্রবেশপথের সামনে শিবেন আর হীরালালের ছায়ামূর্তি দুটো গুজুর গুজুর করে কথা কইছে।

একটু বাদে ওদের পরস্পরকে নমস্কার করতে দেখা গেল, তারপর শিবেন একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে গাড়ির কাছে এগিয়ে এল। হীরালাল কিন্তু এলেন না, স্বস্থানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। ভাবখানা এমন যে অতিথিরা বিদায় নিলেই অ্যাবাউট টার্ন করে বাড়ির ভেতর ঢুকে যাবেন।

সামনের সিটে উঠে বসল দুই বন্ধু। সমরেশ জিজ্ঞেস করল, 'কী এত রহ্যসালাপ হচ্ছিল?'

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে শিবেন বলল, 'তেমন কিছু নয়। আমাকে একটু তৈল মর্দন করছিল আর কী। বাবুর বেশ কয়েক লক্ষ টাকার মাল এক্সসাইজ আর কাস্টমস ধরেছে। এখন কাকে ধরাধরি করতে হবে, সে-বিষয়ে খোঁজখবর হচ্ছিল। আমিও একটু বাজিয়ে নিলুম। তবে বাবু গভীর জলের মাছ, ওপরে উঠতে সময় নেবেন।'

'গভীর জলের মাছ কীরকম?'

'স্মাগলার, আবার কি!' বলতে বলতে শিবেন সাবধানে গাড়িটা গেটের বাইরে বের করল।

গাড়িটা তখনও ফুটপাথ থেকে রাস্তায় নামেনি, হঠাৎ পেছনের সিট থেকে দময়ন্তী চিৎকার করে উঠল, 'শিবেনবাবু, দেখুন—দেখুন, ওই গাড়িটা কার?'

আঁতকে উঠে ঘচাং করে ব্রেক কষে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে ফেলল শিবেন। কার্বের ধারে পার্ক করা সাদা রঙের ফিয়াটটা এক নজর দেখে বলল, 'ওটাই তো হীরালালের গাড়ি। কী এমন বৈশিষ্ট্য দেখলেন গাড়িটায় যে এমন উত্তেজিত হয়ে পড়লেন?'

'না, তেমন কিছু নয়', দময়ন্তী পেছনের সিটে হেলান দিয়ে বসে পড়ল : 'গাড়িটার রংটা দেখেছেন?'

'দেখেছি। এতে হয়েছে কী?'

'কিছু নয়, দুটো রহস্যের সমাধান হয়ে গেল।' কিছুটা আত্মগতভাবে বলল দময়ন্তী।

'রহস্যের সমাধান হয়ে গেল!' সমরেশ অবাক, 'অরবিন্দদার চোর ধরে ফেলেছ? হীরালালবাবু নাকি?'

'না, না, চোর নয়। অন্য রহস্য, সামান্য ব্যাপার।'

ইতিমধ্যে গাড়ির স্টার্ট বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। চিন্তিত মুখে শিবেন আবার চাবি ঘুরোতে যাবে, সমরেশ বাধা দিয়ে বলল, 'দাঁড়া, ওই বুড়িকে দেখে মনে হচ্ছে আমাদের সঙ্গে ওর কোনো প্রয়োজন আছে?'

আচার্যবাড়ির দিক থেকে একজন বৃদ্ধাকে যথাসম্ভব দ্রুতবেগে ওদের দিকে আসতে দেখা গেল বটে। 'আপনাদের বাবু একবার ডাকতিছেন।' গাড়ির জানলা ধরে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল বুড়ি।

'কে বাবু?' সমরেশের প্রশ্ন।

'আমাদের আচার্যিবাবু। ওই জানলা দিয়ে আপনাদের দেখলেন কিনা।'

'তুমি কে?'

'আমি পঞ্চাননের মা।'

'পঞ্চা কোথায়?'

‘পাইলে গেছে।’

৮

মাটি থেকে দোতলার ছাদ পর্যন্ত লম্বা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড একসারি থামের পর শ্বেতপাথরের বাঁধানো সিঁড়ি। তারপর প্রকাণ্ড দরজা। দরজার ওপর একপাশে কাঠের ফলকের ওপর সাদা রং দিয়ে লেখা, ‘হিমালয়ান টি কনসার্ন— গোডাউন।’ দরজার পর চওড়া লম্বা প্যাসেজ বাড়ির একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত চলে গেছে। ঢুকেই ডান দিকে সিঁড়ি, বেশ প্রকাণ্ড, শ্বেতপাথরে বাঁধানো। একতলার সব কটা ঘরই এখন তালাবন্ধ। গোডাউন বন্ধ, তবে তাদের ভেতর থেকে চা-পাতার তীব্র গন্ধ ভেসে আসছে।

সিঁড়ির মুখে একজন চন্দ্রবদন নেপালী খাকি হাফপ্যান্ট আর হাত কাটা জালিদার গেঞ্জি গায়ে টুলের ওপর বসে ছিল। শিবেনকে সদলবলে ঢুকতে দেখে সপ্রশ্ন মুখে উঠে দাঁড়াল।

পঞ্চার মা বলল, ‘এঁদের ছেড়ে দাও গো। বাবু ডেইকেচেন।’

নেপালি সরে দাঁড়াল বটে, কিন্তু মুখের প্রশ্ন গেল না। শিবেন জিজ্ঞেস করল, ‘তোমার নাম পদমবাহাদুর?’

‘জি।’

‘পঞ্চা কোথায় গেছে তুমি জান?’

‘জি না।’ যেমন সোজা প্রশ্ন তেমনি সোজা উত্তর।

‘আচ্ছা, শোনো, তুমি এখানেই থাকো, বুঝেছ? আমি পুলিশের লোক, তোমাকে দরকার হতে পারে।’

পদমবাহাদুর ভাবলেশহীন চোখে শিবেনের ধুতি-পাঞ্জাবি পর্যবেক্ষণ করল, পুলিশের কথাটা তেমন বিশ্বাস করল বলে মনে হল না।

দময়ন্তী বলল, ‘চলুন শিবেনবাবু, ওপরে যাওয়া যাক।’

সিঁড়িটা ঘুরে দোতলায় উঠে একতলার মতোই একটা চওড়া প্যাসেজে গিয়ে পড়েছে। তার সামনেই একটা সমচতুষ্কোণ বারান্দা রঙিন কাচের জানলা দিয়ে ঢাকা। সেখানে একটা রট আয়রনের টেবিল আর গুটি কয়েক চেয়ার। তারপর প্যাসেজের দুধারে সারি সারি দরজা। কিন্তু বাঁ দিকের আর ডান দিকের দরজাগুলোর মধ্যে একটা ব্যতিক্রম সহজেই চোখে পড়ে। ডান দিকের দরজাগুলোর বাইরে বড় বড় রঙিন প্রিন্টের সুদৃশ্য পর্দা আর বাঁ দিকেরগুলোর কোনো পর্দা-টর্দার বালাই নেই। ডান দিকের সব কটা দরজাই বন্ধ আর বাঁ-দিকের সব কটাই খোলা।

একতলার চা-পাতার গন্ধ দোতলার সিঁড়ির গোড়া পর্যন্ত ধাওয়া করে এল, কিন্তু তারপরেই ডান দিকের প্রথম দরজাটার কাছে আসতেই আবার সেই ল্যাভেন্ডারের মৃদু স্নিগ্ধ সুবাস পাওয়া গেল। সেই গন্ধে সকলেরই গতি একটু শ্লথ হয়ে পড়ল। পর্দাটা থিরথির করে কাঁপছিল, সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে সকলে একবার সেদিকে তাকাল। তারপর এগিয়ে গেল।

বাঁ দিকের প্রথম ঘরটায় একটা বেতের চেয়ারে অসহায় বিষণ্ণ মুখে বসে ছিলেন অরবিন্দ আচার্য। ওদের দেখে একবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন, তারপর হাত নেড়ে সামনের বেতের চেয়ার ক-টা দেখিয়ে বললেন, ‘বসুন।’

দময়ন্তী চট করে ঘরের ভেতরটা দেখে নিল। বিরাট ঘর। দক্ষিণ দিকে মেঝে থেকে প্রায় ছাদ পর্যন্ত উঁচু বিশাল বিশাল তিনটে জানলা, তাদের ভেতর দিয়ে পাশের বাড়ির একটা পাশ ও সামনের প্রাঙ্গণটা দেখা যায়। জানলা তিনটের মেঝে থেকে তিন ফুট গরাদ দেওয়া, তার ওপরটা ফাঁকা। ওই পথেই তাহলে চোর এসেছিল। জানলাগুলোর সামনে আড়াআড়িভাবে একটা নীচু খাট পাতা, পাশে সেই গোলাপি মার্বেলের টেবিল, খাটের পেছনে জলের কুঁজো। পুব দিকের দেওয়ালে দেওয়াল আলমারি, তার কাচের পাল্লার ভেতরে অসংখ্য কাপ, মেডেল অযত্নে পড়ে পড়ে মরচে ধরছে। পশ্চিমের দেওয়ালেও অনুরূপ আলমারি, তবে তার পাল্লাটা কাঠের, ভেতরে কী আছে দেখা যায় না। এছাড়া, ঘরে ছ-সাতটা বেতের চেয়ার, অন্য আসবাবপত্র কিছু নেই, এমনকী একটা আয়নাও নেই। স্পষ্টত, এ-ঘরে কোনো মেয়েলি হাতের স্পর্শ পড়ে না।

অরবিন্দ দময়ন্তীর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিটা লক্ষ করলেন। বললেন, 'কী দেখছ? এই হল গে আমার সেলুলার জেল।' বলে হাসির একটা ব্যর্থ চেষ্টা করলেন। 'যাক সে কথা। আপনিই বোধ হয় মিস্টার শিবেন সেন? নমস্কার। আর ইনি আপনার স্ত্রী?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'বেশ, বেশ। তা তোমাদের কেন ডেকে এনেছি জান না বোধহয়?'

'শুনলুম, পঞ্চা নাকি পালিয়ে গেছে?' সমরেশ জিজ্ঞেস করল।

গলা নীচু করে অরবিন্দ বললেন, 'পালায়নি, কিডন্যাপড।' শেষ শব্দটি ইংরিজিতে বললেন বোধহয় এই জন্য যাতে পঞ্চার মা বুঝতে না পারে। তবে, পঞ্চার মা ঘরের এক কোণে বসে ঢুলছিল, কোনো কথা তার কানে ঢুকছিল বলে মনে হল না।

সকলের বিস্মিত মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে অরবিন্দ আবার বললেন, 'পঞ্চার অদৃশ্য হওয়াটা একটা পুরোনো ঘটনার অংশমাত্র। আসলে, আমার গলার চারদিকে ফাঁসটা বেশ টাইট হয়ে বসছে, এবার শেষ টানটা পড়লেই হয়।'

শিবেন বলল, 'আপনি যে সন্দেহ করছেন আপনার কেউ ক্ষতি করবার চেষ্টা করছে, সেটা কীরকম ক্ষতি?'

ম্লান হেসে অরবিন্দ বললেন, 'আমার মতো অসহায় মানুষের একটি মাত্র ক্ষতিই করা যেতে পারে, শিবেনবাবু।'

দময়ন্তী বলল, 'দেখুন, এরকম ভাসা ভাসা উত্তর-প্রত্যুত্তরে কেবল সময় নষ্টই হবে। যদি আপনার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র চলছে বলে আপনার সন্দেহ তাকে ভাঙতে চান, তাহলে আমার কয়েকটি প্রশ্নের আপনাকে স্পষ্ট জবাব দিতে হবে। সেসব প্রশ্নের সবগুলো আপনার মনঃপূত হবে না। হয়তো অনেকগুলোই আপনাকে বিব্রত করবে। কিন্তু ...'

বাধা দিয়ে অরবিন্দ বললেন, 'তুমি প্রশ্ন কর মা, আমি যথাসাধ্য উত্তর দেব। নিরন্তর এই সংশয় আর আতঙ্ক আমার আর সহ্য হচ্ছে না। প্রথম যখন বুঝতে পারি আমার জীবন সংকট, ভেবেছিলুম বাধা দেব না। আমার কেই বা আছে? আমার এ জীবন রাখাও যা, না রাখাও তাই। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, শহিদ হবার মতো মনের জোর আমার নেই। যতবার ওই বাইরের পৃথিবীটার দিকে তাকাই, মনে হয় পঙ্গু হলেও এ জীবন মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি। আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কারোর অধিকার নেই সেই মহামন্ত্রের উপলব্ধি থেকে আমাকে বঞ্চিত করে। মশাও তো তার অন্ধকার সঙ্ঘরামে জেগে বসে জীবনের স্রোত ভালোবাসে, গলিত স্থবির ব্যাঙ আর দুই মুহূর্ত ভিক্ষে চায়। যাকগে, শোন এবার

পঞ্চাননের অন্তর্ধান কাহিনী। অ পঞ্চাননের মা, এখানে বসে ঘুমিয়ো না তো বাছা, নিজের ঘরে যাও। দরকার হলে বেল বাজাব, শুনতে যদি পাও তো এস।'

অরবিন্দের কথা বলার ঢঙটি নাটকীয়, যেন পার্ট মুখস্থ বলছেন। এককালে যে ইনি সাহিত্যসভায় অবধারিত মধ্যমণি হতেন, অনায়াসে তা এখনও বোঝা যায়। এ প্রতিভা জন্মগত, কোনোদিন যাবার নয়।

তন্দ্রাজড়িত পায়ে পঞ্চাননের মা গৃহান্তরে গেলে, যেন একটা গোপন রহস্য বলছেন এমনভাবে অরবিন্দ বললেন, 'আফিমের মৌতাত। সন্ধে হয়েছে তো। যাক, শোন এবার বলি।'

কিন্তু বলা হল না। ঘরের বাইরে বারান্দায় দুজোড়া পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। দুটোই ভারী এবং দ্রুত। একটু পরেই দরজা ঠেলে পদশব্দের অধিকারী দুজন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন কিংবা আবির্ভূত হলেনও বলা চলে। আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঘর ল্যাভেন্ডারের গন্ধে ম-ম করে উঠল।

প্রথমজন মহিলা। বয়স চল্লিশের ওপর, কিন্তু লম্বা চওড়া আঁটসাঁট গড়ন। চওড়া কবজি, চওড়া কাঁধ— অনেকটা মেমসাহেবের মতো। পরনে দগদগে লাল সিল্কের শাড়ি আর স্লিভলেস সাদা ব্লাউজ। ব্লাউজের যে অংশটুকু কাঁধের ওপর ন্যস্ত রয়েছে তার মধ্যে থেকে বেরিয়েছে থামের মতো হাত। গায়ের রং অত্যন্ত ফর্সা, কিন্তু কেমন যেন ফ্যাকাশে সাদা। মুখের প্রতিটি রেখা নিখুঁত, টিকালো নাক, স্পষ্টা পাতলা ঠোঁট, বিশাল চোখ, কিন্তু সবমিলিয়েও ভদ্রমহিলাকে সুন্দরী বলা যায় না। যৌবনে কীরকমটি ছিলেন বলা সম্ভব নয়, কিন্তু বর্তমানে ও মুখে লাবণ্যের ছিটেফোঁটাও নেই। সমস্ত মুখে একটা উদ্ধত, অহঙ্কৃত বিরক্তি, যেন সকলকে ধমকাতে আর আদেশ করতেই তিনি ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন।

দ্বিতীয়জন পুরুষ। ওঁর সঙ্গিনীটি ঘরে ঢুকেই সকলের মনে যে ভয়মিশ্রিত সম্ভ্রম জাগিয়ে তুলেছিলেন, সেটি হালকা করবার জন্যই যেন তিনি একগাল স্নিগ্ধ হাসি নিয়ে এগিয়ে এলেন। প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স হবে ভদ্রলোকের, কিন্তু শরীরে একবিন্দু অতিরিক্ত মেদ নেই। পেশিবহুল দীর্ঘ দেহ, গৌরবর্ণ, মাথায় কাঁচাপাকা চুল। চোখ দুটি চঞ্চল, সরস। ওঁর সঙ্গিনীটির একমাত্র বিকীরিত মাধুর্য যেখানে ল্যাভেন্ডার সেন্টের গন্ধ, সেখানে ভদ্রলোকের সর্বাঙ্গ দিয়েই যেন স্নিগ্ধ সরসতা ঝরে পড়ছে।

ভদ্রলোক ঘরের বাইরে থেকেই বলতে বলতে ঢুকছিলেন, 'কী হে আচার্যবংশাবতংশ, তোমার খাস চাকরের খোঁজ খবর কিছু পাওয়া গেল?' ঘরে ঢুকে চারজন নবাগতকে দেখে বিব্রত হয়ে চুপ করে গেলেন।

ভদ্রমহিলা ইতিমধ্যে নিজেকে খাটের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে জিজ্ঞাসু নেত্রে একবার অরবিন্দ আর একবার অতিথিদের দিকে তাকাচ্ছিলেন।

অরবিন্দ বললেন, 'না, মশায়, পাওয়া আর গেল কই? আর তাই তো এঁদের ডেকে আনলুম। এই যে, ইনি হচ্ছেন শ্রীমতী দময়ন্তী দত্তগুপ্ত, এঁর কথা তো আগেই বলেছি। ইনি শ্রী সমরেশ দত্তগুপ্ত। এঁরা মিস্টার ও মিসেস সেন, সমরেশবাবুর বন্ধু।'

ভদ্রমহিলা চোখ পাকিয়ে দময়ন্তীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন, তারপর গলার মধ্যে 'হুঁঃ' জাতীয় একটা অসন্তুষ্টির শব্দ করে বিরক্ত মুখে অন্যদিকে তাকিয়ে রইলেন। সামান্য একটু ভদ্রতা করে তাঁর বিরক্তি গোপন করবার বিন্দুমাত্র চেষ্টাও করলেন না।

ইতিমধ্যে অরবিন্দ দময়ন্তীকে নবাগত দুজনের পরিচয় দিচ্ছিলেন, 'ইনি আমার দিদি, অমৃতপ্রভা রায়চৌধুরী আর ইনি মিস্টার অমৃতপ্রভা রায় চৌধুরী ওরফে বিনয়ভূষণ।'

বিনয়ভূষণ সার্থকনামা। পরিচয় করানো মাত্র বিনীত মধুর হেসে সকলকে নমস্কার করলেন, তারপর সকৌতুকে দময়ন্তীকে দেখতে লাগলেন। অমৃতপ্রভা কিন্তু নমস্কারের ধার দিয়েও গেলেন না। মোটা, ক্রুদ্ধ গলায় অরবিন্দকে সম্বোধন করে বললেন, 'খোকা, তোমার ছেলেমানুষি কি কোনোদিনও যাবে না? তুমি যে কবে বড়ো হয়ে উঠবে, তা জানি না। তুমি কেন এখনও এই সামান্য কথাটা বুঝতে পারছ না যে তোমার প্রাণ নিয়ে টানাটানি? সেক্ষেত্রে...'

সকলের সামনে ভর্ৎসিত হয়ে একটু রেগেই গেলেন অরবিন্দ। বললেন, 'সেক্ষেত্রে কী? আমার কোন কাজটা ছেলেমানুষি দেখলে তুমি?'

'সেটাও তোমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে, তবে তুমি বুঝবে? আমি তোমাকে বলেছিলুম একজন অভিজ্ঞ লোকের সাহায্য নিতে, আর তুমি ধরে এনেছ এদের?'

অরবিন্দ আরও রেগে গেলেন। রক্তবর্ণ চোখে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন দিদির দিকে, যদিও সেই দৃষ্টির সামনে দিদি কিছুমাত্র বিচলিত হলেন বলে মনে হল না। তারপর নীচু গলায় বললেন, 'এঁরা আমার অতিথি অমু, অন্তত এঁদের অসম্মান কোরো না।'

'আমি এঁদের অসম্মান করতে যাব কেন? এঁদের তো কোনো দোষ নেই। এঁদের ডেকে এনেছ তুমি, দোষ তোমার। আমি সেই কথাই তোমাকে বলছিলুম যে তোমার ঘটে যদি কিছুমাত্র বুদ্ধি থাকত আর যদি আমার কথা ঠিকমতো শুনতে তাহলে আজ তোমার এই দুরবস্থা হত না। এঁদের পাওনাকড়ি কী আছে, মিটিয়ে দাও, দেখছি আমাকেই বেরোতে হবে লোকের সন্ধানে।'

দময়ন্তী উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আচ্ছা, অরবিন্দবাব, আমরা তাহলে চলি। আশা করি, আমাদের আর প্রয়োজন নেই।'

শিবেন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাঁচা গেল বউদি। চলুন, যাওয়া যাক।'

চোখ বুজে স্থির হয়ে আত্মসংবরণ করছিলেন অরবিন্দ। হঠাৎ চোখ খুলে বললেন, 'দময়ন্তী, তুমি যদি চলে যাও, আমি আজ রাত্রের মধ্যেই আত্মহত্যা করব, স্থির জেনো। এ ঘর আমার, আমি তোমাকে ডেকে এনেছি, আমি তো তোমাকে যেতে বলিনি। আমি তো তোমাকে অসম্মান করিনি। অন্যে কী বলল, তার জন্যে তুমি আমার ওপর রাগ করতে পার না। পার কি? যে অপরাধ আমি করিনি, তার জন্যে কি তুমি আমাকে শাস্তি দেবে দময়ন্তী?'

দময়ন্তী বেশ কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর পরিত্যক্ত চেয়ারটায় বসে পড়ল। দেখাদেখি শিবেনও বসে পড়ল। এর আগে একদিন দময়ন্তী অরবিন্দের এমন একটা আকর্ষণী শক্তির কথা বলেছিল যে-জন্যে উনি কোনো অনুরোধ করলে কিছুতেই তাতে না বলা যায় না, সেই শক্তি যে কী শিবেন এখন তা বুঝতে পারল। দময়ন্তী যতক্ষণ চিন্তা করছিল, ততক্ষণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও শিবেন প্রার্থনা করছিল যেন ও 'না' না বলে।

দময়ন্তী আবার বসে পড়ায় অরবিন্দ আর বিনয়ভূষণ, দুজনেই নির্ভেজাল খুশির হাসি হেসে উঠলেন। অরবিন্দ বললেন, 'বাঁচালে মা। এবার বল তোমার কী প্রশ্ন আছে। সাধ্যমতো আমি সব উত্তর দেব।'

অমৃতপ্রভা যথাপূর্বং বিরক্ত মুখে বসে ছিলেন। বাধা দিয়ে বললেন, 'প্রশ্ন আবার করবার কী আছে? ওই মাগিটা...'

এই গ্রাম্য, অশিষ্ট শব্দটির অভিঘাতেই বোধহয় এই প্রথম বিনয়ভূষণের মুখে কথা ফুটল। অতি মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বললেন, 'আহা, একটু চুপ করো না! এঁদের কথা বলতে দাও।'

ঘরের মধ্যে যেন বজ্রপাত হল। অমৃতপ্রভার চোখ দুটো মুহূর্তের মধ্যে টকটকে লাল হয়ে ফুলে উঠল, মনে হল যেন তারা কোটর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসবে। গলার শিরাগুলো দপদপ করে উঠল, তারপর একটা প্রাণঘাতী চিৎকার, 'চুপ কর অপদার্থ, ছোটোলোক, ইডিয়ট! যত বড়ো মুখ নয় তত বড়ো কথা। আমাদের কথার মধ্যে তুমি কথা বলতে আস কোন সাহসে? কী বোঝ তুমি? গর্দভ।'

বিনয়ভূষণের মুখে একটা কষ্টকৃত ক্ষীণ, ক্লিষ্ট হাসি ফুটে উঠল। মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'আমি গাধা, বুঝি নে কিছু? আমি বলে একটা ডবল এম এ...'

'ইঁ...ইঁ...ইঁ...ইঁ...' করে চিৎকার করতে করতে খাট থেকে প্রায় উঠে দাঁড়ালেন অমৃতপ্রভা। সাইক্লোনের মধ্যে নারকেল গাছের মতো মাথা নাড়তে নাড়তে চ্যাঁচাতে লাগলেন, 'ডবল এম এ?' আমার গুষ্টির পিণ্ডি। দুটো বই পড়ে যেন দুনিয়ার মাথা কিনে নিয়েছ, না? কী মূল্য আছে তোমার আর তোমার বাবার যত পোকাধরা, ছাতাপড়া বইয়ের? রাস্তায় টান মেরে ফেলে দিলে তো ঘেয়ো কুকুরটাও ছুঁয়ে দেখবে না। ঘটে তো আসলে গোবর! দুবেলা খাবারটুকুও তো জোটাবার মুরোদ নেই, আবার এম-এ? জানোয়ার হয়ে জন্মেছ, জানোয়ার হয়েই থাক।'

এই চিৎকারের মধ্যে কখন যেন অরবিন্দ দুহাতে কান ঢেকে ফেলেছেন, মুখ নীচু। অমৃতপ্রভা দম নেবার জন্য থামতেই, মুখ তুলে বললেন, 'সমরেশ, তুমি আমাকে একটু ধরে তুলতে পারবে? এখানে এরা ঝগড়া করুক, আমরা চল অন্য কোথাও যাই। ময়দানে বোধহয় বেশ নিরিবিলি হবে, তাই না?' রাগে ওঁর গলার স্বর অল্প অল্প কাঁপছে।

অমৃতপ্রভা ধপ করে আবার খাটের ওপর বসে পড়লেন। প্রায় স্বাভাবিক গলায় বললেন, 'তোমার রাগ করার তো কোনো কারণ দেখি না। আমরা ঝগড়া করতে যাব কোন দুঃখে? ঝগড়া হয় সমানে সমানে, এটা তো তা নয়। ছোটোলোকদের মাঝে মাঝে জানিয়ে দিতে হয় যে, তারা ছোটোলোকই। এটা তাই।'

দময়ন্তী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'অরবিন্দবাবু, আপনি আমাকে সাহায্য করতে ডেকেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাতে এত গণ্ডগোল হবে জানলে আমি আসতুম না। যা হোক, আপনার চাকর যে হারিয়ে গেছে বলে আপনার বিশ্বাস, তাকে খুঁজে বের করবার জন্য পুলিশে খবর দিন। অন্যান্য সমস্যাগুলো না হয় পরে কোন সুবিধেজনক সময়ে বিবেচনা করা যাবে।' বলে উঠে দাঁড়াবার উপক্রম করল।

অরবিন্দ হাত তুলে বললেন, 'দাঁড়াও!' তারপর একটু দম নিয়ে বললেন, 'এর মধ্যে আমি তোমাকে থাকতে বলতে পারি না ঠিকই, কিন্তু পঞ্চা হারায়নি, তাকে চুরি করা হয়েছে— এ-কথাটা নিশ্চিত জেনে যাও। হারাবার ছেলে পঞ্চা নয়, আর সে কোনোমতেই পালাবে না। সে পালাতে পারে না। তাকে নির্ঘাত সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার মা সন্ধ্যে হলেই আফিমের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে। পদম ডাকলে আসে, সর্বক্ষণ আমার খিদমতগিরি করার তার কথা নয়, আসল কথা, আমাকে সম্পূর্ণ বেআব্রু করে রসিয়ে রসিয়ে শেষ করার চক্রান্তের এটা একটা অংশ মাত্র। তার শেষ কোপটা পড়বারও

খুব আর দেরি নেই, কারণ এক্সপার্ট চাকর পেতে সময় লাগে ঠিকই, কিন্তু খুব বেশি লাগে না।'

দময়ন্তী উঠে দাঁড়িয়েছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই জিজ্ঞেস করল, 'পঞ্চানন পালাতে পারে না, এ-বিষয়ে আপনি এত স্থির নিশ্চয় হচ্ছেন কী করে? আমি তো সংসার করি, আমি জানি, চাকরদের যতই মাইনে দিন, যতই তোয়াজ করুন, ওরা পালাবেই।'

'পঞ্চা আর পাঁচটা চাকরের মতো নয়, দময়ন্তী। একটা কারণে ও আমার কাছে এতই কৃতজ্ঞ যে ওর পক্ষে পালানো সম্ভব নয়। আমাকে ছেড়ে ও যেতে পারে না।'

'কেন?'

খুব বিনীত হাসি হাসলেন অরবিন্দ। বললেন, 'সে সামান্য ব্যাপার। তেমন কিছুই নয়।'

অন্যকে সাহায্য করার ব্যাপারে যিনি বিনয়ে বিশদভাবে কিছু বলতে অনিচ্ছুক, তাঁকে আর প্রশ্ন করা চলে না।

'আচ্ছা, আমরা তাহলে আজ চলি।' বলল দময়ন্তী। তারপর সদলবলে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

৯

বারান্দায় বেরিয়ে সমরেশ প্রকাণ্ড একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বলল, 'বাপ! মনে হচ্ছিল যেন রোমে বসে আছি।'

'রোমে? সে কি, কেন, রোম কেন?' তিনজনে প্রায় সমস্বরে প্রশ্ন করল।

'রোমে নয়তো কী? একেবারে কলসিয়ামের ভেতর, অসহায় গ্ল্যাডিয়েটর বিনয়ভূষণকে ক্ষুধার্ত বাঘিনীর মুখে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আমার তো প্রতি মুহূর্তে ভয় হচ্ছিল, এই বুঝি ভদ্রমহিলা তাঁর সোয়ামিটিকে ধরে কামড়ে দেন।'

'কেন? এখন কেন?' শিবেন ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, 'তখনি বলিনি শালারা ছোটোলোক?'

কথা বলতে বলতে ওরা সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছিল। বাঁ দিকের শেষ দরজাটার কাছে আসতেই সুদৃশ্য পর্দার আড়াল থেকে একটি সুশ্রাব্য নারীকণ্ঠ শোনা গেল, 'শুনুন।'

চারজনেই দাঁড়িয়ে পড়ল। নারীকণ্ঠের অধিকারিণী এবার বাঁ হাতে পর্দাটা উঁচু করে সরিয়ে দর্শন দিলেন। কেতাদুরস্ত ভাবে বললেন, 'দয়া করে আপনারা একটু ভেতরে এসে বসবেন কি? আপনাদের সঙ্গে আমি কিছু কথা বলতে চাই।'

মহিলাকে দেখে চারজনেরই চক্ষুস্থির, শিবেন আর সমরেশের তো ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা।

সীতাকে দেখে রাবণরাজা নাকি বলেছিলেন, 'নহি রূপোপমান্যা তবাস্তি শুভদর্শনে।' সমরেশের ঠিক সেই কথাই মনে হল। অবিশ্যি অতুলনীয় রূপ সত্ত্বেও ঠিক শুভদর্শনা বলা উচিত নয় এঁকে! বরং 'অখিল মানসস্বর্গে অনন্তরঙ্গিনী স্বপ্নবাসিনী' বলা চলে। মানে, এঁকে অসংকোচে বলা যায়, 'ইচ্ছা করিয়াছে, সবলে আঁকড়ে ধরি এ বক্ষের কাছে, সমুদ্র মেখলা পরা তব কটিদেশ।'

জ্বলন্ত আগুনের মতো রূপ, লালসার লেলিহান শিখা। ফিগারটি যা তৈরি করেছেন, তাতে সন্দেহ থাকে না যে তাঁর আদর্শ টুইগি বা মিয়া ফারো নয়, আদর্শ জেন ম্যানসফিল্ড

বা সোফিয়া লোরেন। কাছ থেকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না, অস্বস্তি হতে থাকে।

অস্বস্তি চারজনেরই হচ্ছিল, অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন কারণে। পুরুষ দুজনের কারণ তো বলাই বাহুল্য, তাদের তো ততক্ষণে বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা, রক্তধারা বেজায় নাচানাচি শুরু করে দিয়েছে। মেয়েদের অস্বস্তির কারণ ভদ্রমহিলার পোশাক। উনি যে শাড়িটা পরেছেন সেটা কেন পরেছেন সেটা গবেষণার বিষয়, লজ্জা নিবারণের জন্যে তো কখনই নয়। সেই স্বচ্ছ, প্রায় অদৃশ্য আবরণের তলায় ওঁর ঊর্ধ্বাঙ্গের যে স্বল্পবাসটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, তার উদ্দেশ্যও বোধ হয় লজ্জানিবারণ নয়, উদ্ধত উপচিত যৌবন একটু সামলে-সুমলে আটকে রাখা।

বিলোল কটাক্ষে সমরেশের প্রকাণ্ড শরীরটা আপাদমস্তক লেহন করে মৃদু হেসে ভদ্রমহিলা আবার বললেন ,'ভেতরে আসবেন কি?'

তৎক্ষণাৎ সমরেশের সর্বাঙ্গে ফোসকা পড়ে গেল, গলা দিয়ে কোনো আওয়াজই বেরোল না। পাশ থেকে শিবেন চিঁ চিঁ করে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।' তারপর বোধহয় নিজের বিবেক সাফসুতরো রাখার জন্য পূর্ববৎ চিঁ চিঁ করে দময়ন্তীকে জিজ্ঞেস করল, 'কী বলেন, বউদি?'

মৃদু হেসে দময়ন্তী বলল, 'বেশ তো, চলুন।'

আই-এফ-এ শিল্ডের খেলায় ছোটো টিমের লেফট হাফ যেমন বড়ো টিমের দুঁদে রাইট আউটের সঙ্গে লেপটে যায়, রমলা তেমনি চট করে পোজিশন নিয়ে শিবেনের সঙ্গে সেঁটে গেল।

ভদ্রমহিলা পর্দাটা একহাতে উঁচু করেই সরে একদিকের দরজার পাল্লায় পিঠ দিয়ে দাঁড়ালেন। প্রথমে দময়ন্তীই ঘরে ঢুকল, তারপর লেজুড় লেফট হাফকে নিয়ে শিবেন এবং সবশেষে সমরেশ। ভদ্রমহিলা আর তাঁর সামনের দরজার পাল্লার মধ্যে যতটা ফাঁক ছিল, প্রথম তিনজন তার মধ্যে দিয়ে মোটামুটি ভালোভাবেই গলে গেল, কিন্তু সমরেশের বেলা তা হল না। মহিলার দূরতম বিন্দুর সঙ্গে টক্কর খেয়ে সমরেশ টাল খেতে খেতে ধপ করে গিয়ে একটা বড়ো সোফায় বসে পড়ল।

কিছুক্ষণ দম নিয়ে সমরেশ নিজের চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করল।

ওপাশের ঘরগুলোর মতোই এটিও বিশালাকৃতি, তবে সুন্দরভাবে সাজানো। ঘরের কর্ত্রীর যে একটা বিশিষ্ট রুচি আছে সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়, যদিও রুচিটা যেন একটু কেমনধারা। আসবাবাপত্র বলতে দুটো প্রায় ফুট সাতেক লম্বা পুরু গদিমোড়া কৌচ, তার ওপর নরম জাজিম পাতা, একটা বড়ো ও দুটো ছোটো সোফা— নরম আর সুখপ্রদ। মেঝেয় পশমের গালিচা আর একধারে একটা ককটেল ক্যাবিনেট। ক্যাবিনেটের ওপর তিন-চার রকমের গেলাসের সেট আর তলায় কাচের পাল্লার ভেতর নানা রকম ছোটোবড়ো বোতলে দিশি-বিলিতি পানীয়ের সমারোহ। দেওয়ালে একধারে অ্যাঁগারের 'উৎস'-এর প্রকাণ্ড রিপ্রোডাকশন— একজন দিগবসনা সুন্দরী কাঁধের ওপর রাখা ভৃঙ্গার থেকে জল ঢালছেন আর অন্যধারে বট্টিচেলির 'ভিনাস'— ইনিও তাঁর সঙ্গিনীটির মতোই বিবসনা, কেবল তাঁর বিশাল কেশদামে দিয়ে লজ্জানিবারণের কিঞ্চিৎ প্রয়াস পেয়েছেন। মোট কথা, সমস্ত ঘরটাই কেমন যেন মসৃণ, নরম, সুখপ্রদ আর অশ্লীল। এ-ঘরের কর্ত্রী যে, সংস্কৃতে যাকে বলে পুরন্ধ্রী, তা নন তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না। পুরাকালে বিদিশা-টিদিশায় মুখ্য নাগরিকাদের সংকেতগৃহ বোধহয় এইরকম করেই সাজানো থাকত।

ইতিমধ্যে গৃহকর্ত্রী দরজার ছিটকিনি বন্ধ করে একেবারে পর্যাপ্ত পুষ্প-স্তবকাবনম্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার মতো অতিথিদের কাছে এসে গেছেন। সমরেশকে পুনরায় একটা মর্মভেদী দৃষ্টি দিয়ে বিদ্ধ করে বললেন, 'কী খাবেন বলুন। ড্রিংকস? ঠান্ডা না গরম? য়্যু নেম ইট অ্যান্ড আই হ্যাভ ইট'। গলা দিয়ে যেন মধু ঝরে পড়ছে।

সমরেশ দ্বিতীয়বার নয়ন-বাণে বিদ্ধ হয়ে বড়োই কাহিল হয়ে পড়েছিল। ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, 'আমি এক কাপ কফি খাব।'

'আপনারা?' বলে ভদ্রমহিলা শিবেন ও আপাতত অবিচ্ছেদ্য লেফট হাফের দিকে তাকালেন।

শিবেন একবার তৃষ্ণার্ত চোখে ককটেল ক্যাবিনেটের দিকে তাকাল। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আমরাও কফি।' তারপর লেফটহাফের দিকে চেয়ে শহিদের হাসি হাসল।

দময়ন্তী একটা সিঙ্গল সোফায় বসে তার উঁচু হাতল আর নরম গদির মধ্যে প্রায় ডুবে গিয়েছিল, শুধু মাথাটুকু জেগে ছিল হাতলের ওপর। সেখান থেকে মিষ্টি হেসে বলল, 'আমিও তাই।'

ভদ্রমহিলা যেন বিস্মিতই হলেন : 'সবাই কফি খাবেন?' তারপর গলা উঁচু করে বললেন, 'লছমি, পাঁচ কফি বানাও।'

ভেতর থেকে জবাব এল। ভদ্রমহিলা এবার নিশ্চিত হয়ে ধপ করে সমরেশের পাশে বসে পড়লেন। সমরেশ অসহায় দৃষ্টিতে একবার সকলের দিকে তাকাতে গিয়ে একপাশে সোফার হাতলের ওপর দময়ন্তীর মুখটুকু চোখে পড়তেই থমকে গেল। ওর চোখ দুটো অকৃত্রিম কৌতুকে ঝকঝক করছে, ঠোঁটের কোণে চাপা হাসি— একদৃষ্টে চেয়ে আছে। দেখেই সমরেশের সমস্ত মাথাটা হঠাৎ একদম পরিষ্কার হয়ে গেল। মনে মনে ভাবল, 'ঠিক হ্যায়, চ্যালেঞ্জ নিলুম।' তারপর মুখ ঘুরিয়ে পূর্ণদৃষ্টিতে গৃহকর্ত্রীর দিকে তাকাল।

গৃহকর্ত্রীও তাঁর বিশাল চোখ দুটি ভুলে নির্দ্বিধায় সমরেশের চোখের দিকে তাকালেন। মানুষের— বিশেষত কোনো মহিলার চোখের দৃষ্টি যে এত আদিম এবং ক্ষুধার্ত হতে পারে, সমরেশের তা জানা ছিল না। ওর পূর্ণদৃষ্টির সামনে একবারও সেই চোখে নত হল না, কম্পিত হল না। অন্য সময় হলে এ অবস্থায় সমরেশ কী করত বলা যায় না, কিন্তু এখন চ্যালেঞ্জ নেওয়া হয়ে গেছে, অন্তত পালিয়ে যাওয়া চলে না। কাজেই নিম্নকণ্ঠে— কিন্তু যাতে সবাই শুনতে পায়, বলল, 'আই ক্যাদার চাটুয্যে নো জু গার্ডেন।'

কথাটা বলা মাত্র অন্য তিনজন উৎকণ্ঠিত, উদগ্রীব দর্শকের গলা দিয়ে এক-এক রকম অদ্ভুত শব্দ বেরোল— যেন চেপে রাখা উত্তেজনাটা ভেঙে-চুরে বেরিয়ে চলে গেল। মুহূর্তের মধ্যে আবহাওয়াটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

গৃহকর্ত্রী ব্যাপারটা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন বলে মনে হল না। উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আই বেগ ইওর পার্ডন।'

পরিষ্কার গলায় সমরেশ বলল, 'বলছিলুম আমার নাম সমরেশ দত্তগুপ্ত, আর ওঁরা আমার বন্ধু শিবেন সেন আর তার স্ত্রী, আর উনি...'

'আপনার স্ত্রী মিসেস দময়ন্তী দত্তগুপ্ত। পরিচয় করানোর কোন দরকার নেই। আমি আপনাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলুম।'

'কিন্তু আপনার পরিচয় তো এখানও পেলুম না।' সমরেশ নিশ্চিন্ত, নির্ভয়।

‘আমার পরিচয়?’ ভদ্রমহিলা স্তম্ভিত, প্রায় অবিশ্বাসীর দৃষ্টিতে সবার দিকে তাকালেন, কিন্তু সকলেরই ভাবলেশহীন মুখ দেখে থেমে বললেন, ‘ও, আমি ভেবেছিলুম ওদিকে আমার পরিচয় আপনাদের দেওয়া হয়ে গেছে। যাক, আমার নাম রেবেকা আচারিয়া। এ-বাড়িতে আমাকে অনেকে রেবা নামে জানে। আমার বিয়ের পর শ্বশুরমশায় আমাকে এই নাম দেন, তারপর থেকে শ্বশুরবাড়িতে আমার এই নামটাই প্রচলিত।’

শিবেন বলল, ‘আপনার নামটা অন্যরকম বলেই জিজ্ঞেস করছি, কিছু মনে করবেন না। আপনি কি— মানে, বাঙালি নন?’

‘বাঙালি বলতে আপনি কী বোঝেন আমি জানি না, তবে আমার মধ্যে ইউরোপীয় রক্ত আছে। আমার দাদামশায় ছিলেন কুলতলার জমিদার স্যার প্রতাপনারায়ণ মল্লিক আর দিদিমা ছিলেন ইংল্যান্ডের লর্ড পরিবারের মেয়ে। স্যার প্রতাপ ক্রিশ্চান হয়েছিলেন, বিলেতেই থাকতেন। তাঁদের মেয়ে, অর্থাৎ আমার মা, অপূর্ব রূপসি ছিল। লণ্ডনের উঁচু সমাজের অনেক বড়ো বড়ো লর্ডের ছেলের মুণ্ডু ঘুরিয়ে শেষপর্যন্ত বিয়ে করল আমার বাবাকে। রক্তের ভারতীয় প্রভাব যাবে কোথায়? আমার বাবাও অবিশ্যি দুর্দান্ত সুপুরুষ ছিলেন। অমন সুপুরুষ আমি জীবনে খুব বেশি দেখিনি।’ বলে আবার সতৃষ্ণ চোখে সমরেশকে বিদ্ধ করলেন।

সমরেশ পাত্তা দিল না। জিজ্ঞেস করল, ‘আপনার বাবা কী করতেন?’

‘আমার বাবা ছিলেন উত্তর বাংলার নয়নপুরের জমিদার— যদিও স্থায়ী ভাবে কলকাতায়ই থাকতেন।’

‘আপনার মাকে বিয়ে করবার জন্য উনিও কি ক্রিশ্চান হয়েছিলেন? দময়ন্তী প্রশ্ন করল।

‘হ্যাঁ, ক্রিশ্চান হয়েছিলেন বটে, তবে পরে আর্য-সমাজের মাধ্যমে হিন্দু হয়েছিলেন। কেন হয়েছিলেন জানি না, বোধহয় সম্পত্তি পাওয়ার ব্যাপারে কোনো সুবিধে হয়েছিল।’

‘আপনার বাবা-মা বেঁচে আছেন?’

‘বাবা মারা গেছেন, মা বেঁচে আছেন।’

‘কোথায় থাকেন আপনার মা?’

‘আপাতত আছেন রাঁচিতে। বাবার মৃত্যুর পর এত মদ খেতেন যে সামলাতে পারেননি।’ নির্বিকার মুখে বলে গেল রেবেকা।

‘আপনি মদ খান নাকি?’ সমরেশের নির্ভীক প্রশ্ন।

‘নিশ্চয়ই। তবে ভয় পাবেন না, মার মতো আমি অসংযমী নই।’

‘আপনি খান কেন? আপনার স্বামী তো বেঁচে আছেন!’ পুনরায় সমরেশ।

রেবেকা আত্মগতভাবে বলল, ‘আমার স্বামী?’ বলে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর কিছুটা অন্যমনস্কভাবে বলতে আরম্ভ করল, ‘দেখুন, আপনারা এতক্ষণ আমাকে আমার সম্বন্ধে অনেক প্রশ্নই করলেন। এর দরকার ছিল না। কারণ আপনাদের যে-কথা বলার জন্য ডেকেছিলুম, আমার বিশ্বাস, তা শুনলেই আপনারা সব প্রশ্নেরই উত্তর পাবেন।

‘আপনারা জানেন কিনা জানি না, পশ্চিমবাংলায় জমিন্দারস অ্যাসোসিয়েশন বলে একটা সংস্থা আছে। মাঝে মাঝে ক্যালকাটা সুইমিং ক্লাবে তার আসর বসে। এমনি একটা পার্টিতে আমার শ্বশুর ঈশ্বর জগদীশ আচারিয়া আমাকে দেখে তাঁর পুত্রবধূ বলে নির্বাচন করেন এবং সেখানেই আমার বাবার সঙ্গে কথাবার্তা বলে সব ঠিকঠাক করে ফেলেন।’

দময়ন্তী বাধা দিয়ে প্রশ্ন করল, 'উনি কি আপনার দাদামশায়ের কথা বা আপনার বাবার ক্রিশ্চান হবার কথা জানতেন?'

'হ্যাঁ, জানতেন, কিন্তু আমাকে দেখে এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে সেগুলো বিবেচনার মধ্যে আনেননি। ওঁর বয়স যদি ষাটের ওপর না হত, তাহলে হয়তো পুত্রবধূ না করে নিজেরই বধূ করে ফেলতেন।' বলে নিজের রসিকতায় নিজেই এমন একটা হাসি হাসল — যা শ্বশুরের প্রতি সম্মান বা শ্রদ্ধার ইঙ্গিত বহন করে না।

বিরক্ত মুখে দময়ন্তী চুপ করে রইল। আর কোনো প্রশ্ন আসছে না দেখে রেবেকা শুরু করল : 'আমার তখন বয়স সতেরো, সেন্ট ক্যাথারিনে ইন্টার মিডিয়েট পড়ি আর আমার স্বামীর বয়স তখন বত্রিশ— বাহ্যত কিছুই করেন না। দেহমনের মিলনের জন্যে পনেরো বছরের বয়সের তফাতটা এমন কিছুই নয়, কিন্তু অনেকগুলো কারণে আমাদের ক্ষেত্রে মিলনটা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। আমার স্বামী আমাকে বাড়ি থেকে প্রায় বেরই করে দিতেন, নেহাত আমার শ্বশুরের জন্য সেটা সম্ভব হয়নি।

'আমার স্বামী যে কোনো নিরিখেই ছিলেন অপদার্থ। অথচ আত্মম্ভরিতা এবং অহঙ্কারের সীমা ছিল না। লোকে অপদার্থ হলেই নীচ হয় না, কিন্তু অপরিসীম ইগো তাঁকে মাঝে মাঝে ইতরের পর্যায়ে টেনে আনত।

'বিয়ের কয়েক মাসের মধ্যেই আমি বুঝতে পেরেছিলুম, অরবিন্দ আচারিয়ার স্ত্রী হিসেবে জীবন কাটানো আমার সাধ্যাতীত। চলেই আমি যেতুম, পারিনি আমার শ্বশুরের জন্য। সেই বৃদ্ধ আশা করেছিলেন আমি তাঁর ছেলেকে সুস্থ, সৎ জীবনে ফিরিয়ে আনতে পারব। সেটা যখন পারলুম না, তখন উনি আমাকে দোষ দিলেন না— দিলেন ছেলেকে। এ জন্যে নয় যে তিনি একজন খুব র‍্যাশনাল লোক ছিলেন, বরং এ জন্যে যে তিনি আমাতে পুরোপুরি ইনফ্যাচুয়েটেড হয়েছিলেন।'

সোফার ভেতর থেকে দময়ন্তীর হিমশীতল কণ্ঠ শোনা গেল, 'আপনার শ্বশুরের প্রতি আপনার তো খুব একটা শ্রদ্ধা আছে বলে মনে হচ্ছে না মিসেস আচার্য!'

'একেবারেই না। আমার স্বামীটি ওয়াজ ওনলি এ চিপ অব দি ওল্ড ব্লক— যাকে বলে বাপকা বেটা। যাক, ভদ্রলোক মারা গেছেন, তাঁর আত্মার শান্তি হোক। উনি যখন দেখলেন ছেলে সৎপথে তো ফিরলই না, অবশ্য ফেরা তখন সম্ভবও ছিল না, উলটে সে যে তার বউকেই বাড়ি থেকে বের করে দেবার তাল করছে, তখন ভদ্রলোক একটা অদ্ভুত কাজ করে বসলেন। উইল করে উনি বাড়ির এ অংশটা আমাকে দিয়ে গেলেন, ও অংশটা ছেলেকে আর একতলার মালিকানা দুজনকেই একসঙ্গে। আমাদের মৃত্যুর পর একে একে এ অংশগুলো যাবে আমার ননদের ছেলে বিদ্যুৎপ্রকাশের হাতে।

'ভালো কথা। আমার বিয়ের দুবছর বাদে যখন আমার শ্বশুরের মৃত্যু হল, তখন এ-বাড়ির এ অংশটার আইনসংগত মালিক হলুম আমি। তখন বাবা মারা গেছেন, মা অর্ধ-উন্মাদ, আত্মীয়স্বজনদের বাবাই ত্যাগ করেছিলেন, এ অবস্থায়, স্বভাবতই আমি ঠিক করলুম যে আমি এখানেই থাকব। এবং তখন থেকেই শুরু হল যত গণ্ডগোল।

'আমার স্বামী আর ননদের চিরকালই চক্ষুশূল ছিলুম আমি, আর আমিও এঁদের ভণ্ডামি আর ইতরামো সহ্য করতে পারতুম না। কিন্তু এখন সম্পর্ক দাঁড়াল সাপে-নেউলে। আমাকে তাড়ানোর জন্য ওঁরা উঠে পড়ে লাগলেন, কত চেষ্টা করলেন, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু তাঁদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল। কলকাতায় আমারও কিছু প্রভাবশালী বন্ধুবান্ধব আছেন, তাঁরা অকাতরে সাহায্য করেছেন এবং এখনও করেন।

‘গত দশ বছরে নানারকম চেষ্টা হয়েছে, গুন্ডা লাগানো, অষ্টপ্রহর খোল বাজিয়ে সংকীর্তন, অশ্রাব্য গালিগালাজ, উড়ো চিঠি, কী নয়? কিছুতেই আমাকে নড়াতে পারেনি। কিন্তু এইবারে শুনেছি নাকি একটা নতুন রকম কী শুরু হয়েছে। এর আগেরগুলো ছিল সোজা সরল ব্যাপার, বুঝতে আমার কষ্ট হয় নি, তবে এবারে অনেক ঘুরপথে খুব রহস্যময় কিছু একটা ঘটছে— আমি ঠিক আঁচ করতে পারছি নে। ও ঘরে নাকি মাঝে মাঝে চোর আসছে অথচ কিছু চুরি যাচ্ছে না। হীরালালবাবুর বাড়ি থেকে নাকি একটা গুন্ডা ও ঘরের দিকে নজর রাখছে, কেন রাখছে তা কেউ জানে না। এবং এসমস্ত নাকি করাচ্ছি আমি, উদ্দেশ্য, মিস্টার আচারিয়াকে খুন করা।

‘এখন, একটা লোককে খুন করা বড়ো সহজ ব্যাপার নয়, আর অন্য একজনকে তার ষড়যন্ত্রকারী বলাও বড়ো ছোটো অভিযোগ নয়। আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আমাকে সাবধানে থাকতে হয়। কিন্তু এ-ব্যাপারটা যে লাইনে চলছে তাতে আমি কীভাবে সাবধান হব বুঝতে পারছি না। কাজেই আমি স্থির করলুম, মিসেস দত্তগুপ্তকে সবকথা খুলে বলব। ভেবেছিলুম, ওরা আমার নামে সবাইকে যা বলে তা আপনাদেরও বলবে, তাহলে সে-কথাগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে আমার জবানবন্দি দেওয়াটা সহজ হবে। তা যখন হল না, তখন আমাকে এতগুলো কথা বলতে হল, হয়তো আপনারা বিরক্ত হলেন। যা হোক, আমার মূল বক্তব্য হচ্ছে যে, এই চোর আসা, নজর রাখা বা খুনখারাবি— এসব কিছুই আমি জানি নে, এদের কোনোটার সঙ্গেই আমার কোনোরকম সম্পর্ক নেই। এবার বলুন মিসেস দত্তগুপ্ত, আপনার কি কোনো প্রশ্ন আছে?’

‘আছে।’ সোফার ভেতর থেকে উত্তর এল, ‘আপনার শাড়িজামা আপনি শেষ কখন বদল করেছেন?’

রেবেকা কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে চুপ করে রইল, তারপর রাগত হেসে বলল, ‘আপনারা আসার মিনিট দুয়েক আগে। আপনারা বোধহয় আমার কোনো কথাই বিশ্বাস করলেন না, না?’

‘করেছি। আপনি কী পারফিউম ব্যবহার করেন? ল্যাভেন্ডার?’

‘হ্যাঁ।’

‘হীরালালবাবুর সঙ্গে আপনার কতদিনের পরিচয়?’

‘অনেক দিনের। উনি সুদূর অতীতে কোনো সময়ে অমৃতদির প্যারামুর ছিলেন, আপাতত বন্ধু। অমৃতদির মাধ্যমেই আমার সঙ্গে পরিচয়।’

‘হীরালালবাবু সিনেমার প্রযোজক আপনি জানেন?’

‘জানি।’

‘বকুল সাঁতরা বলে কাউকে আপনি চিনতেন?’

‘মিসেস দত্তগুপ্ত, আপনার এসব প্রশ্নের উদ্দেশ্য কী আমি জানি না, যদি পরিষ্কার করে বলেন তো উপকৃত হই।’ রেবেকার গলা তখনও রাগত, ‘আমি আপনাদের ডেকে এনেছিলুম আমার সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করব বলে। তার জন্যে আপনাকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতেও প্রস্তুত ছিলুম। কিন্তু আপনি যেসব প্রশ্ন করছেন, সেগুলো আমাদের মূল সমস্যাগুলোর সঙ্গে কি কোনোভাবে জড়িত? পাশের ঘরে যে ষড়যন্ত্র চলছে, তার সঙ্গে আমার পারফিউম বা একটি মৃতা মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল কিনা, ইত্যাদি প্রশ্নের কি কোনো সম্পর্ক আছে?’

‘আছে মিসেস আচার্য। আপনি জানেন কিনা জানি না, মূলত আমি রহস্যসন্ধানী নই, পেশাদার ডিটেকটিভ তো নয়ই, আমি ইতিহাসের অধ্যাপিকা। একজন ঐতিহাসিক তাঁর উপাদান সংগ্রহ করেন ভাঙা বাসনের টুকরো বা ছেঁড়া একচিলতে কাগজ থেকেও, কোনো কিছুই তাঁর কাছে অপ্রয়োজনীয় বা অতিরিক্ত নয়। আমিও স্বভাবতই সেইভাবেই এগিয়ে থাকি, এই আর কী!’

হতাশ ভাবে কাঁধ নাচিয়ে রেবেকা বলল : ‘বেশ, আপনার যা খুশি প্রশ্ন করুন।’

‘হীরালালবাবুর সঙ্গে অমৃতপ্রভার অবৈধ সম্পর্ক ছিল বলে আপনি যা বললেন, তার কোনো প্রমাণ কি আপনার কাছে আছে?’

‘না। শ্বশুর মশায়ের মুখে শুনেছি, অমৃতদি পাশের বাড়িতে রীতিমতো লীলা চালাচ্ছিলেন হীরালালের সঙ্গে, ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুরমশায়ই বিয়ে দিয়ে দেন। তারপর উনি শুধরে যান— অন্তত এই ব্যাপারে।’

‘হীরালাল কি তখনই ওই বাড়িটার মালিক?’

‘না। বাড়িটা পরিত্যক্তই ছিল। দুজনে ওটাকে কাজে লাগিয়েছিলেন, এই পর্যন্ত।’

‘বিনয়বাবু কেমন লোক? কী করেন উনি?’

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল রেবেকা, তারপর বলল, ‘উনি লোক খুব ভালো। দোষের মধ্যে ওঁর টাকা- পয়সা বেশি নেই, সেজন্য দিবারাত্র স্ত্রীর কাছে গঞ্জনা শোনেন। উনিও কিন্তু জমিদারের ছেলে, তবে ওঁদের জমিদারি ছিল কুষ্টিয়ায়, পার্টিশানের পর সব কিছু ওখানেই থেকে যায়। বিনয়ভূষণ তখন এম এ পাশ করে জমিদারি দেখাশোনা করছিলেন — ভারতে এসে বুদ্ধি করে আর্মিতে যোগ দেন।’

‘উনি কি তখন বিবাহিত?’

‘না। বিয়ে কিছুদিন পর হয়েছিল। ভারতে পালিয়ে আসবার পর বিনয়বাবুর প্রথম প্রথম খুব কষ্ট গিয়েছিল। বিয়ের পর আবার আর্মিতে যে মাইনে পেতেন, তাতে নাকি স্ত্রীর খরচা মেটাতে পারতেন না। শ্বশুর ভরতুকি দিতেন আর মেয়েকে নিজের কাছে রাখতেন।

‘রিটায়ার করার পর উনি কিছুদিন প্রফেসারি করেছিলেন, কিন্তু অবস্থা প্রায় একই রকম ছিল। শ্বশুরমশাই মৃত্যুর আগে প্রচুর সম্পত্তি মেয়ের নামে লিখে দিয়ে গিয়েছিলেন, এখন তাতেই ভালোভাবে চলে যাচ্ছে। কিন্তু বেচারি ভদ্রলোক, স্ত্রীর খোঁটা খেতে খেতে বোধহয় অস্থির হয়ে গেলেন।

ভদ্রলোকের কিন্তু অনেক গুণ ছিল জানেন? ভালো ছবি আঁকতে পারতেন, চমৎকার সেতার বাজাতেন, সাহিত্যে অগাধ জ্ঞান ছিল, আবার কর্নেল চৌধুরী হিসেবে আর্মিতেও যথেষ্ট সুনাম কিনেছিলেন। কেবল টাকার অভাবে আর স্ত্রী অত্যাচারে ভদ্রলোক শুকিয়ে গেলেন।’

‘হীরালালবাবুর সঙ্গে বিনয়বাবুর পরিচয় আছে? থাকলে সম্পর্ক কেমন?’

‘পরিচয় আছে জানি, সম্পর্ক কেমন তা জানি না।’

‘আপনার সঙ্গে বিনয়ভূষণের সম্পর্ক কেমন?’

‘উনি আমাকে পছন্দ করেন।’

‘আপনার স্বামী বললেন যে তাঁর চাকর পঞ্চা তাঁকে ফেলে পালাতে পারে না। কেন জানেন?’

‘কারণ, আমি যদ্দূর জানি, পঞ্চা একজনকে খুন করেছিল এবং তার সমস্ত প্রমাণ মিঃ আচারিয়ার কাছে আছে। তার ওপর পঞ্চা হাঁপানিতে ভোগে, ও জানে যে ও বেশিদিন পালিয়ে বা লুকিয়ে থাকতে পারবে না। সেই জন্য মিস্টার আচারিয়ার ক্রীতদাসগিরি করে।’

শিবেন বলে উঠল, ‘এ যে ব্ল্যাকমেল!’

দময়ন্তী বলল, ‘ঠিক তাই। আচ্ছা মিসেস আচার্য, আপনার স্বামীর কবে থ্রম্বোসিসের স্ট্রোক হয়?’

‘ওঁর স্ট্রোক হয়নি।’

‘সে কী! তবে যে পক্ষাঘাত?’

‘ওটা সিফিলিটিক প্যারালিসিস।’

সকলে স্তম্ভিত হয়ে চুপ করে বসে রইল। রেবেকা আবার প্রশ্ন করল : ‘এবার বলুন মিসেস দত্তগুপ্ত, আমি কী করব?’

‘কিচ্ছু করবেন না। গ্যাঁট হয়ে বসে থাকুন।’

১০

শিবেন বলল, ‘সিনেমার তো বারোটা বেজে গেল। তা হোক, তবু চারটে সিনেমার দাম উঠে গেছে। বাপস, এক শনিবারের পক্ষে যথেষ্ট করমুক্ত প্রমোদ।’

রমলা জিজ্ঞেস করল, ‘এত যে প্রমোদ হল তার থেকে বুঝলে টা কি?’

উত্তর দিল সমরেশ, ‘বুঝলুম, এ-বাড়িটাকে একটা মস্ত বড় বোমা মেরে গুঁড়িয়ে দেওয়া উচিত। এর রন্ধ্রে রন্ধ্রে পাপ— প্রতি ইঁট কাঠে বিষ।’

দময়ন্তী চিন্তিত মুখে বলল, ‘হুঁ! কেমন যেন মনে হচ্ছে পাপের ঘড়া পূর্ণ হয়েছে, যবনিকা পতনের আর বোধহয় বেশি দেরি নেই।’

শিবেন চাবি দিয়ে গাড়ির দরজা খুলতে খুলতে বলল, ‘অর্থাৎ? আপনি সন্দেহ করছেন ব্যাপারটা নেহাতই নোংরামো নয়? এর মধ্যে আরও ব্যাপার আছে?’

‘আছে।’ উত্তরটা দময়ন্তী দিল না, দিল অন্য একটি কণ্ঠস্বর। সবাই চমকে উঠে ফিরে তাকিয়ে দেখল, কখন যেন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন অমৃতপ্রভা। ‘ব্যাপার আছে। তবে আপনারা ওই মেয়েছেলেটার ঘরে গিয়েছিলেন কি সেই ব্যাপারের সন্ধানে, না নোংরামোর খোঁজে?’

শিবেন এগিয়ে এল। কঠিন কণ্ঠে বলল, ‘আপনি বোধহয জানেন না মিসেস রায়চৌধুরী, আমি পুলিশ। কীসের খোঁজে, কার কাছে, কখন আমি যাতায়াত করে থাকি, তার কৈফিয়ৎ আমি সাধারণ লোককে দিতে বাধ্য নই। আপনি দয়া করে নিজের চরকায় তেল দিন, তাহলে আপনারই মঙ্গল।’

অমৃতপ্রভার কণ্ঠস্বর এক পর্দা উঠল, ‘আমাদের কীসে মঙ্গল, তা আপনাকে বোঝাতে হবে না। কী জানেন আপনি? জানেন, ওই হারামজাদির প্রতি রাত্রে একটা পুরুষ হলে চলে না, তিন-চারজন দরকার হয়? তখন যে কী হল্লা হয়, তার খবর রাখেন?’

সমরেশ চোখ কপালে তুলে বলল, 'বলেন কী? অর্জি?'

অমৃতপ্রভার গলা আর এক পর্দা উঠল, 'অর্জি নয়তো কী? আমার ভাইটাকে তার নিজেরই বাড়ি থেকে তাড়ানোর কম চেষ্টা করেছ? মাতলামো, বেলেল্লাপনা, বদমায়েশি, কী নয়? নিজের স্ত্রী পাশের ঘরে বেশ্যাবৃত্তি করছে, এটা কতদিন একজন সহ্য করতে পারে?'

সমরেশ পূর্ববৎ জিজ্ঞেস করল, 'বেশ্যাবৃত্তি? বলেন কী? টাকা-পয়সা নিয়ে?'

আর এক পর্দা উঠল, 'টাকা-পয়সা নিয়ে ছাড়া কি? সুযোগসুবিধে, গহনাপত্র— এসব তো আছেই। হীরালালের মতো ছেলেকে পর্যন্ত ছলাকলায় ভুলিয়েছে। শুনতে পাচ্ছি, হীরালাল নাকি ওকে সিনেমায় চান্স দেবে। হীরালালকে আমি খুন করে ফেলব।'

দময়ন্তী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'তা আপনি পারেন।' তারপর শিবেনের দিকে চেয়ে বলল, 'চলুন শিবেনবাবু, যাওয়া যাক। আমাদের আর এখানে প্রয়োজন নেই।'

১১

পরদিন রোববার। সমরেশ বাজার করে এসে হাত মুখ ধুচ্ছিল, এমন সময় দরজার ঘণ্টি বেজে উঠল। বাথরুম থেকেই দময়ন্তীর অপ্রসন্ন গলা শোনা গেল, 'কী প্রয়োজন আপনার, বলুন?'

সমরেশ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে বসবার ঘরে এসে ঢুকল। দরজায় কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয়ভূষণ বিনীত হাস্যে দাঁড়িয়ে। বললেন, 'আমার অপরাধ নেবেন না দয়া করে। আমি দূত মাত্র। আর জানেন তো, দূত অবধ্য?' শ্যালকের মতো অতটা না হলেও ইনিও বেশ বাক্যবাগীশ।

সমরেশ হেসে বলল, 'আপনাকে কেউ বধ করবে না, এ গ্যারান্টি আপনাকে দেওয়া হল। আপাতত কী সংবাদ সেটুকু জানা যাক।'

বিনয়ভূষণ অনাহূতই ঘরের মধ্যে ঢুকে এলেন। একটা সোফায় বসে বললেন, 'হ্যাঁ, এই যে বলি। তা আপনারা দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন!'

দময়ন্তী পূর্ববৎ অপ্রসন্ন মুখে বলল, 'এখন এই সকালবেলায় তো আমার বসবার সময় নেই। আমার রান্না আছে। আপনি বরং সমরেশের সঙ্গে কথা বলুন।'

বিনয়ভূষণের হাসিটা একটু ক্ষীণতর হল বটে, কিন্তু একেবারে মিলিয়ে গেল না। বললেন, 'না, না,সে তো বটেই। এখন তো কাজেরই সময়। তবে আমি খুব অল্প সময় নেব।'

'বেশ, তাহলে চট করে সেরে ফেলুন।'

'দেখুন, আমার সংবাদ প্রেরক দুজন। একজন আমার শ্যালক, অপরজন গৃহিণী। শ্যালক আপনাদের জানাতে বলেছেন যে, গতকাল রাত্রে আবার চোর এসেছিল এবং তিনি সেটা টের পান আজ ভোরবেলা ঘরের জানলা খোলা দেখে। আমি বেরোনো পর্যন্ত কোনো জিনিস খোয়া গেছে বলে জানা যায়নি, আমার স্ত্রী এখনও সব কিছু মিলিয়ে মিলিয়ে দেখছেন। ভালো কথা, পঞ্চা চলে যাওয়ায় অন্য একটি ভালো চাকর না-পাওয়া পর্যন্ত আমরা ওই বাড়িতেই আছি।'

এই পর্যন্ত বলে বিনয়ভূষণ চুপ করে শ্রোতা দুজনের মুখের দিকে তাকালেন, বোধহয় কোনো প্রশ্ন আশা করেছিলেন। কিন্তু দুজনেরই নির্বিকার মুখ দেখে আবার শুরু করলেন, 'দ্বিতীয় সংবাদ পাঠিয়েছেন আমার স্ত্রী এবং তার দায়িত্ব আমার তো নয়ই, আমার শ্যালকেরও সম্ভবত নয়।'

বাধা দিয়ে দময়ন্তী বলল, 'তাহলে সেটা আপনার স্ত্রী এসে বললেই ভালো হত না?'

'আমার স্ত্রী এসে বলবেন না। আর যেহেতু আমি তাঁর অর্ধাঙ্গ এবং তাঁরই অর্থে পালিত, অতএব তিনি আমাকেই পাঠালেন। আমি বলা আর তাঁর বলা একই ব্যাপার।'

দময়ন্তী হতাশ হাসি হেসে বলল, 'আচ্ছা, আপনার শ্বশুরবাড়ির সবাই তো তাঁদের ইজ্জৎ নিয়ে ভয়ানক ব্যস্ত। আপনি তেমন নন বোধহয়, তাই না?'

ম্লান হেসে ভদ্রলোক বললেন, 'ওদের টাকা আছে, তাই ওদের ইজ্জৎ আছে। আমার টাকা নেই— থাকলে কী হত বলা যায় না।'

'বেশ, আপনার স্ত্রীর কী বলবার আছে, বলে ফেলুন তাহলে।'

'হ্যাঁ। উনি আপনাদের জানাতে বলেছেন যে, যদিও গতরাত্রের চোর আসা নিয়ে তাঁর ভাই খুবই ভয় পেয়ে গেছেন, তথাপি আচার্য পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ হিসেবে তিনি আপনাদের ওপর আর এই ঘটনার দায়িত্বভার রাখতে দিতে চান না। আজ পর্যন্ত এই তদন্ত চালানোর জন্য যা টাকা-পয়সা আপনাদের খরচ হয়েছে, সেটুকুর একটা বিল দিলে তাঁর ভাই তৎক্ষণাৎ সেটা মিটিয়ে দেবেন।'

দময়ন্তী রাগ করতে গিয়েও হেসে ফেলল। বলল, 'আপনার স্ত্রীকে বলে দেবেন, আমি প্রফেশনাল ডিটেকটিভ নই। পরিচিত বা অসহায় কেউ বিপদে পড়লে, তাকে একটু সাহায্য করি মাত্র। আমি যদি আগে জানতুম যে, অরবিন্দবাবুর আপনার স্ত্রীর মতো একজন সহায় আছেন, তাহলে আমি ও-বাড়ির ত্রিসীমানা মারাতুম না।'

ছদ্ম-বিরক্তিতে মুখ বিকৃত করলেন বিনয়ভূষণ। বললেন, 'আপনি কী নেন না? হায় হায়! সেটা আগে জানলে তো আমার গিন্নিই আপনাকে বাড়ির ত্রিসীমানা মাড়াতে দিতেন না। যদি বলতেন, আমার ফি চার হাজার টাকা, তাহলে নির্ঘাৎ বসবার জন্য চৌকি এগিয়ে দিতেন, এমনকী এক গেলাস শরবতও হয়তো কপালে জুটে যেত।' বলে উঠে দাঁড়ালেন।

বিনয়ভূষণ বিদায় নিয়ে চলে গেলে দময়ন্তী বলল, 'আজ পর্যন্ত যত কটা কেস করলুম, এরকম নোংরা আর অর্থহীন কেস একটাও পাইনি। অরবিন্দবাবুর চোর যে-উদ্দেশ্যেই যাতায়াত করুক না কেন, আমি আর তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। আমার রীতিমতো গা-ঘিনঘিন করছে।'

সমরেশ সর্বান্তকরণে কথাটা সমর্থন করল।

দ্বিতীয় পর্ব

তার পরের দিন দোসরা অক্টোবর। সমরেশের আদেশ ছিল বেলা আটটার আগে যেন ওকে ডাকা না হয়। কিন্তু হায়, মানুষ ভাবে এক আর হয় আর এক।

সকাল সাতটার সময় টেলিফোনটা তীক্ষ্ন ব্যাকুল শব্দে বেজে উঠল। রান্নাঘর থেকে দৌড়ে এল দময়ন্তী। সমরেশ বিছানা থেকে হেঁকে বলল, 'যে-ই ফোন করে থাক, আমার

হয়ে তাকে খুবসে গালাগাল করে দিয়ো।' বলে পাশ ফিরে পুনরায় ঘুমোতে গেল।

কিন্তু দময়ন্তীর আর্তনাদ শুনে আর ঘুমোনো গেল না। 'কে? রেবেকা আচার্য?' দময়ন্তী যেন কথাগুলো ছুড়ে ছুড়ে দিচ্ছিল টেলিফোনটার ভেতরে, 'আচ্ছা, ঠিক আছে, আসুন।' বলে শেষ করল।

খাটের ওপর উঠে বসেছিল সমরেশ। জিজ্ঞেস করল, 'কে ফোন করেছিল? রেবেকা আচায্যির কি হয়েছে?'

দময়ন্তী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'বলেছিলুম না, তোমার আচায্যিবাড়ির পাপের ঘড়া পূর্ণ হতে আর বেশি দেরি নেই? বোধহয় শেষ অঙ্কের অভিনয় শুরু হয়ে গেল। রেবেকা খুন হয়েছে, রাইফেলের গুলিতে। পুলিশ তোমার অরবিন্দদা-কে গ্রেপ্তার করেছে, অকাট্য প্রমাণ নাকি পাওয়া গেছে। শিবেনবাবু আসছেন। এলে বিস্তারিত শোনা যাবে। আর জামাকাপড় পরে তৈরি থাকো। আমাদের নাকি যেতেই হবে।'

পনেরো মিনিটের মধ্যে শিবেনের জিপ এসে গেল। ততক্ষণে সমরেশ রেডি, দময়ন্তী প্রায় রেডি।

সমরেশ বলল, 'ওই বাড়িটাতে তুই আবার আমাদের যেতে বলিস?'

'কী করব?' শিবেন বলল, 'অরবিন্দ আচার্য আমাদের অনুরোধ করেছেন তোর গিন্নিকে নিয়ে যাওয়ার এবং তদন্তে অংশগ্রহণ করবার। আমরা অফিসিয়ালি সে অনুরোধ অনুমোদন করেছি।'

'বেশ করেছ, মানে, ডুবিয়েছ।'

শোবার ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এল দময়ন্তী। বলল, 'ভালোই করেছেন শিবেনবাবু। এর শেষটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, সেটা জানার বেশ কৌতূহল ছিল। চলুন, যাওয়া যাক।'

২

গাড়িতে উঠে দময়ন্তী বলল, 'এটা কীরকম হল শিবেনবাবু? এরকম তো কথা ছিল না!'

শিবেন বলল, 'আপনার তদন্তে কী বেরোবে জানি না, কিন্তু আমার এখন ধারণা যে কথাটা গোড়াগুড়ি এরকমই ছিল। এর আগে আপনি একদিন প্রশ্ন তুলেছিলেন যে, পাশের ঘরে স্বামী বিকট আর্তনাদ করলেও স্ত্রী আসেন না কেন আর অরবিন্দ আচার্যের পুলিশের প্রতি অদৃষ্টপূর্ব অ্যালার্জিই বা কেন? এর উত্তর আমার বোধহয় প্রথমত স্বামী আদৌ চিৎকার করেননি, দ্বিতীয়ত, এই জটিল দীর্ঘায়িত ষড়যন্ত্র থেকে পুলিশের ছায়া পর্যন্ত যত দূরে রাখা যায়, ততই ভালো।

'ওই হতভাগার পেয়ারের অরবিন্দদার কথাবার্তা শুনে আমি প্রথমেই বলেছিলুম যে এসব আদিখ্যেতা। আমি খুন হলুম, আমি খুন হলুম, বলে চ্যাঁচামেচি করে সাধারণ লোকের দৃষ্টিটা অন্যদিকে নিয়ে গেলুম, আর সকলের সহানুভূতিতে ঘোলাটে দৃষ্টির সুযোগ নিয়ে নিজেই একটা প্রাণ নষ্ট করে ফেললুম। এরকম ঘটনা আমাদের দেখা আছে। আসলে চোর-ফোর সব ভাঁওতা।'

'ঘটনাটা কী ঘটেছে?' দময়ন্তী প্রশ্ন করল।

'রেবেকা আচায্যি নিহত হয়েছেন। আজ সকাল ছটার সময় পঞ্চার মা পাশের বাড়ির অর্থাৎ হীরালালের বাড়ির কম্পাউন্ডের ভেতরে যায় কিছু ফুল পাড়তে— এদিকে তো

গাছপালা বলতে কিছু নেই। তখন দুই বাড়ির মাঝে লোহার দরজাটার মুখে রেবেকাকে মৃত অবস্থায় আবিষ্কার করে। রাইফেলের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে, রাত দুটো থেকে তিনটের ভেতরে। রাইফেলটা পাওয়া গেছে অরবিন্দদার ঘরের ঠিক নীচে, মাটির ওপর।'

'আঙুলের ছাপ?'

'কিছু নেই। অরবিন্দের ঘরে পাওয়া গেছে একজোড়া দস্তানা আর একটা টেলিস্কোপিক সাইট।'

'অরবিন্দ কী বলছেন?'

'বলছেন যে উনি কিছুই জানেন না।'

'রাইফেলটা কার?'

'ওঁদেরই। বয়েস কালে ভাইবোন দুজনেই ভালো শ্যুটার ছিলেন।'

'আচ্ছা? এটা তো জানা ছিল না। বোনটিও তো বাড়িতেই আছেন। উনি কী বলেন?'

'উনিও কিছুই জানেন না।'

'হুঁ। হীরালালের বাড়িটা চেক করেছেন?'

'না তো! ও-বাড়ি তো তালাবন্ধ। বলেন তো চাবিটা আবার আনিয়ে নিই?'

'হ্যাঁ, নিন।'

'গুলিটা কীভাবে ঢুকেছে?' সমরেশ প্রশ্ন করল।

'ওপর থেকে নীচে, মানে, গলার একটু নীচ দিয়ে ঢুকে কোমরের কাছে বেরিয়ে গেছে।'

দময়ন্তী জিজ্ঞেস করল, 'কেউ কোনো শব্দ শোনেনি?'

'নাঃ! অরবিন্দ নাকি ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোচ্ছিলেন, অমৃতপ্রভা না কি মোষের মতো ঘুমোন আর বিনয়ভূষণ মাঝরাতে শব্দ একটা শুনেছিলেন বটে, তবে ওঁর মনে হয়েছিল ওটা রাস্তায় টায়ার ফাটার শব্দ, তাই পাত্তা দেননি।'

'গুলিটা পাওয়া গেছে?'

'হ্যাঁ। ফোরেনসিক ল্যাবেরটরিতে ব্যালিটিক এক্সপার্টের কাছে পাঠানো হয়েছে রাইফেল আর গুলি দুটোই।'

সমরেশ বলল, 'আচ্ছা, ভালো কথা, সেদিন তুমি হীরালালবাবুর বাড়ি দেখে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বললে, দুটো রহস্যের সমাধান হয়ে গেল, কী রহস্য?'

দময়ন্তী হেসে বলল, 'ওঃ, তেমন কিছু নয়। দেখলে না, শিবেনবাবুর গাড়ি আর হীরালালবাবুর গাড়ি দুটোই এক মডেলের সাদা ফিয়াট। দূর থেকে দেখলে তফাত বোঝা যায় না। তাইতে বুঝলুম, যিনি আসছিলেন তিনি হীরালালের সঙ্গেই সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছিলেন, নাগেশ্বরের সঙ্গে নয় আর তাঁর ভ্রমের কারণ শিবেনবাবুর গাড়ি, এই আর কী।'

শিবেন বলল, 'মহিলাটি কে বলে আপনার মনে হয়? ল্যাভেন্ডার তো দেখলুম ও-বাড়ির সব কটি মহিলাই মেখে থাকেন।'

দময়ন্তী বলল, 'অরবিন্দবাবুর ঘর থেকে পাঁচিলের দরজাটা দেখা যায়, কারণ ওদিকে কোনো গাছপালা নেই, আর উনি সারাদিন জানলায় বসে। এ অবস্থায় মহিলাটি কে হতে

পারেন, সেটা তো বুঝতেই পারছেন?'

'বুঝলুম', শিবেন বলল, 'রেবেকা'। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে নীরবে গাড়ি চালাতে লাগল।

৩

আচার্য ভবনের সদর দরজার সামনে চত্বরের ওপর একটা মৃতদেহ সাদা চাদর ঢাকা দিয়ে শোয়ানো হয়েছে। পাশেই একটা চেয়ারে বসে আছেন মুহ্যমান অরবিন্দ। বাড়ির মূল চাতালে ওঠবার চওড়া সিঁড়ির একধারে বসে আছেন প্রস্তরমূর্তিবৎ অমৃতপ্রভা, যদিও তাঁর বিশাল চক্ষুদ্বয় মাঝে মাঝেই ভাঁটার মতো বনবন করে ঘুরে যাচ্ছে সকলের ওপর দিয়ে, আর অন্যপাশে বসে আছেন বিনয়ভূষণ, আর একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক। এছাড়া আছে পদমবাহাদুর, কিছু সেপাই, দারোগা ইত্যাদি।

শিবেন জিপ থেকে নেমে বলল, 'মৃতদেহ স্পট থেকে সরিয়ে আনা হয়েছে, কারণ ওখানে তো বেশিক্ষণ রাখা যাবে না। তবে আপনার কোনো অসুবিধে হবে না বউদি, সব অ্যাঙ্গেলেই ছবি তোলা আছে।'

দময়ন্তী ততক্ষণে নেমে পড়েছে। বলল, 'ঠিক আছে, তাতে কোনোই অসুবিধে হবে না।'

'আপনি ডেডবডি পরীক্ষা করতে চান?' শিবেন জিজ্ঞেস করল।

মাথা নাড়ল দময়ন্তী। বলল, 'নাঃ! কী হবে?'

চিন্তিত মুখে বেশ কিছুক্ষণ নীরবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দময়ন্তী, তারপর চটকা ভেঙে বলল, 'শিবেনবাবু, হীরালালবাবুকে একবার টেলিফোন করে আসতে বলবেন?'

শিবেন ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে একজন কনস্টেবলকে ডেকে কী সব বুঝিয়ে বলল। ইতিমধ্যে স্থানীয় দারোগা এগিয়ে এসেছেন, শিবেনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'স্যার উনি কি কাউকে জেরা করবেন?'

'করবেন নাকি বউদি?' শিবেন প্রশ্ন করল।

'করব। তবে তার আগে আপনাদের নেওয়া জবানবন্দিগুলো যদি একবার দেখতে পেতুম তো ভালো হত।'

শিবেনের আদেশে রাইটার কনস্টেবল তাড়াতাড়ি জবানবন্দির খাতাটা এগিয়ে দিল।

৪

প্রথমে শ্রী অরবিন্দ আচার্য। পিতার নাম ঈশ্বর জগদীশ আচার্য, বয়স বিয়াল্লিশ। নিয়মিত রোজগার বাড়িভাড়া আর মুকুন্দপুরের কিছু জমিজমার আয়। হ্যাঁ, নিহত মহিলাটি আমার স্ত্রী। আমাদের দশ বছর আগে বিয়ে হয়েছিল। ওঁর নাম রেবা, পিতা ঈশ্বর সুরপতি চৌধুরী। না, কাল আমার সঙ্গে ওঁর কোনোরকম কথাবার্তা হয়নি, প্রকৃতপ্রস্তাবে গত ন বছর ধরেই ওঁর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক ছিল না। বাক্যালাপ তো ছিলই না। উনি আলাদা থাকতেন। ওঁর রোজগারও ছিল এই বাড়িভাড়া, অন্য কোনো আয় ছিল কিনা বলতে পারব না। আমাদের সম্পর্কছেদের কারণ পারস্পরিক মানসিকতার তফাত, তবে

উনি এ-বাড়িতে থাকতেন আমার বাবার উইলের জোরে। বাবা তাঁর পুত্রবধূকে স্নেহ করতেন, তাই এরকম ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন এবং আমিও তাতে কোনো আপত্তি করিনি। না, ওঁর স্বভাব-চরিত্র কেমন ছিল তা আমার জানা নেই। উনি গভীর রাত্রে পাশের বাড়িতে কেন যাচ্ছিলেন, তা আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। হ্যাঁ, আমার শোবার ঘরের জানলা দিয়ে ওঁকে গুলি করে মারা সম্ভব, কিন্তু আমি পক্ষাঘাতগ্রস্ত। আমার বাবার উইলের জোরে উনি এ-বাড়িতে বসবাস করছেন বলে আমার বিরক্তির বা উষ্মার কারণ হবেন কেন? সম্পত্তি? রেবার মৃত্যুর পর তো স্বাভাবিক ভাবেই আমার বাবার সম্পত্তি তাঁর দৌহিত্রের কাছেই ফিরে যাচ্ছে। অস্বস্তি? কিছু নয়। সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের লোকেরা কি পাশাপাশি ফ্ল্যাটে থাকে না? তারা কি পরস্পরকে খুন করে থাকে? হ্যাঁ, রাইফেলটা আমার, আমি এককালে বেঙ্গল শ্যুটিং ক্লাবের মেম্বার ছিলাম। ওটা ওখানে কী করে গেল, আমার তা জানা নেই। হ্যাঁ, এই দস্তানা জোড়া আমার, শীতকালে আমার হাত-পা ফোলে, তখন দস্তানা আর গরম মোজা পরে থাকা ডাক্তারের আদেশ। হ্যাঁ, চিনি, এটা রাইফেলের টেলিস্কোপ। আমার খাটের নীচে কী করে গেল, তা আমি কী করে বলব? এটা থাকে আমার ওয়ার্ডরোবে, সেখানে রাইফেলটাও থাকত। হ্যাঁ, আমি ভালো করেই ভেবে দেখেছি। আমি কাল সারা রাত ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়েছি, কোনো কিছুই শুনিনি।

দ্বিতীয়, শ্রীমতী অমৃতপ্রভা রায়চৌধুরী। স্বামীর নাম বিনয়ভূষণ রায়চৌধুরী, ঠিকানা গোবিন্দ মিত্রের গলি, শ্যামবাজার। আমি অরবিন্দের দিদি। গত কয়েকদিন যাবৎ আমরা এ-বাড়িতে আছি আমার ভাইকে দেখাশোনা করবার জন্য, কারণ ওর চাকর পালিয়ে গেছে। সাহায্য করবার কেউ না থাকলে ওর খুব অসুবিধে হয়। হ্যাঁ, ওর সঙ্গে রেবার কোনো সম্পর্ক ছিল না তা আমি জানি, তবে সম্পর্ক না থাকার কারণ আমার মনে নেই। মনে না থাকাই স্বাভাবিক, কারণ সে প্রায় দশ বছর আগেকার কথা, কোনো একটা কারণে মনোমালিন্য হয়েছিল হয়তো, যার ফলে সম্পর্ক ছেদ হয়। পরে ছেদটা থেকেই যায়, কারণটা মনে থাকে না। ডিভোর্স হয়নি, তার কারণ তখনও হিন্দু কোড বিল পাশ হয়নি, যখন হয় তখন আমার ভাই শয্যাশায়ী। আমার বাবা উইল করে এ-বাড়ির অর্ধেক রেবাকে দিয়ে যান— সম্ভবত উনি রেবাকে খুব স্নেহ করতেন। রেবার মৃত্যুর পর এ-বাড়ি কে পাবে আমি জানি না, উইল আমি দেখিনি। রেবার স্বভাব-চরিত্র কেমন ছিল, তা আমি কেমন করে জানব? আমার সঙ্গেও ওর কোনো সম্পর্ক ছিল না। রেবা মদ্যপান করত কিনা, আমি জানি না। রেবার শোবার ঘরে আমি কোনোদিন ঢুকিনি, কাজেই ওর ঘরে জোড়া খাট কেন, তা আমার জানবার কথা নয়। হ্যাঁ, রাইফেলটা আমি চিনি, ওটা আমার বাবার ছিল। হ্যাঁ, আমি আর আমার ভাই, দুজনেই রাইফেল চালাতে জানি। না, কাল রাতে আমি কোনো শব্দই শুনিনি, আমার ঘুম অত্যন্ত গভীর। না, গত তিরিশ বছর আমি রাইফেল চালাইনি। শ্বশুরঘর করতে গিয়ে কোনো মেয়ে রাইফেল চালায়, একথা কখনও শুনেছেন? হ্যাঁ, আমার একটি ছেলে আছে, সে গত বছর খড়গপুর থেকে পাশ করে বেরিয়েছে। না, চাকরি পায়নি, ওকে বিলেত পাঠানোর চেষ্টা হচ্ছে।

তৃতীয়, শ্রী বিনয়ভূষণ রায়চৌধুরী। পিতা ঈশ্বর বিমলভূষণ রায়চৌধুরী, বয়স আটচল্লিশ। সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল, কিছুদিন অধ্যাপনাও করেছিলেন। এখন ব্যাঙ্কে কিছু টাকা আছে আর পেনশনের আয়ে চলে যায়। না, রেবাকে আমি ভালো চিনতুম না। মাঝে মাঝে দেখেছি, এই পর্যন্ত। আশা করি বুঝতেই পারছেন, শ্যালকের পরিত্যক্ত স্ত্রীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতার সম্ভাবনা কম ছিল। হ্যাঁ, আমি রাইফেল চালাতে পারি। হ্যাঁ, কাল রাত্রে একটা দড়াম করে শব্দ শুনতে পেয়েছিলুম, তবে মনে হয়েছিল রাস্তায় কোনো গাড়ির

টায়ার ফাটল, তাই...। হ্যাঁ, সেনাবাহিনীতে ছিলুম, আর টায়ার ফাটার আওয়াজ আর রাইফেলের আওয়াজের তফাত বুঝিনে? কিন্তু আধো ঘুমের মধ্যে শব্দটা শুনেছিলুম, তাই ভালো বুঝতে পারিনি। তখন কত রাত খেয়াল করিনি।

চতুর্থ শ্রীযজ্ঞেশ্বর আদক। পিতা ঈশ্বর জগন্নাথ আদক, ঠিকানা গৌরাঙ্গ ঘাট, বজবজ। বয়স একান্ন। হ্যাঁ, মৃতাকে আমি চিনি, চিনি মানে মুখ চিনি, আর কী। না, কোনোদিন ওঁর সঙ্গে আমার বাক্যালাপ হয়নি। হ্যাঁ, আমি জানতুম উনি আচার্যবাবুর স্ত্রী, তবে ওঁদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক ছিল না, তাও জানতুম। আচার্যবাবু সন্দেহ করতেন যে ওঁর চরিত্র ভালো ছিল না, সেই জন্য সম্ভবত ওঁদের মধ্যে মেলামেশা ছিল না। একথা আমাকে কেউ বলেননি, আমার একরকম ধারণা। মিসেস আচার্যর বাড়িতে লোকজন কারা আসতেন বা না আসতেন, তা নজরে রাখার কথা আমার কোনোদিনই মনে হয়নি। সারাদিন ওই গুদোমের অন্ধকার ঘুপচির মধ্যে বসে থাকি, পাঁচটা বাজলে বাড়ি চলে যাই। আমি জানিনে কিছুই। না, আমি জীবনে কোনোদিন বন্দুক ছুঁইনি।

পঞ্চম শ্রীপদমবাহাদুর থাপা। পিতা বীরবাহাদুর থাপা। বয়স আটত্রিশ। হ্যাঁ, আমি রাইফেল চালাতে জানি। আমি কয়েক বছর গুর্খা রেজিমেন্টে ছিলাম। মিসেস আচার্যকে আমি চিনতুম,খুব ভালো লোক ছিলেন। আমার স্ত্রী লছমী তাঁর কাছে কাজ করত। উনি মাঝে মাঝে পাশের বাড়ি যেতেন। কেন যেতেন আমি জানি না। কাল উনি কখন গেছেন আমি জানি না, লক্ষ করিনি। সন্ধ্যে ছটার পর আদকবাবু ঘরে তালা লাগিয়ে চলে গেলে পর আমি গাড়িবারান্দার নীচে টুল পেতে বসি। না, কাল আমি সারারাত ছিলুম না। আটটার সময় ছুটি নিয়ে আমার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম, ফিরি রাত বারোটায়। আমায় ছুটি দিয়েছিলেন বড়দিদি। হ্যাঁ, মিসেস আচার্যর বাড়িতে লোকজন আসতেন, তাঁদের আমি চিনি না। কেউ কেউ রাত্রিবেলাও আসতেন, কখন যেতেন তার কোনো ঠিক ছিল না। না, কাল রাত্রে আমি কোনো শব্দ শুনিনি।

ষষ্ঠ, লছমী। স্বামীর নাম শ্রীপদমবাহাদুর থাপা। বয়স আটাশ। আমি মিসেস আচার্যর কাছে কাজ করতুম। উনি খুব ভালো মনিব ছিলেন। খুব হাসিখুশি মানুষ ছিলেন, ভালো গান গাইতেন, ভালো সেতার বাজাতেন। ওঁর অনেক বন্ধুবান্ধব ছিল, তাঁরা মাঝে মাঝে আসতেন, তবে তাঁদের আমি বড়ো একটা দেখিনি, তাঁদের সামনে আমার বেরোনো নিষেধ ছিল। তা ছাড়া রাত নটার পর আমার ছুটি হয়ে গেলে আমি নীচে চলে যেতুম, ঘরে গিয়ে রান্না করতুম। না, কাল বিশেষ কোনোই ঘটনা ঘটেনি, কারোর সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটির কথাও আমি জানি না। হ্যাঁ, উনি রোজই মদ্যপান করতেন, সাধারণত সন্ধ্যেবেলা। মাঝে মাঝে বেসামালও হতে দেখেছি। হ্যাঁ, উনি মারা যাওয়াতে আমার খুবই দুঃখ হয়েছে।

৫

দময়ন্তী খাতা বন্ধ করল। শিবেনকে জিজ্ঞেস করল, 'পঞ্চুর মাকে জেরা করেননি কেন?'

শিবেন বলল, 'জেরা করতে গিয়েছিলুম, কিন্তু সে এমন বদ্ধ কালা আর এমন উলটোপালটা কথা বলে যে সেসব আর টুকিনি। তার দিন-রাত্তির, উত্তর-দক্ষিণ, কোনো জ্ঞানই নেই।'

দময়ন্তী চিন্তিত গম্ভীর মুখে সাদা চাদরে ঢাকা মৃতদেহটার দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ বলে উঠল, 'শিবেনবাবু, রেবেকার পায়ে জুতো নেই কেন? নাকি

খুলে রেখেছেন?'

শিবেন বলল, 'জুতো ছিল না, বোধহয় খালি পায়েই গিয়েছিলেন। নিঃশব্দে যেতে হয়েছিল তো!'

'পায়ের দিকের চাদরটা একটু সরান তো?'

চাদরটা সরাতে একজোড়া মরালশুভ্র পা অনাবৃত হল। দময়ন্তী এক নজর পায়ের তলাটা দেখে শিবেনকে বলল, 'দেখুন।'

শিবেন দেখে গম্ভীর হল। বলল, 'হুঁ, পায়ের তলাটা ময়লা হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তা তো নয়। আচ্ছা, এ তো হতে পারে,গুলি খেয়ে পড়ার পর পা থেকে জুতোজোড়া খুলে যায় এবং কোনো কুকুর সেটা মুখে করে অন্যত্র নিয়ে গেছে।'

'হতে পারে।' দময়ন্তী বলল, 'একটু খুঁজে দেখবেন?'

'দেখছি।' বলে শিবেন একজন কনস্টেবলকে ডেকে কীসব আদেশ করল।

দময়ন্তী ততক্ষণে নীচু হয়ে চাদরটা আর একটু ওপরে তুলে দিয়েছে। বলল, 'দেখুন'।

'কী?' শিবেন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'শাড়িটা।'

'শাড়িটার কী হয়েছে? গাঢ় সবুজ রঙের সিল্কের শাড়ি।'

'তা তো বটেই। শাড়িটা উলটো করে পরা রয়েছে।'

'সে কী? আমি তো বুঝতে পারিনি!'

'হ্যাঁ, এটাও আমার লাইন তো। আপনার পক্ষে বোঝা একটু কঠিন।'

'বেশ, তা না হয় হল। কিন্তু এর থেকে আপনি কী অনুমান করছেন? তাড়াতাড়িতে উনি উলটো করে শাড়ি পরেছেন, এটা হতে পারে তো?'

'পারে হয়তো।' দময়ন্তী মৃদু হাসল।

খড়খড় করে মেন গেটটা খোলবার শব্দ হল। একটা সাদা ফিয়াট ভেতরে ঢুকে একটু এগিয়ে এসে দাঁড়াল। দরজা খুলে নেমে এলেন সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরা চম্পালাল হীরালাল।

দময়ন্তী, সমরেশ আর শিবেন, তিনজনে একসঙ্গে গাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল। হীরালাল সহাস্যবদনে বললেন, 'ব্যাপার কী মিস্টার সেন? হঠাৎ এরকম জরুরি তলব কেন? আপনারা তিনজনেই উপস্থিত, শ্যুটিং সংক্রান্ত কিছু নাকি?'

শিবেন মাথা নাড়ল। বলল, 'শ্যুটিংই বটে! কাল রাত্রে মিসেস আচার্য ওয়াজ শট টু ডেথ।'

'না!' আর্তনাদ করে উঠলেন হীরালাল। 'এ হতে পারে না, মিস্টার সেন, এ হতে পারে না।'

'আমি দুঃখিত মিস্টার হীরালাল।' শিবেন বলল, 'মিসেস আচার্যর মৃতদেহ ওখানে রাখা আছে, একবার দেখে আসতে পারেন।'

হীরালাল ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছেন কিছুটা। মুখের আর্ত-ভাবটা আর নেই, তার জায়গায় একটা শীতল, কঠিন গাম্ভীর্য, চোখ দুটো ছোটো হয়ে এসেছে, চিবুক ঢুকে

গেছে ভেতরে, চোয়ালের দুপাশ থরথর করে কাঁপছে। দাঁতে দাঁত চেপে নিম্ন কণ্ঠে ভদ্রলোক যেন নিজেকে শোনাবার জন্য বললেন, 'নাঃ, আমি দেখতে চাই না। ওই মাগি! ওই কুত্তি আমার জীবনটা বরবাদ না করে দিয়ে ছাড়বে না। আমি প্রতিশোধ নেব। আমি জানি কী করে এর প্রতিশোধ নিতে হয়।' প্রতিটি শব্দের সঙ্গে ঝরে পড়ছে বিষাক্ত অসহায় ঘৃণা আর ক্রোধ।

তিনজন শ্রোতারই কান একদম খাড়া। দময়ন্তী যথাসাধ্য স্বাভাবিক গলায় বলল, 'আপনি কার কথা বলছেন, হীরালালবাবু? আপনি কার ওপরে প্রতিশোধ নিতে চান?'

দময়ন্তীর কণ্ঠস্বর কানে যেতেই যেন হ্যাঁচকা টানে সম্বিৎ ফিরে পেলেন হীরালাল। সজোরে গলা খাঁকারি দিয়ে সাময়িক উত্তেজনাটার শেষটুকু পর্যন্ত যেন বের করে দিয়ে বললেন, 'কীসের প্রতিশোধ? ও একটা কথার কথা বললুম মিসেস দত্তগুপ্ত, ও কিছু নয়। আসলে আমার মাথার ঠিক ছিল না, কাল রাত্রে একটু অধিক পান হয়ে গেছে তো, কী বলতে কী বলে ফেলেছি। তা ছাড়া, আমার পরের ফিলমটায় মিসেস আচার্যর নামার কথা, সব ঠিকঠাক, কদিন পরেই কাজ আরম্ভ হচ্ছে, এখন এই ঘটনায় সমস্ত জিনিসটাই ওলোটপালোট হয়ে গেল। অনেকগুলো টাকার ব্যাপার তো! তা, এই এত সব কারণে একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলুম।'

ইতিমধ্যে কখন যেন বিনয়ভূষণ ওদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। ঘটনার আকস্মিকতার আঘাতে তাঁর দীর্ঘ শরীরটা সামনে ঝুঁকে পড়েছে, সমস্ত মুখে বেদনার স্পষ্ট ছবি।

হীরালালের কথা শেষ হতেই সকলের চোখ পড়ল বিনয়ভূষণের ওপর। চারজনেই কিছুক্ষণ নতমস্তকে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর হীরালালের ভগ্নকণ্ঠে প্রশ্ন শোনা গেল, 'এটা কীরকম হল, বিনয়? বকুল গেল, রেবাও?'

বিনয়ভূষণ খুব নীচু গলায় বললেন, 'কপাল, হীরু, সবই কপাল।' ওঁর চোখে জল চিকচিক করছে।

৬

যজ্ঞেশ্বর আদকের অফিস ঘরটা প্রকাণ্ড, যে কোনো বড়ো কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টরের বুকও ঈর্ষায় কাতর করে তোলবার মতন। কিন্তু আসবাবপত্রগুলো মোটেই আনন্দজনক নয়।

দময়ন্তী খুব সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে বয়সের গাছপাথরহীন চেয়ারটা পর্যবেক্ষণ করল, তারপর ছারপোকার অবস্থান সম্পর্কে প্রায় নিঃসন্দেহ হওয়া সত্ত্বেও হতাশ হয়ে বসে পড়ল। ওর সামনের টেবিলটা চেয়ারটার চেয়েও বয়সে বড়ো, প্রায় প্রাগৈতিহাসিক বলা চলে, তার ওপর একখণ্ড কাচের নীচে তেত্রিশ কোটি দেবদেবী মায় যিশুখ্রিস্টের ছবি পর্যন্ত চাপা দেওয়া আছে। ঘরে আরও দুটি চেয়ার আর একটা নড়বড়ে টুল। সমরেশ বিরাগপূর্ণ দৃষ্টিতে টুলটা দেখে ওর প্রকাণ্ড শরীরটা একটা চেয়ারেই প্রতিষ্ঠিত করল। শিবেন দাঁড়িয়ে রইল।

প্রথমে ডাকা হল হীরালালকে।

হীরালাল দময়ন্তীর উলটো দিকের চেয়ারটা অধিকার করে বসে সকলের দিকে তাকিয়ে একগাল হাসলেন। বললেন, 'হাউ থ্রিলিং! নিন মিসেস দত্তগুপ্ত, আপনার জেরা শুরু করুন।'

‘মিসেস রেবেকা আচার্যকে আপনি কতদিন চেনেন?’ দময়ন্তী শুরু করল।

‘ওর বিয়ের পরদিন থেকেই।’

‘অর্থাৎ?’

‘অর্থাৎ আচার্য পরিবারের সঙ্গে আমার পরিবারের ঘনিষ্ঠতা বহু দিনের। অরবিন্দের বাবা আর আমার বাবা বন্ধু ছিলেন, বোধহয় তাঁদের বাবারাও ছিলেন।’

‘আর আপনি কি অরবিন্দের অন্তরঙ্গ বন্ধু?’

‘না। আমাদের দুজনের একটা বিষয়ে চমৎকার আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে— আমি ওকে দুচক্ষে দেখতে পারি না, আর ও-ও আমাকে দুচক্ষে দেখতে পারে না।’ বলে হাসলেন হীরালাল।

‘কেন?’

‘আমি মনে করি অরবিন্দ পণ্ডিতম্মন্য, বাকসর্বস্ব, অহংকারী, অকর্মণ্য, গণ্ডমূর্খ। আর সেও বোধহয় আমার সম্বন্ধে এই কথাই ভাবে। ও আমার চেয়ে বেশ কয়েক বছরের ছোটো, কিন্তু ওর প্রতি স্নেহ বা প্রীতি দুটোর কোনোটাই আমার কিছুমাত্র নেই।’

‘বিনয়ভূষণকে আপনি কতদিন চেনেন?’

‘বিনয় আর আমি সমবয়সি, এক কলেজে পড়তুম। আমার বাবা-ই অমৃত আর বিনয়ের বিয়ের ঘটকালি করেছিলেন।’

‘রেবেকাকে কে খুন করে থাকতে পারে বলে আপনার মনে হয়?’

‘রেবেকার বহু সন্দেহজনক চরিত্রের বন্ধুবান্ধব ছিল। ও যদিও লেখাপড়া জানত, বাজনা জানত, যথেষ্ট কালচারড ছিল, তা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে একগাদা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান জুটিয়ে এনে ফুর্তি করত। ও ছিল বলতে পারেন এক ধরনের স্কিজোফ্রেনিয়াক। তা, ওর সেই বন্ধুরা যে কেউ খুন করতে সিদ্ধহস্ত না হলেও পিছপা নয়।’

‘পুলিশ সন্দেহ করছে, অরবিন্দবাবু হত্যাকারী। আপনার কী মনে হয়, উনি এরকম কাজ করতে পারেন?’

‘কেন পারবে না? না পারার আছেটা কী?’

‘কাল রাত্রে আপনি কোথায় ছিলেন?’

‘কাল রাত্রে? কত রাত্রে? ধরুন, সন্ধ্যায় ছিলুম সামুরাই বারে, হুইস্কি খাচ্ছিলুম। সঙ্গে ছিল রাজেশ ওয়াধওয়া। সেখান থেকে গেলুম মিস্টার অ্যালেন বেকারের বাড়ি। সেখানে ডিনার খেলুম। সেখান থেকে আমি আর অ্যালান গেলুম মিস প্রিয়া কাপাডিয়ার বাড়ি, সেখানে একটা লেট নাইট পার্টি ছিল। রাত আড়াইটে নাগাদ মনে আছে আমি হুইস্কি খাচ্ছি, তারপরে আর কিছু মনে নেই। যখন জ্ঞান ফিরল, তখন বেলা প্রায় আটটা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শিবেনবাবুর তলব পৌঁছল।’

‘আপনাকে কারা বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল?’

‘আমার জানা নেই। আমার স্ত্রী বলতে পারবেন।’

‘আপনার দুজন সহনায়িকা যে পর পর নিহত হলেন, এর মধ্যে কি কোনো ষড়যন্ত্রের আভাস পাচ্ছেন আপনি? মানে, আপনার কোনো শত্রু এরকম কাজ করতে পারে বলে কি আপনার মনে হয়?’

‘হুম! এটা একটা নতুন কথা বললেন আপনি। আমার মাথায়ও চিন্তাটা আদৌ আসেনি। তা, এখন তো আপনাকে কিছু বলতে পারছি না। পরে চিন্তা করে জানাব খন। মানে, আমার শত্রুর সংখ্যা তো বড়ো কম নয়!’

‘বেশ, এবার আপনাকে শেষ একটা প্রশ্ন করব, উত্তরটা এড়িয়ে যাবেন না। রেবেকার মৃত্যু সংবাদ শুনে যে মহিলাটির কথা চিন্তা করে আপনি জ্বলে উঠেছিলেন, তিনি কে?’

অস্বস্তির হাসি হেসে উঠলেন হীরালাল। বললেন, ‘ওই দেখ, উত্তেজনার মাথায় কী বলতে কী বলে ফেলেছি, ঠিক কানে গেছে সেটা? আসলে, ব্যাপারটা সেরকম কিছুই নয়। মানে, আমার স্ত্রীর কথা বলছিলুম আর কী।’

‘আপনার স্ত্রী?’

‘হ্যাঁ, আমার স্ত্রী। উনি আমায় অভিশাপ দিয়ে রেখেছেন, যে ওঁর ছাড়া অন্য কোনো মেয়ের ওপর যদি আমার দুর্বলতা কিছু জন্মায়, তবে সে মেয়েটা নির্ঘাৎ মারা যাবে। এখন ব্যাপার হচ্ছে, আমি সিনেমা লাইনের লোক, মাঝে মাঝে দুচারটে মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতো সুন্দরীর সান্নিধ্যে আসতেই হয়। বুঝতেই পারছেন, বয়স হয়েছে, হৃদয়ের তেমন তেমন জোর তো আর নেই। কাজেই কখনো কখনো সান্নিধ্যটা ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। সব সময়েই যে আমারই দোষ তা নয়, অন্যপক্ষেরও অনুমোদন থাকে। তা আমার স্ত্রী সতিসাধ্বী মহিলা, তাঁর অভিশাপ পর পর দুবারই লেগে গেল। সেই জন্যেই ওঁকে গালাগালি করছিলুম আর কী।’

‘হুঁ! আচ্ছা, এ প্রসঙ্গে তাহলে কিন্তু আর একটা প্রশ্ন এসেই যায়। বকুল সাঁতরা আর রেবেকা, এরা দুজন ছাড়া আর কেউ কি আপনার হৃদয়-দৌর্বল্যের কারণ হয়েছিলেন? যদি হয়ে থাকেন, তাঁদের বেলাতেও কি আপনার স্ত্রীর অভিশাপ ফলে গিয়েছিল?’

‘দেখুন, হৃদয় আমার খুবই দুর্বল। এঁরা দুজন ছাড়া আর কেউ সেখানে প্রবেশ করেনি বললে ভয়ানক মিথ্যেবাদী বলে বাজারে আমার বদনাম হয়ে যাবে। তবে হ্যাঁ, এঁদের দুজনের সঙ্গেই আমার সম্পর্ক, যাকে বলে, বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল। এতটা ঘনিষ্ঠতা আর কারোর সঙ্গেই হয়নি।’

দ্বিতীয় এল পঞ্চাননের মা। সে চেয়ারে বসল না, টেবিলের উলটো দিকে দাঁড়িয়ে রইল। দময়ন্তী অনেক অনুরোধ করল, কিন্তু সে ভাবলেশহীন মুখে চুপ করে রইল।

‘তুমি কতদিন এ-বাড়িতে কাজ করছ?’ দময়ন্তী উচ্চকণ্ঠে প্রশ্ন করল।

‘আজ্ঞে?’

‘তুমি কতদিন কাজ করছ?’ শিবেনের চিৎকার বোধহয় শরৎ বোস রোডেও শোনা গেল।

‘আজ্ঞে?’

হতাশ হয়ে শিবেন বলল, ‘দেখলেন তো বউদি, বললুম না বদ্ধ কালা? শুনলেও বোঝে না কিছু।’

দময়ন্তী বলল, ‘হুঁ, কিন্তু গত শনিবার মোটেই বদ্ধ কালা ছিল না। ঠিক আছে, কথা যদি নাই বলে তাহলে পঞ্চা যে খুন করেছিল সেটা লালবাজারে জানাতেই হয়।’

পঞ্চার মা-র শরীরটা থরথর করে কেঁপে উঠল, তারপর হাউমাউ করে বিকট কান্না, ‘ওগো, তোমাদের পায়ে পড়ি, অমন কথা বলো নি গো। আমি এখন কী করি রে বাবা,

কোথায় যাই রে!'

দময়ন্তী বলল, 'আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে। এখন বলো তো, কে তোমাকে কালা-বোবা সেজে থাকতে বলেছে?'

'দাদাবাবুগো। আমায় বলেছে কোনো কথাটি না কইতে। কইলে পঞ্চাকে ধরিয়ে দেবে বলেছে। আমি কোনো কথাটি কইতে পারব নি দিদিমণি, আমায় কইতে বোলো নি গো।'

'আচ্ছা, ঠিক আছ, তুমি যেতে পার।'

তৃতীয় এল পদম।

'তুমি কাল রাতে বারোটায় বাড়ি ফিরে গাড়িবারান্দার নীচে বসে ছিলে, না ঘরে চলে গিয়েছিলে?' দময়ন্তী প্রশ্ন করল।

পদম নীরব।

'জবাব দাও।'

শিবেনের পুলিশি ধমকেও কোনো কাজ হল না।

'তুমি কি আচার্যবাবুর কাছ থেকে কোনো মাইনে পাও?' দময়ন্তী আবার প্রশ্ন করল।

পদম নীরবে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল।

'তুমি কাজে ফাঁকি দিলে কে তোমাকে গালাগালি করেন? আচার্যবাবু, না তাঁর বোন?'

'দুজনেই।' অস্ফুট স্বরে জবাব এল।

'ঠিক আছে। তুমি যাও।'

৭

'এবার কাকে ডাকব, বউদি?' শিবেন জিজ্ঞেস করল।

'আর কাউকে আপাতত নয়।'

'ব্যস?'

'ব্যস!'

'তাহলে বলুন এবার, কাকে সন্দেহ করলেন?'

'সব্বাইকে।'

'কীরকম?'

'অরবিন্দ, অমৃতপ্রভা, বিনয়ভূষণ, পদম, লছমী, হীরালাল মায় যজ্ঞেশ্বর আদক।'

'বলেন কী? একমাত্র পঞ্চাই বাদ দেখছি।'

'যা বলেছেন, একমাত্র পঞ্চাই বাদ।' দময়ন্তী গম্ভীর হল।

'কেন? পঞ্চা বাদ কেন?'

'কারণ পঞ্চানন বোধহয় বেঁচে নেই।'

'আপনার তাই মনে হয়? আমার কিন্তু তা মনে হচ্ছে না।'

'আপনার মনে হয় ওকে কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন অরবিন্দ? কোথাও গা ঢাকা দিয়ে থাকতে বলেছেন, গোলমাল মিটে গেলেই আবার সে উদয় হবে?'

'ঠিক তাই।'

সমরেশ বলল, 'দ্যাখ, তুই যে একেবারে স্থির নিশ্চিত হয়ে বসে আছিস যে অরবিন্দদাই খুনি, সেটা বোধহয় খুব ঠিক হচ্ছে না। ওঁর ঘরের নীচেই বন্দুক, ওঁর ঘরের নীচেই মৃতদেহ, ওঁর খাটের নীচে দস্তানা, আর রাইফেলের টেলিস্কোপিক সাইট, সমস্ত জিনিসগুলোই বড়ো স্পষ্টভাবে অরবিন্দদাকেই নির্দেশ করছে না? অরবিন্দ আচার্য গাধা নন, খুনখারাবি করতে গেলে আর একটু সাবধান হতে পারতেন না কি? আমার তো মনে হচ্ছে, কেউ এই খুনের দায়িত্বটা ওঁর ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করছে।'

শিবেন বলল, 'তুই ঠিকই বলেছিস। শুধু তুই কেন, তোর চেয়েও গবেট কেউ থাকলে সেও এ-কথাই চিন্তা করত। তিনিও জানেন যে তার মতো সকলেই এ অবস্থায় চিন্তা করবে যে, খুনটা কেউ ওঁর ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করছে। কাজেই নিজেই নিজের খাটের নীচে দস্তানা আর টেলিস্কোপ রেখে, বন্দুকটা জানলার নীচে ফেলে আর চোরের গালগল্প তৈরি করে এরকম একটা সিচুয়েশন তৈরি করেছেন। সফলও হয়েছেন বলতে হবে কারণ তোরই দৃষ্টি যখন ওঁর ওপর থেকে সরে কোনো অদৃশ্য আততায়ীর দিকে যাচ্ছে, তখন তো অন্যে পরে কা কথা। কী বলেন, বউদি?'

'আমি কিছুই বলি নে', দময়ন্তী বলল, 'আমি তো বললুম, আমি সকলকেই সন্দেহ করি। আমার সামনের সূত্রগুলি নির্দেশ করছে যে, সকলেরই একসঙ্গে বা আলাদা আলাদা ভাবে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য যথেষ্ট মোটিভ আছে। আরও সূত্র না পেলে আমি আপনার মতো স্থির নিশ্চয় হতে পারছি না, এমনকী কোনো থিয়োরিও খাড়া করতে পারছি না।'

'আর একটু বিশদ করে বলুন। সবাইকে সন্দেহ করছেন কেন?'

'প্রথম ধরুন, অরবিন্দবাবু। তাঁর গিন্নির ওপর মারাত্মক আক্রোশ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু কতগুলো কারণে তাঁর সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ হতে পারছি না। প্রথমত, সমরেশ যে কারণগুলো বলল, সেগুলো। দ্বিতীয়ত, গত আট বছরে তিনি গৃহিণীকে ঘর ছাড়া করবার অনেক চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কখনো প্রাণে মারবার চেষ্টা করেননি, রেবেকার সাক্ষ্যও তাই বলে। আজ হঠাৎ কী ঘটল যে আমাকে ডেকে এনে, স্টেজ সাজিয়ে, ঘরের সামনে বন্দুক আর খাটের নীচে দস্তানা ফেলে, এত ঘোরপ্যাঁচ করে তিনি কর্মটি করতে গেলেন? তৃতীয়ত, তাঁর ইগো পর্বতপ্রমাণ, কিন্তু তিনি উন্মাদ নন, বরং যথেষ্ট স্থিরমস্তিষ্ক। হঠাৎ রাগের বশে খুন করবেন, তা তো ননই, বরং বলব তিনি ঠিক খুন করবার টাইপই নন। আর রেবেকা যাই বলে থাক না কেন, তাঁর অসুস্থতা সন্ন্যাসরোগজাতই, সিফিলিস থাকতে পারে কিন্তু সিফিলিটিক প্যারালিসিস-এর একটা লক্ষণ স্মৃতিভ্রংশ— তা তাঁর মোটেও নেই। তাঁর সঙ্গে আমাদের প্রথম দিনের সাক্ষাৎকারেই স্পষ্ট বোঝা গেছে তাঁর অতীতের স্মৃতি মোটেই ম্লান হয়নি। কাজেই এহেন একটা অসুস্থ লোকের পক্ষে চল্লিশ-পঞ্চাশ ফুট দূরের একটা মুভিং অবজেক্টকে গুলি করে মারা আমার সম্ভব বলে মনে হয় না। তবে হ্যাঁ, তাঁর একজন শাগরেদ থাকতে পারে, তিনি অমৃতপ্রভা, বিনয়ভূষণ, পদম, যজ্ঞেশ্বর, যে কেউ হতে পারেন।

'এর পর ধরুন, অমৃতপ্রভা। ভয়ানক পসেসিভ মহিলা, হীরালালকে এখনও তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি বলে মনে করেন। সেই হীরালালের সঙ্গে রেবেকার মাখামাখি দেখে তাঁর মাথায় যে খুন চেপে গেছে, সে-কথা তো তিনিই বলেছেন। কিন্তু এই ইতরপ্রকৃতি, তপ্তমস্তিষ্কের

মহিলা ঠান্ডা মাথায় খুন করেছেন নানারকম প্যাঁচালো প্ল্যান করে, বিশেষত তাঁর ভাইকে এর মধ্যে জড়িয়ে, এটা মেনে নেওয়া কঠিন।

তৃতীয়ত, বিনয়ভূষণ। ভদ্রলোক স্ত্রীর অন্নে প্রতিপালিত, তাঁর ছেলে পাশ করে বেকার বসে আছে, এ অবস্থায় রেবেকাকে খুন করলে ইনডাইরেক্টলি তাঁর লাভ। রেবেকার সম্পত্তি তাঁর ঘরেই তো যাচ্ছে।'

সমরেশ বলল, 'বিনয়ভূষণের রক্তে যদি নরহত্যা করবার এলেমই থাকত, তাহলে বহুদিন আগেই তিনি গিন্নিকে গলা টিপে মেরে ফাঁসি গিয়ে গাজি হতেন।'

দময়ন্তী বলল, 'ঠিক কথা। এর পর ধরুন হীরালাল। তাঁর সঙ্গে রেবেকার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। এখন, প্রেমের ব্যাপার, অবশ্য একে যদি প্রেম বলেন, সেখানে কোথায় কী গেরো হয়ে আছে, কে জানে? সেই গেরোর ফেরেই হয়তো এই হত্যাকাণ্ড। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এটা প্রেম কি? হীরালাল গত আট বছর ধরেই রেবেকাকে চেনেন, তার প্রতি লোভও হয়তো তাঁর ছিল, কিন্তু ঘনিষ্ঠতা হয়েছে সম্প্রতি, তাও সম্ভবত রেবেকারই আগ্রহাতিশয্যেই, কারণ হীরালাল তাকে সিনেমায় নামাবেন। অতএব এই ঘনিষ্ঠতা যতটা ব্যবসায়িক, ততটা হৃদয়ঘটিত নয়। তাহলে রেবেকাকে খুন করে হীরালালের লাভ কী? আমরা জানি না। তবে এটুকু জানি যে, বকুল সাঁতরাও একই অবস্থায় নিহত হয়। বকুল আর রেবেকার একমাত্র যোগসূত্র কি হীরালাল?

'তবে, একটা খটকা লাগছে এই যে, মূলত হীরালাল স্মাগলার, সিনেমার প্রযোজনা করে কালো টাকা সরাবার একটা রাস্তা। এখন, লোকে খুন করে চূড়ান্ত মানসিক অব্যবস্থায়, যদি পাগল, পারভার্ট বা পেশাদার খুনি না হয়। এক্ষেত্রে প্রেমটা যদি বাদ দেওয়া যায়, তাহলে আর কী কারণ থাকতে পারে, যাতে অব্যস্থিতচিত্ত হয়ে হীরালাল তার ব্যবসার বাইপ্রোডাক্ট সিনেমার দু-দুজন সহনায়িকাকে খুন করবে?'

সমরেশ বলল, 'মনোবিদ্যার তুমি কতটুকু জান আমি জানি না, কিন্তু ওই যে পারভার্ট বললে না, হীরালাল তো সেরকম কিছু হতে পারেন? শুনেছি, অনেক লোক এদিকে বাইরে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, অথচ ভেতরে কোনো বিশেষ অবসেশন বা আবেশে ভোগেন। এই আবেশ যে শুধু যাকে বলে রিরংসা বা ঈর্ষা থেকে উদ্ভূত হয় তা নয়, অনেক সময় এগুলো সহজাতও হতে পারে। যেমন ধর, জ্যাক দি রিপার। সে কেবল বেশ্যা খুন করে বেড়াত। কিংবা ধর, বস্টন স্ট্র্যাংগলার। সে কেবল বুড়ি মারত।'

শিবেন বাধা দিয়ে বলল, 'তুই বলতে চাইছিস যে, হীরালালের ওই আবেশ না কী বললি, সেটা কেবল সিনেমার সহনায়িকাদের ওপর? দ্যাখ, ইয়ার্কির একটা সীমা আছে। আপনি ওর লেকচারে কান দেবেন না তো বউদি। বলুন, হীরালালের পরে আর কে?'

মৃদু হেসে দময়ন্তী আবার শুরু করল, 'এর পর ধরুন, পদম আর যজ্ঞেশ্বর। পদম তো রাইফেল চালাতেই জানে, যজ্ঞেশ্বরও হয়তো জানেন তবে মিথ্যে কথা বলছেন। এখন, রেবেকার যেরকম ক্ষুধার্ত, জ্বলন্ত নারীত্ব ছিল, যার আঁচ সমরেশ কিছুটা পেয়েছিল, তাতে তার পক্ষে এদের মাঝে মাঝে নিজের শয্যায় ডেকে নেওয়া অসম্ভব ছিল না। সেক্ষেত্রে একটা তীব্র হৃদয়ঘটিত নাটক গড়ে ওঠাই সম্ভব। আমরা হয়তো সেই নাটকেরই শেষ অঙ্কের অভিনয় দেখলুম। এখন, এই থিয়োরিটায় কল্পনার পরিমাণ এবং হয়তোর সংখ্যা এত বেশি যে আরও খোঁজ খবর না করলে কোনরকম স্থির সিদ্ধান্তে আসা চলে না।'

দময়ন্তী চুপ করল। শিবেন অনেকক্ষণ ধরে মাথা নীচু করে গভীর মনোযোগের সঙ্গে নিজের বুটের ডগাটা পর্যবেক্ষণ করল, তারপর বলল, 'চমৎকার! দিব্যি একজনকে খুনি

সাব্যস্ত করে নিশ্চিন্ত হয়েছিলুম, আপনি সর্বাংশে আমার মগজটা গুবলেট করে দিলেন। এখন মনে হচ্ছে, গুষ্টি শুদ্ধু সবাইকে গ্রেপ্তার করে লকআপে পুরে দিই।'

সমরেশ বলল, 'করলে খুব অন্যায় করবি না। আমার বিশ্বাস, আমাদের যতই গুবলেট হোক না কেন, এরা প্রত্যেকেই কিন্তু জানে কে খুনি। দ্যাখ না, প্রত্যেকের জবানবন্দি কারকম চাপা চাপা! রেবেকাকে প্রায় চিনতুমই না, তার স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে কিছুই জানি না। যত সব ন্যাকামো। পাশের ঘরে থাকেন অথচ কিছু জানেন না, এহেন স্টেটমেন্ট যখন সকলেই করছে, তখন মনে হচ্ছে, এরা সব কিছু জানে এবং প্রত্যেকেই কোনো না কোনো ভাবে এর সঙ্গে জড়িত। তুই সব কটাকে ধরে লকআপে ঢুকিয়ে দে, ঠান্ডি দাওয়াইও দিতে হবে না, সুড়সুড় করে কথা বেরিয়ে আসবে, দেখিস।'

হঠাৎ ঘরের বাইরে একটা চাপা ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা গেল, 'আমায় ছেড়ে দাও, যাও তুমি!' গলা অরবিন্দের।

শিবেন তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরোতে যাচ্ছিল, কিন্তু দরজার কাছে বাধা পেল। দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছেন অরবিন্দ, তাঁর জরাগ্রস্ত মুখ বর্ণনাতীত ঘৃণায় বিকৃত। তাঁর গলায় চাপা কর্কশ গলায় ব্যাঙ ডেকে উঠল, 'সমরেশ! তোমাদের এখানে ডেকে আনা হয়েছিল আমার স্বার্থরক্ষার জন্য, আমার পরিবারের সবাইকে জেলে ঢোকানোর পরামর্শ দিতে নয়। শিবেনবাবু, এঁদের আমার প্রয়োজন নেই, আপনি এঁদের যেতে বলুন।'

'আপনার প্রয়োজন না থাকতে পারে, আমাদের আছে।' অরবিন্দের কথার পিঠে বলল শিবেন, 'আপনি ওঁকে আসতে বলেছিলেন তদন্তে অংশগ্রহণ করবার জন্য, আপনার স্বার্থরক্ষার জন্য নয়। এবং শুধু আপনি নন, আমরাও রাষ্ট্রের তরফ থেকে ওঁকে অনুরোধ করেছি প্রকৃত অপরাধীকে খুঁজে বের করতে আমাদের সাহায্য করতে। এতে যদি আপনার স্বার্থ রক্ষিত না হয়, তার জন্য ওঁকে এখান থেকে চলে যেতে বলতে পারি না। স্বার্থরক্ষার জন্য বহু উকিল বা পেশাদার উকিল রয়েছে, আপনি তাদের সাহায্য নিতে পারেন।'

ব্যাঙ এবার আরও ক্রুদ্ধ। গর্জন হল, 'এটা আমার বাড়ি শিবেনবাবু।'

শিবেন অত্যন্ত শান্ত গলায় বলল, 'এক্ষেত্রে সেটা একটা নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় তথ্য, অরবিন্দবাবু।'

অরবিন্দ রক্তাক্ত দৃষ্টিতে সবার দিকে তাকালেন, সে-দৃষ্টিতে অসহায় জিঘাংসা ঝরে পড়ছে। তারপর যখন পেছন ফিরে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হলেন, দময়ন্তী মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'বাইরে আপনার সঙ্গে কে ছিলেন, অরবিন্দবাবু?'

অরবিন্দ নাটকীয় ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ালেন। ব্যঙ্গ আর ঘৃণা মিশ্রিত কুৎসিত হাসিতে বিকৃত মুখে বললেন, 'সে কী, মিসেস ডিটেকটিভ! সেটা আপনি এখনও বুঝে উঠতে পারেননি? তাহলেই হয়েছে আপনার এই হত্যাকাণ্ডের মীমাংসা!' বলে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

শিবেন চিৎকার করে বলল, 'সেটা বার করা কঠিন হবে না, মিস্টার আচার্য।' বলে একলাফে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ফিরে এল পরমুহূর্তেই।

'কে ছিল সঙ্গে?' সমরেশ জিজ্ঞেস করল।

'যজ্ঞেশ্বর আদক। বুড়োর দোস্ত।'

দময়ন্তী শূন্য দৃষ্টিতে সামনে চেয়ে বসে ছিল। শিবেন প্রশ্ন করল, 'এবার কী করতে চান?'

'রেবেকার জুতোজোড়ার খোঁজ চাই আর রেবেকা আর বকুল সাঁতরার অতীতের যতটা সম্ভব ডিটেলের।'

'বেশ তাই হবে। আপাতত তাহলে বাড়ি যাই, চলুন।'

৮

'জুতোজোড়া পাওয়া গেছে বউদি।' একটা সাদা প্লাস্টিকের ব্যাগ দেখিয়ে শিবেন ঘোষণা করল।

'কই, দেখি!' দময়ন্তী শিবেনের হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে ভেতর থেকে একজোড়া মেয়েদের জুতো বার করল। জুতোই, চটি নয়। উঁচু হিলওয়ালা, যেরকম মেমসাহেবরা পরে থাকে। জুতোটার ওপরে লাল স্ট্র্যাপ, হিলটা সাদা চামড়া দিয়ে মোড়া।

'কোথায় পেলেন?' দময়ন্তী প্রশ্ন করল।

'বাড়ির বাইরে ফুটপাথের ধারে ডাস্টবিনের পেছনে পড়ে ছিল। কুকুরে টেনে নিয়ে গেছে যে বলেছিলুম, অন্যায় কিছু বলিনি। কাল খুঁজে পাইনি, কারণ বাড়ির বাইরে তো আর খুঁজিনি। আজ একজন কনস্টেবল হঠাৎ দেখতে পায়। এই দেখুন, এই স্ট্র্যাপটাকে কীভাবে চিবিয়েছে ব্যাটা কুকুর।'

দময়ন্তী বলল, 'হুঁ, জুতোটা খুব দামি, সম্প্রতি কেনা হয়েছিল। আচ্ছা, এটা যে রেবেকার জুতো সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত?'

'একদম। লছমী আইডেনটিফাই করেছে।'

'বেশ। এই স্ট্র্যাপটা কুকুরে চিবিয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু দুটো জুতোরই পেছনের স্ট্র্যাপগুলো সোলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে সেলাই ছিঁড়ে, লক্ষ করেছেন? কেন?'

'দেখেছি। ব্যাপারটা সন্দেহজনক তা ঠিক, কিন্তু মেয়েদের জুতো তো হরবখত ছিঁড়ছে। আমাদের পাড়ার মুচিটা তো দেখি প্রায় মেয়ে খদ্দেরদের জন্যেই টিকে আছে।'

হাসল দময়ন্তী। বলল, 'আর হিলের পেছনে এই লম্বা লম্বা আঁচড়ের দাগ? এগুলো তো কুকুরের দাঁতের দাগ নয়।'

'না, তা নয়।' শিবেন গম্ভীর হল। জুতোজোড়া ভালো করে উলটেপালটে দেখে বলল, 'আপনি বলতে চাইছেন, কেউ মৃত রেবেকার বগলের নীচে হাত দিয়ে হিড়হিড় করে টেনে সরিয়েছিল? তাইতে এই আঁচড়ের দাগ আর ছেঁড়া স্ট্র্যাপ? কিন্তু কোথায়? যেখানে বডি পড়ে ছিল, সেখানে তো কোনোরকম টানাহ্যাঁচড়ার দাগ পাইনি।'

'ওখানে পাওয়ার সম্ভানা কম।' দময়ন্তী অন্যমনস্কভাবে বলল, 'দেখি, রেবেকার ফোটোগুলো, এনেছেন?'

'হ্যাঁ, এই যে।' শিবেন একটা ব্রিফকেস থেকে একটা পেটমোটা সাদা খাম বের করল।

প্রথম ফোটোটা হীরালালের বাড়ির দিক থেকে তোলা। চিৎ হয়ে পড়ে আছে রেবেকা, চোখ দুটো খোলা, প্রাণহীন। তার শরীরের আধখানা পাঁচিলের দরজার এপাশে, পা দুটো

ওপাশে। দ্বিতীয় ছবিটা অরবিন্দের বাড়ির দিক থেকে তোলা, বাঁ হাটুটা সামান্য ভাঁজ করে পাশে ছড়ানো বোঝা যাচ্ছে।

শিবেন বলল, 'কিছু বুঝলেন ছবিগুলো দেখে?'

'বুঝলুম।' দময়ন্তী বলল।

শিবেন বলল, 'হ্যাঁ, রেবেকা অভিসার শেষে বাড়ি ফিরছিল। দরজা খুলে নিজের বাড়ির কম্পাউন্ডে ঢোকা মাত্র ওপর থেকে গুড়ুম। গুলির ধাক্কায় উলটে পড়ে গেল মেয়েটা, পা থেকে জুতো খুলে গেল। মোটামুটি বলা যায় এরকম?'

'বলা হয়তো যায়, কিন্তু তার আগে বলুন হীরালাল কাল যা যা বলেছেন তার সবই কি সত্যি?'

গম্ভীর হয়ে শিবেন বলল, 'হ্যাঁ, সত্যি। হীরালাল পরশু রাত্রে ওখানে ছিল না।'

'তাহলে রেবেকা অত রাত্রে কার কাছ থেকে ফিরছিল?'

শিবেন অনেকক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর নিতান্ত অনিচ্ছায় বলল, 'নাগেশ্বর?'

দময়ন্তী জবাব দিল না, চিন্তিত মুখে চুপ করে রইল।

অফিস থেকে ফিরে সমরেশ নিমীলিত চোখে ফুলকপির শিঙাড়া চিবুতে চিবুতে কথোপকথন শুনছিল। এখন মুখ না খুলে আর পারল না। বলল, 'দেখ শিবেন, রেবেকার মধ্যে দুটো ভাগ ছিল আমরা জানি, যাকে হীরালাল বললেন স্কিজোফ্রেনিয়া। একটা ভাগ শিক্ষিত, মার্জিত রুচি, রসিক। অন্য ভাগটা বন্য, ক্ষুধার্ত, ওভারসেক্সড। হয়তো দ্বিতীয় ভাগেরই প্রভাব ছিল বেশি। এখন, বিশ্বামিত্র খিদের জ্বালায় কুকুরের মাংস খেতে গিয়েছিলেন ঠিকই, তাই বলে যতই ক্ষুধার্ত হোক না কেন, রেবেকা নিত্যি অভিসারে গিয়ে নাগেশ্বরের সঙ্গে ইয়ে করবে, এটা ভাবা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, তাই নারে?

শিবেন বলল, 'সত্যি কথা। তবে কেবল নাগেশ্বর কেন, অন্য কেউও তো হতে পারে? হীরালালের কোনো বন্ধুবান্ধব। হীরালালের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আছে, এই মওকায় অন্য কেউ হয়তো ঘনিষ্ঠতা করে নিচ্ছে নাগেশ্বরকে হাত করে।'

'অর্থাৎ তুই বলতে চাইছিস, নাগেশ্বর ঘুষ খেয়ে তার মনিবের বাড়িটাকে কুঞ্জবনে পরিণত করে তার দরজায় পাহারা দিচ্ছে? এটা ভাবাও একটু বাড়াবাড়ি। কারণ, নাগেশ্বর এখনও টেম্পোরারি, পার্মানেন্ট হবে যখন এ-বাড়িতে পাকাপাকি বসবাস আরম্ভ করবে। তা ছাড়া হীরালালও কখন যে তার কুঞ্জকুটিরে ভাবাকুললোচনাদের সঙ্গে নিয়ে এসে হাজির হবেন বলা শক্ত। এ অবস্থায় নাগেশ্বর কখনো এ-ধরনের রিস্ক নিতে পারে না। এটা যদি কোনো শর্ট ডিউরেশন-এর কাজ হত তো একটা কথা ছিল।'

মাথা নেড়ে সমরেশের কথা সমর্থন করল দময়ন্তী। বলল, 'এর পর দ্বিতীয় প্রশ্ন। বন্দুকধারী আততায়ী, অর্থাৎ অরবিন্দ, দাঁড়িয়ে আছেন দোতলার জানলায়। আমরা দেখেছি, দরজাটায় পৌঁছোতে হলে রীতিমতো একটা সুঁড়িপথের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। তাহলে সবুজ শাড়ি পরা রেবেকা দরজার কাছাকাছি আসার অনেক আগেই আততায়ীর দৃষ্টিপথ থেকে আড়ালে চলে গেছে। তাহলে প্রায় কুড়ি গজ দূর থেকে আততায়ীকে সবুজ শাড়ি পরা রেবেকাকে অন্ধকার দরজার সামনে এসে দাঁড়ানো মাত্র গুলি করতে হয়, তাই না?'

‘কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন বউদি, অরবিন্দ চ্যাম্পিয়ান শ্যুটার আর অস্ত্রটা টেলিস্কোপিক রাইফেল।’

‘ভুলিনি, কিন্তু এও ভুলিনি যে তখন রাত প্রায় দুটো। আচ্ছা, আমরা যদি কল্পনা করি যে দুজন লোক মৃতা রেবেকাকে ধরাধরি করে দরজা পর্যন্ত নিয়ে এনে ফেলেছে, ওর হাত দুটো দুপাশে ছড়িয়ে ঝুলছে বলে কম বেশি তিন ফুট চওড়া দরজার ওপাশে নেওয়া যায়নি আর সেই জন্যে তাড়াহুড়োয় ওখানেই ফেলে গেছে, তাহলে ব্যাপারটা অনেক বেশি সম্ভাব্য হয় না?’

সমরেশ বলল, তা হয়। তবে ঘটনাটা বড্ড সোজা আর সাধারণ হয়ে যায়।’

‘হবে নাই বা কেন? সব ঘটনাই জটিল করে ভাবতে হবে, তার কী মানে আছে? রাইফেল দিয়ে গভীর রাতে প্রায় শব্দভেদী গুলি ছুড়লুম, রাইফেল থেকে টেলিস্কোপ খুললুম, রাইফেলটা জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিলুম আর টেলিস্কোপ আর দস্তানা খাটের নীচে লুকিয়ে রাখলুম যাতে সেগুলো পুলিশের হাতে পড়ে— সমস্ত অপারেশনটাই ভয়ানক জটিল হয়ে যাচ্ছে না?’

শিবেন কাষ্ঠ হাসি হাসল। বলল, ‘অরবিন্দ আচার্যকে চিনতে আপনার দেরি আছে বউদি। এইসব বনেদি ইলাস্ট্রাস পরিবারের ছেলেরা যে কতদূর জটিল হতে পারে, সে-সম্বন্ধে আপনার কোনো ধারণা নেই। যাক, আপনার কথায় বুঝতে পারছি, আপনার মনে হয় হত্যাকাণ্ড হীরালালের বাড়িতে হয়েছে, তাই না? রেবেকাকে কেউ হীরালালের নাম করে ডেকে পাঠাল, রেবেকা এসে বাড়ির ভেতর উঠোনে দাঁড়ানো মাত্র হত্যাকারী দোতলার বারান্দা থেকে গুলি করল, তারপর মৃতদেহটা শাগরেদের সাহায্যে টানতে টানতে এনে পাঁচিলের দরজার গোড়ায় ফেলে রেখে গেল, এই আপনার বক্তব্য?’

দময়ন্তী স্মিতমুখে ওপরে-নীচে মাথা নাড়ল। বলল, ‘হ্যাঁ, প্রায় এই রকমই। এই ফোটোগ্রাফটা দেখে হত্যাকাণ্ডটা কোথায় হয়েছিল, সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় বটে।’

শিবেন বলল, ‘বেশ, তাই যদি হয়, তাহলে নাগেশ্বরকে হয় হত্যাকারী নয়তো তার সহকারী বলে প্রায় নিঃসন্দেহে চিহ্নিত করা যায়। তাহলে ঘটনার দিন নাগেশ্বরের গতিবিধি সম্পর্কে খোঁজ নিতে হয়, কী বলেন? নাকি ওকে অ্যারেস্ট করে ফেলব প্রথমেই। বাড়িটাতে গিয়ে তো কোনো লাভ হবে না, কারণ সূত্রগুলো নিশ্চয়ই সঙ্গে সঙ্গে ধুয়ে মুছে সাফ করে ফেলেছে।’

দময়ন্তী বলল, ‘খোঁজখবরটা আগে নিয়ে নেওয়াই ভালো। যদি আজ পর্যন্ত ও পালিয়ে গিয়ে না থাকে, তাহলে কালও পালাবে না।’ বলতে বলতে দময়ন্তী খামটা থেকে আর একটা ফোটো বের করল। ‘আরে, এটা আবার কার ছবি?’ দময়ন্তীর প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে সমরেশও ছবিটার ওপর ঝুঁকে পড়ল।

ছবিটি একটি মেয়ের। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ‘অনিন্দ্যসুন্দর দেহলতা, বহে সকল আকাঙক্ষার পূর্ণতা,’ এ মেয়েটিরও তাই। টাইট কুর্তি-পাজামা পরে পায়ের ওপর আলগোছে পা রেখে সেতার বাজাচ্ছে, যৌবন যেন ফেটে পড়ছে। পেছনে একটা বিছানার চাদর ঝুলিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড করা হয়েছে, চাদরটা আবার একপাশে ছেঁড়া। সামনে একটা ফুলদানিতে একগুচ্ছ ফুল।

শিবেন বলল, ‘ইনিই বকুল সাঁতরা, শকুন্তলা নামে সিনেমায় নেমেছিলেন। হাওড়ায় বাড়ি। বাবা হাওড়ার বুকিং ক্লার্ক, পাঁচ ছেলে তিন মেয়ে। অবস্থা তো বুঝতেই পারছেন।

বকুল ছিল সবচেয়ে বড়ো। লেখাপড়া হয়নি, তবে গান বাজনায় ভালো ছিল। টাকার জন্য সিনেমায় নেমেছিল। রূপ তো ছিলই, আর হীরালাল যা বলতেন, লোভও বেশি ছিল।'

দময়ন্তী একদৃষ্টে ছবিটা দেখছিল। যখন চোখ তুলে তাকাল, তখন ওর দৃষ্টি এক অদ্ভুত রহস্যময় আলোয় উজ্জ্বল। সমরেশ ও দৃষ্টি চেনে। চাপা উত্তেজিত গলায় বলল, 'কী হল? ছবিটায় কিছু পেলে?'

'পেলুম।' দময়ন্তী সনিশ্বাসে বলল, 'যেন ওর মনের গুরুভার জটিলতাটা কেটে গেছে।

'কী?'

'একটা যোগসূত্র। বকুল, রেবেকা, নাগেশ্বর সবার। শিবেনবাবু, নাগেশ্বরকে বোধহয় আপনাকে এক্ষুনি আটকে ফেলতে হবে। আর অরবিন্দ আচার্যকে দিতে হবে স্পেশাল প্রোটেকশন, কারণ এর পরের আঘাতটা বোধ হয় ওঁর ওপর আসবে।'

শিবেন কী যেন বলবার জন্য মুখ খুলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই ক্রিং ক্রিং করে টেলিফোন বেজে উঠল। শিবেন তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে টেলিফোন ধরল, 'হ্যাঁ, আমি শিবেন সেন কথা বলছি।' তারপর কিছুক্ষণ অত্যন্ত গম্ভীর নীরবতার শেষে 'আচ্ছা, ঠিক আছে।' বলে ফোনটা রেখে দিল। দময়ন্তীর দিকে ফিরে বলল, 'আপনার সন্দেহই ঠিক। পঞ্চা নিহত হয়েছে। ওর মৃতদেহ রামপুরের কাছে রেললাইনের ধারে পাওয়া গেছে।'

দময়ন্তীর মুখ কঠিন হয়ে উঠল। বলল, 'আর দেরি করা ঠিক নয়, শিবেনবাবু। এক্ষুনি নাগেশ্বরকে গ্রেপ্তার করা দরকার। নাগেশ্বরই যে অরবিন্দের ঘরের দিকে নজর রেখেছিল, সে তো প্রথম দিন ওর কথাতেই বুঝতে পেরেছিলুম, কিন্তু দেখছি আমার সন্দেহটা ঠিক যে তার লক্ষস্থল শুধু অরবিন্দই ছিলেন না, ছিল পঞ্চাও।'

শিবেন আবার টেলিফোন তুলে নিল। একটা নম্বর ডায়াল করতে করতে বলল, 'লোকাল থানার ওসিকে চিঠি পাঠাচ্ছি, আমিও যাচ্ছি। আপনারাও চলুন বউদি, শেষটা দেখা যাক।'

দময়ন্তী বলল, 'চলুন। তবে নাগেশ্বর কিছু শেষ নয়, প্রায় শেষ বলতে পারেন।'

৯

গাড়ি চালাতে চালাতে শিবেন বলল, 'হুম। এখন মনে হচ্ছে বটে যে, অরবিন্দকে আর যাই হোক, পঞ্চার মৃত্যুর জন্য দায়ী করা চলে না। আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, কোনো উপায়েই তাঁর পক্ষে পঞ্চাননকে খুন করে রামপুরে ফেলে রেখে আসা সম্ভব নয় যদি না কোনো শাগরেদ না থাকে। কিন্তু এর তো কোনো মোটিভ নেই। লোকটা অসুস্থ সন্দেহ নেই, আর তার মতো পক্ষাঘাতগ্রস্তের কাছে একজন পুরোনো ট্রেনড চাকরের দাম লাখ পয়জারের চেয়েও বেশি। এখন, যদি অন্য কেউ পঞ্চাকে হত্যা করেই থাকে, তাহলে চোর আসাটাও সত্যি বলতেই হয় যে চোর যেভাবেই হোক, বারংবার বাধা পেয়েও অরবিন্দের ঘরে সন্দেহজনক বস্তুগুলো প্লান্ট করতে আর রাইফেলটা চুরি করতে বদ্ধপরিকর। যেন, তাকে আদেশ করা হয়েছে যে, তুমি ধরা না পড়ে এই মালগুলো অমুক অমুক জায়গায় রেখে আসবে, আর সে-ও, এমনকি পঞ্চার বাধা ভেদ করবার জন্য তাকে নিঃশেষে সরিয়ে দিয়েও, সেগুলো রাখবার চেষ্টা করে যাচ্ছে।'

পেছনের সিট থেকে দময়ন্তী বলল, 'এর মধ্যে একটা বিশেষ প্যাটার্ন আছে, লক্ষ করেছেন?'

আত্মগতভাবে শিবেন বলল, 'হ্যাঁ, আছে বটে।' তারপর হঠাৎ ওর কানদুটো প্রচণ্ড উত্তেজনায় আস্তে আস্তে লাল হয়ে উঠল। ও গাড়ির গতি কমাতে কমাতে একেবারে রাস্তার বাঁ দিকে দাঁড় করিয়ে ফেলল। পেছন ফিরে কম্পিত কণ্ঠে বলল, 'বউদি, আপনার যোগসূত্রটা বোধহয় বুঝতে পেরেছি। কিন্তু কেন? কেন? কীসের জন্য?'

শান্ত গলায় দময়ন্তী বলল, 'ইজ্জৎ!'

১০

হীরালালের বাড়ির ভেতরে গাড়িটা ঢোকাবার মুখেই বাধা পাওয়া গেল। আর একটা সাদা ফিয়াট দাঁড়াল পথ আটকে। ভেতরে হীরালাল। দময়ন্তী বলল, 'যাক, ভালোই হল, হীরালালবাবুকে পাওয়া গেল। ওঁকে আর খবর দেবার দরকার হবে না।'

ইতিমধ্যে হীরালাল গাড়ি থেকে নেমে এসেছেন। বললেন, 'কী ব্যাপার, আপনারাও কি নাগেশ্বরের খোঁজে নাকি? দারোগা শৈলেন কর্মকার তো এখনও ভেতরে বসে আছে। আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছে বুঝি? আপনারা কি শেষপর্যন্ত নাগেশ্বরকে খুনি ঠাওরালেন?'

শিবেন বলল, 'ভেতরে চলুন হীরালালবাবু, কথা আছে।'

গাড়ি দুটো পার্ক করা হল, নেমে এল সবাই। দময়ন্তী বলল, 'নাগেশ্বরকে খুনি ঠাওরানোতে কি আপনার কোনো আপত্তি আছে, হীরালালবাবু?'

'না, না, আমার আপত্তির কী আছে? আপনারা কী হিসেবনিকেশ করেছেন, তা তো আর আমার জানা নেই।'

'নাগেশ্বর কোথায়?'

'দেশে গেছে?'

'বকুল সাঁতরা মারা যাওয়ার পরেও কি এমনি দেশে গিয়েছিল?'

'ও মাঝে মাঝেই দেশে যায়, আবার দিন চার-পাঁচেকের মধ্যেই ফিরে আসে।'

'ওর দেশ কোথায়, জানেন?'

'জানি, আরা জেলার হাসানাবাদ গ্রামে।'

শিবেন চট করে ওসি কর্মকারকে কতগুলো কী নির্দেশ দিল।

হীরালাল কাষ্ঠ হাসি হেসে বললেন, 'যাক, আমার চাকর নাগেশ্বরকেই রেবার খুনি বলে সাব্যস্ত করলেন। কিন্তু কেন খুন করল, সেটা জানতে পারি কি? নাকি সেটা এখনও সাব্যস্ত করে উঠতে পারেন নি?'

'কেন খুন করল, সে-বিষয়ে আপনি কিছু আলোকপাত করতে পারেন না?' দময়ন্তী প্রশ্ন করল।

'আমি? আমি কী করে করব? আমার সঙ্গে পরামর্শ করে তো আর খুন করেনি?'

'ঠিক জানেন আপনি যে, আপনার সঙ্গে কোনো পরামর্শ হয়নি? পুলিশ কিন্তু অন্যরকম সন্দেহ করছে। আপনারই দুজন সহনায়িকা খুন হলেন, একটা খুন আপনারই বাড়িতে

হল, আর আপনি কোনোই আলোকপাত করতে পারছেন না? পুলিশের পক্ষে এটা বিশ্বাস করা কঠিন।' শিবেন চিবিয়ে চিবিয়ে বলল।

গুম হয়ে গেলেন হীরালাল। বিড়বিড় করে বললেন, 'এটা কি বলা বাহুল্য নয় যে, আমার সঙ্গে সত্যিই কোনো পরামর্শ হয়নি? হলে কি আমি আমার বাড়ির ধারে কাছে এই খুন হতে দিতুম?'

'নাগেশ্বর কেন আর্মি থেকে ডিসচার্জড হয়েছিল জানেন?' দময়ন্তী প্রশ্ন করল।

'আগে জানতুম না, সম্প্রতি জেনেছি। ওর বিরুদ্ধে নাকি নানারকম অভিযোগ ছিল— চুরি, আর গোটাকতক চোরাগোপ্তা খুনের। কিন্তু একটাও প্রমাণ করা যায়নি। শেষপর্যন্ত কী একটা সামান্য কারণে ওকে তাড়িয়ে দেয়।'

'নাগেশ্বর যে অরবিন্দের ঘরে চুরি করতে ঢুকেছিল, সেটাও কি সম্প্রতি জেনেছেন?'

'আজ্ঞে না, এই মুহূর্তে জানলুম। অরবিন্দের সেই ফেমাস চোর কি নাগেশ্বর নাকি? আর একটু খোলসা করে বললে ভালো হয়।'

শিবেন বলল, 'চলুন, অরবিন্দবাবুর কাছে যাওয়া যাক। রাত বেশি হয়নি, হয়তো বিরক্ত হবেন না। ডিটেলস ওঁর মুখ থেকে শোনাই ভালো হবে। আপনার গাড়ি এখানেই থাক, আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন। শৈলেন, তুমিও আমাদের সঙ্গে এস।'

১১

আচার্য ভবনের গেট হাঁ-করে খোলা। বাড়ির ভেতরে একতলার চত্বরের সামনে একটা আলো জ্বলছে, আর সব অন্ধকার। প্রথমে মনে হয়েছিল জনমানব কেউ নেই, কিন্তু চত্বরের কাছে এগুতে দেখা গেল একজন দীর্ঘকায় প্রস্তরমূর্তিবৎ মানুষ সদর দরজার মুখে দাঁড়িয়ে আছে। মানুষটি অমৃতপ্রভা। উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে আছেন, কিন্তু কোনো ইন্দ্রিয়ই কাজ করছে বলে মনে হচ্ছে না। এতগুলো লোকের একসঙ্গে হেঁটে আসার শব্দও অনেকক্ষণ শুনতে পাননি। যখন পেলেন, চমকে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। মুহূর্তের মধ্যে একটা আনুষঙ্গিক আতঙ্কে ওঁর চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে গেল। যেন একটা চিৎকার এক ঢোঁকে গিলে ফেলে স্খলিত কণ্ঠে বললেন, 'এ কী! আপনারা? মানে এত রাত্রে?'

শিবেন বলল, 'আমরা অরবিন্দবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

প্রশ্নটা যেন বেশ কিছুক্ষণ বুঝতে পারলেন না অমৃতপ্রভা, তারপর একটা প্রচণ্ড আবেগে ওঁর সমস্ত মুখটা ভেঙেচুরে বিকৃত হয়ে গেল। গলার মধ্য থেকে হাহাকার বেরিয়ে এল, 'খোকা? খোকা আর বেঁচে নেই। মরে গিয়েছে— আত্মহত্যা করছে!' বলে মাটির ওপর বসে পড়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন।

বাকি পাঁচজন এই বিস্ময়ের ধাক্কায় স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সেই বাঁধভাঙা কান্নার ফাঁকে ফাঁকে যেসব অসংলগ্ন কথা বেরিয়ে আসতে লাগল, সেগুলি জোড়াতাড়া দিলে বক্তব্যটা দাঁড়ায় এই যে, এই আত্মহত্যার জন্য দায়ী শিবেন আর দময়ন্তী নামক দুজন ভণ্ড তপস্বী, আর কাউকে না পেয়ে তারা খোকাকেই তার স্ত্রীর হত্যাকারী সন্দেহ করে গ্রেপ্তার করতে গিয়েছিল, সেই পর্বতপ্রমাণ নির্বুদ্ধিতার পরিণাম এই আত্মহত্যা। কারণ কোনো ভদ্রসন্তান এই কুৎসিত অভিযোগের কাদা গায়ে মেখে প্রাণধারণ করতে পারে না, ইত্যাদি।

দময়ন্তী প্রস্তরকঠিন মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। বিড়বিড় করে বলল, 'আমি এরকমই আশঙ্কা করেছিলুম। দেরি হয়ে গেল।'

কান্নার ধমকটা একটু কমলে শিবেন বলল, 'মৃতদেহটা কোথায় আছে, মিসেস রায়চৌধুরী? আমাদের নিয়ে চলুন, পুলিশ হিসেবে আমাদের কর্তব্য করতে দিন।'

অমৃতপ্রভা ওঠবার কোনো লক্ষণই প্রকাশ করলেন না। গেটের দিকে একবার তীর্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আবার নতুন করে কান্না জুড়লেন।

দময়ন্তী জিজ্ঞেস করল, 'বিনয়ভূষণবাবু কোথায়, মিসেস রায়চৌধুরী?'

'ডাক্তার ডাকতে গেছেন।' অমৃতপ্রভা কোনোরকমে বলতে বলতেই সামনের কাঁচে ডাক্তারের পাশে লাল ক্রস লাগানো একটু পুরোনো সিঁত্রো গাড়ি বেশ জোরে গেট দিয়ে ঢুকে চত্বরের ওপর ঘুরে এসে ব্রেক কষে দাঁড়াল।

গাড়ির চালক, যিনি সম্ভবত ডাক্তার, যখন গাড়ির আলো নেভানো, ইঞ্জিন বন্ধ করা প্রভৃতিতে ব্যস্ত, তখন গাড়ির পেছনের সিট থেকে নেমে এলেন বিনয়ভূষণ। রক্তশূন্য ফ্যাকাশে মুখে সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এ কী! আপনারা? কে খবর দিল আপনাদের? হীরু, তুমিই কি এঁদের নিয়ে এসেছ নাকি?'

কাতর মুখে হীরালাল নীরবে মাথা নাড়লেন।

শিবেন বলল, 'মিসেস রায়চৌধুরী, আপনি ডাক্তারবাবুকে ওপরে নিয়ে যান। মিস্টার রায়চৌধুরীর সঙ্গে আমাদের একটু কথা আছে।'

বিনয়ভূষণকে দেখে অমৃতপ্রভার কান্না বন্ধ হয়ে গেছিল, এখন শিবেনের কথায় সজল চোখে আবার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ আগুন জ্বলে উঠল : 'আপনাদের কথা... আচ্ছা, আপনারা কি মানুষ? ওপরে আমার ভাইয়ের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে, আমরা ডাক্তার নিয়ে যাচ্ছি, আর ঠিক তখুনি ওঁকে পথ আটকে আপনাদের কথা বলবার দরকার হয়ে পড়ল? আমাদের কি এখন কথা শোনবার মতো মানসিক অবস্থা?'

শিবেন বিনীতভাবে বলল, 'আপনি যান না, ডাক্তারবাবুকে নিয়ে ওপরে চলে যান। কিন্তু বিনয়বাবুকে আমাদের পক্ষে যেতে দেওয়া ঠিক সম্ভব হচ্ছে না।'

'কেন? যেতে দেওয়া সম্ভব নয় কেন? আমি ওপরে যাব না, ওঁকে না নিয়ে আমি যাব না। আমি জানতে চাই, কী এমন আপনাদের কথা মিস্টার সেন?'

'কথাটা খুব বড়ো কিছু নয়, মিসেস রায়চৌধুরী।' শিবেন পূর্ববৎ বলল, 'আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে মিসেস রেবেকা আচার্য, মিস বকুল সাঁতরা আর পঞ্চাননকে খুন করার ষড়যন্ত্র এবং সেই হত্যাকাণ্ডে যোগদান করবার অভিযোগে আমরা আপনার স্বামীকে গ্রেপ্তার করছি। মিস্টার আচার্যকেও উনি খুন করেছেন কিনা আমরা জানি না, সেটা তদন্তসাপেক্ষ। আপাতত যে কটি অভিযোগ আছে তাই যথেষ্ট। ওঁকে এই মুহূর্তেই এখান থেকে থানায় নিয়ে যাওয়া হবে।'

অমৃতপ্রভার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল, থরথর করে কেঁপে উঠে অসহায় মুখে বিনয়ভূষণের দিকে তাকালেন। বিনয়ভূষণ কিন্তু প্রায় বিকারহীন, যদিও মুখে কোনো কথা বেরোচ্ছিল না। ডাক্তার ভদ্রলোক স্তম্ভিত নেত্রে এই নাটক দেখছিলেন, এখন কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি এখন কী করব, মিস্টার সেন?'

‘আপনি তো বোধহয় এঁদের পারিবারিক ডাক্তার— ডাক্তার সুভাষ গুহ, তাই না? আপনি ওপরে চলে যান। মৃতদেহ পরীক্ষা করুন, গেলাস টেলাসগুলো ছোঁবেন না। যাবার সময় আমাকে রিপোর্ট দিয়ে যাবেন। এঁকে চালান করে দিয়ে আমরা নীচেই আপনার জন্য অপেক্ষা করব, তারপর ওপরে যাব।’

‘বেশ, ঠিক আছে।’ বলে ডাক্তার গুহ কম্পিত পদে বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন।

ডাক্তারের থেকে চোখ ফিরিয়ে শিবেন আবার বিনয়ভূষণের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন। এতক্ষণ অচঞ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন বিনয়ভূষণ অনেকটা মিলিটারি অ্যাটেনশন-এর ভঙ্গিতে। শিবেন মৃদু হেসে বলল, ‘ওয়েল কর্নেল রায়চৌধুরী, আমরা যেতে পারি?’

একটা ফ্যাকাশে নিষ্প্রাণ হাসিতে বিনয়ভূষণের মুখটা বিকৃত হয়ে গেল। বললেন, ‘নিশ্চয়। তবে, যে অভিযোগগুলো করলেন, সেগুলো প্রমাণ করতে পারেন? কী লাভ আমার এদের খুন করে? কেনই বা খুন করব?’

দময়ন্তী শান্ত কণ্ঠে বলল, ‘আপনার ইজ্জৎ যারা নষ্ট করেছিল, তাদের আপনি চরম শাস্তি দিয়েছেন, বিনয়ভূষণবাবু। আমি সত্যিই দুঃখিত। আপনি উচ্চশিক্ষিত, সূক্ষ্ম রসবোধ আছে আপনার, অথচ আপনাকেই এই পৈশাচিক নারকীয় পথটা বেছে নিতে হল। বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে অর্থাভাবে এমন এক স্ত্রীর কুক্ষিগত হয়ে পড়তে হল আপনাকে, যার প্রচণ্ড আত্মাভিমান আর অহংকারের বাধা ভেদ করে হৃদয়ের যোগাযোগ আর করে উঠতে পারলেন না। কিন্তু তখনই কি আপনি তার বয়ঃসন্ধির কীর্তিকলাপের কথা জানতেন? আশা করি, না, কারণ, তা যদি হয় তাহলে বলতে হয় তার হৃদয়ের চেয়ে তার সম্পত্তির দিকেই আপনার নজর ছিল গোড়া থেকেই এবং সেক্ষেত্রে আপনাকে ভদ্রলোক বলতে বাধে। আমার বিশ্বাস, আপনি জানতে পেরেছেন তখন, যখন ঘরে-বাইরে অপমানিত হয়েও আপনি স্ত্রীকে সহ্য করছিলেন, হয়তো তাঁকে আপনার সহ্যও হয়ে গিয়েছিল। সেটা অস্বাভাবিক নয়, কারণ ছেলেবেলায় যে-স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটিয়েছেন, সেটা ফিরে পেতে গেলে, এছাড়া অন্য রাস্তা ছিল না। বাইরের লোক মনে করত আপনার আত্মসম্মানবোধ নেই, ইজ্জৎ একেবারে খুইয়ে বসে আছেন।

‘তারা ভুল মনে করত। আপনার আত্মসম্মান বোধ ছিল অন্যত্র।

‘আপনার প্রথম প্রেম ছিল বোধহয় রেবেকা, তাই না? প্রাণচঞ্চল, শিক্ষিত, সুন্দরী মেয়েটি আপনার কাছে সেতার শিখতে গিয়ে আপনার হৃদয় অধিকার করেছিল। আপনি বন্ধু হীরালালের বাড়িতে গোপনে তাকে সেতার শেখাতেন এবং ...। সে যাই হোক, অধিকারের ব্যাপারটা বোধহয় বাহ্যত উভয়তই ছিল, অন্তত আপনার তাই মনে হয়েছিল। রেবেকাকে আপনি চিনতে পারেননি অথবা চিনতে চাননি। রেবেকা আর যাই হোক না কেন, আপনার সুপ্ত প্রচণ্ড অহংকার বোধটাকে জাগিয়ে দিয়েছিল, সন্দেহ নেই।’

অমৃতপ্রভা এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন, এইবার বাধা দিলেন। ভেজা ভেজা, ভাঙা ভাঙা, কম্পিত গলায় বললেন, ‘কী সব গালগল্প ফেঁদে বসেছেন, মিসেস দত্তগুপ্ত? এই কি এর সময়? আমার ভাই...’

বিনয়ভূষণের কথায় ওঁর স্খলিত কণ্ঠস্বর মিলিয়ে গেল, ‘তুমি চুপ কর। ওঁকে বলতে দাও।’ কথাগুলো প্রাণহীন, উদাস, অন্যমনস্ক। এই প্রথম বিনয়ভূষণ স্ত্রীকে বাধা দিয়েও পার পেয়ে গেলেন, নির্দয় বাক্যবাণে আচ্ছন্ন হলেন না।

দময়ন্তী বলল, 'হ্যাঁ, যা বলছিলুম। আপনার মনের মধ্যে যে আত্মসম্মান জেগে উঠল, তারই সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠল আত্মপ্রত্যয়। সেই আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গেই আপনি এগিয়ে গেলেন আপনার অপর ছাত্রী বকুল সাঁতরার দিকে এবং জয়ও করলেন তাকে। অন্তত আপনার তাই মনে হয়েছিল, যদিও বকুল সাঁতরাকেও আপনি চিনতে পারেননি।

'চিনতে পেরেছিলেন হীরালালবাবু। উনি আমাদের বলেছিলেন, বকুলের লোভ ছিল বড্ড বেশি। আজ বোধহয় রেবেকা সম্বন্ধেও সেই কথাই বলবেন। একথা প্রায় সন্দেহাতীত ভাবে সত্য যে ওরা আপনার কাছে এসেছিল আপন স্বার্থে, অর্থের লোভে আর জৈবিক ক্ষুধার তাড়নায়। আপনি যাদের জয় করেছিলেন বলে অহংকারে স্ফীত হয়েছিলেন, তারা বিজিত হবার জন্যই প্রস্তুত হয়েছিল।

'হীরালালবাবু যখন সিনেমা প্রযোজনা আরম্ভ করলেন, আপনিই বকুলকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে, যাতে সুন্দরী বকুল আরও পয়সা রোজগার করতে পারে, এত পয়সা, যা সেতার বাজিয়ে বা গান গেয়ে রোজগার করা যায় না।

'এটাই আপনার কাল হল। লোভী বকুল অসংকোচে তুলে দিল নিজেকে হীরালালের হাতে। সেটা আবিষ্কার করে আপনার মানসিক অবস্থা কী হয়েছিল অনুমান করতে পারি। আপনার নবজাগ্রত আত্মপ্রত্যয় খোঁচা খাওয়া বাঘের মতো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল।

'কিন্তু তারপরেই এল ভয়ঙ্কর দ্বিতীয় আঘাত। রেবেকাও সিনেমায় কেরিয়ার করার লোভে এগিয়ে গেল হীরালালবাবুর দিকে। হীরালালবাবু সুবোধ গোপাল, তিনি যাহা পান, তাহাই খান।'

হীরালাল আপত্তি করার জন্যই বোধহয় মুখ খুলেছিলেন, কিন্তু আবার কী ভেবে চুপ করে মাথা নীচু করে ফেললেন।

দময়ন্তী বলে চলল, 'এইবার আপনার চোখে অন্ধকার দেখার পালা, আপনার ইজ্জৎ ধুলোয় লুটোচ্ছে। ঈর্ষা বড়ো ভয়ঙ্কর জিনিস, ক্রোধের মতো সেও মানুষকে দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য করে দেয়। কিন্তু ক্রুদ্ধ লোককে দেখলে চেনা যায়, অসূয়াগ্রস্ত লোক আর পাঁচজনের মতোই ব্যবহার করে। সে ছুরি চালায় গোপনে, ক্রুদ্ধ লোকের মতো হাত-পা ছুড়ে নয়। আপনিও এই ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে ছুরি চালালেন, খুন করালেন বকুলকে। আপনার আদেশ পালন করল স্বভাব অপরাধী, সৈন্যবাহিনী থেকে বিতাড়িত নাগেশ্বর। সে আপনার রেজিমেন্টেই ছিল, সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। প্রতিদানে আপনি বন্ধু হীরালালকে বলে তার একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিলেন। অবশ্য এখানে আমার সন্দেহ আছে, হয়তো তার আগেই নাগেশ্বরের চাকরি হয়ে গিয়েছিল।

'যা হোক, আপনি আশা করেছিলেন, বকুলের বীভৎস মৃত্যুর কথা শুনে রেবেকা ইঙ্গিতটা ধরতে পারবে, সামলাবে নিজেকে। কিন্তু উলটে একজন প্রতিদ্বন্দ্বী সরে যাওয়াতে সে আরও উদ্দাম হয়ে উঠল। ওই বাড়ির বহুব্যবহৃত কেলিকুঞ্জ, যেখানে অরবিন্দ থেকে আরম্ভ করে এ-বাড়ির সকলেই অভিসারে গেছেন, সেখানে কিন্তু এবার আপনি অপাঙক্তেয়, ইংরেজিতে যাকে বলে লেফট আউট ইন দ্য কোল্ড।

'ঈর্ষার আগুন, অপমানিত ইজ্জৎ এবার ফেটে পড়ল। রেবেকাকে আপনি ও-বাড়িতে কী বলে আবার নিয়ে গিয়েছিলেন আমি জানি না, হয়তো বলেছিলেন একটা শেষ বোঝাপড়া করতে চান। কিন্তু রেবেকার এই যাওয়াটাই শেষ যাওয়া হল। নাগেশ্বর দোতলার বারান্দা থেকে গুলি করে মারল ওকে। এর আগেই অবশ্য নাগেশ্বর অরবিন্দের ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপানোর ব্যবস্থা করে রেখে এসেছে।'

হীরালাল প্রশ্ন করলেন, 'আপনি যে এত কথা বললেন, সেগুলো প্রমাণ করতে পারবেন?'

দময়ন্তী বলল, 'প্রমাণ করার দরকার হবে না, হীরালালবাবু। বকুল আর রেবেকা যে বিনয়ভূষণবাবুর কাছে সেতার শিখত, ওঁদের মধ্যে যে গাঢ় সম্পর্ক ছিল, তা যে শুধু গুরু-শিষ্যার নিকষিত হেম নয়, নাগেশ্বর যে ওঁর একই রেজিমেন্টে ছিল, প্রভৃতি অনেক কিছুই প্রমাণ করা যাবে এবং তার থেকে সারকামস্ট্যানসিয়াল এভিডেন্সও খাড়া করা যাবে, কিন্তু আমি জানি তার দরকার হবে না। কারণ, বিনয়ভূষণ স্বাভাবিক বা সাধারণ অপরাধী নন — উনি শিক্ষিত, রুচিশীল ভদ্রলোক। এতদিন যে তীব্র মোহে নেশাগ্রস্ত হয়েছিলেন, আজ সেই নেশা কেটে গেছে। আজ উনি নিজের মুখোমুখি হয়েছেন। আমি নিশ্চিত, উনি নিজেই সব কথা স্বীকার করবেন।' বলে দময়ন্তী সোজা বিনয়ভূষণের চোখের ভেতর তাকাল।

বিনয়ভূষণ সম্মোহিতের মতো নিষ্পলক চোখে স্থাণুবৎ দময়ন্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। ওঁর মনের মধ্যে যে কী প্রচণ্ড আবেগের উত্তাল আলোড়ন চলেছে তা বোধহয় একমাত্র জানতে পারল দময়ন্তী। আমাদের মনের জানলা আমাদের চোখ— দময়ন্তী সেই জানলায় কী দেখল সেই জানে।

বাকি সকলে চরম উত্তেজনায় নিষ্পন্দ হয়ে দুজনের দিকে তাকিয়ে ছিল। তাদের সচকিত করে বিনয়ভূষণ বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ, দময়ন্তী। আমি সবই স্বীকার করব। চলুন মিস্টার সেন, আমরা যাই।'

'না, না, না, না!' বিকট চিৎকার করে অমৃতপ্রভা দড়াম করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। একবারও সেদিকে না তাকিয়ে ভাবলেশহীন মুখে সামনে এগিয়ে গেলেন বিনয়ভূষণ।

১২

হীরালাল বললেন, 'নাঃ, দেখছি আমার কোম্পানির পাবলিসিটি অ্যান্ড সেলস ম্যানেজারের পোস্টটা আপনাকেই দিতে হবে। বিনয়কে আপনি যেভাবে কথায় ঘায়েল করলেন, অবিশ্বাস্য।'

সমরেশ বলল, 'হুঁ, হুঁ, আবার সেই ইজ্জতে সুড়সুড়ি। ওতেই কাজ হল। সে-কথা যাক। হ্যাঁ রে শিবেন বিনয়ভূষণ সব কথা স্বীকার করেছেন? নাগেশ্বরকে ধরতে পেরেছিস?'

শিবেন বলল, 'নাগেশ্বরের ঠিকানা বিনয়ভূষণ দিয়েছেন, তাকে ধরতে ফোর্স গিয়েছে। তবে বিনয়ভূষণের স্বীকার করা না-করায় বোধহয় আর কিছু যাবে আসবেনা।'

সবাই একসঙ্গে প্রশ্ন করল, 'কেন, কেন?'

'কারণ, কাল রাত্রে গ্রেপ্তার হয়েছেন আর আজ বেলা দুটোর সময় সিভিয়ার হার্ট অ্যাটাকে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এত মানসিক উত্তেজনা সইতে পারেননি। বাঁচবেন কিনা বলা শক্ত।'

সবাই দুঃখিত মুখে চুপ করে রইল। সমরেশ বলল, 'না, বাঁচাই ভালো। শাস্তি যথেষ্ট পেয়েছেন। একজন শিক্ষিত ভদ্রসন্তান যখন খুন করে, তখন যে সে কী ভীষণ মানসিক বেদনার থেকে তা করে, আমি তো তা কল্পনাই করতে পারি না।'

শিবেন বলল, 'তোর আর কল্পনা করে কাজ নেই। এখন বলুন তো বউদি, আপনার বিনয়ভূষণকে প্রথম সন্দেহ হল কী করে?'

দময়ন্তী বলল, 'আদৌ আমার কারোর ওপরেই সন্দেহ হয়নি। ব্যাপারটা গোলমেলে সন্দেহ ছিল না, কিন্তু চোর আসার জন্য বাড়ির কাউকে দোষী ঠাওরানোর মতো যথেষ্ট প্রমাণ আমাদের হাতে ছিল না।

'গত শনিবার বিনয়ভূষণ যখন এসে বললেন, তাঁর শ্যালকের ঘরে চতুর্থবার চোর এসেছে, অথচ কিছুই খোয়া যায়নি, তখন আমার সামনে সমস্ত ঘটনাটা আরও ধোঁয়াটে হয়ে গেল। এ কেমন চোর? সাধারণ চোর কখনো সাত-আটদিন ধরে একটা ঘর ওয়াচ করে চুরি করতে আসে না, বরং ঘুরঘুর করে বাড়ির চারদিকে অনুসন্ধান চালায় ঢোকার, পালাবার পথ ঠিক করবার জন্য। তারপর একবার নয়, দুবার নয়, তিনবার বাধা পেয়ে একই জায়গায় চতুর্থবার চুরি করতে আসবার মতো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চোর শুধু কলকাতায় কেন, সারা পৃথিবীতে বিরল। আর যদিই বা এল, কিছুই চুরি করল না, এটাই বা কেমন, বিশেষত যেখানে প্রধান বাধা বাড়ির চাকরটা পর্যন্ত অনুপস্থিত? স্পষ্টতই, এটা করা হচ্ছে কোনো উদ্দেশ্যসাধনের জন্য, চুরি করবার জন্য নয়। কী সেই উদ্দেশ্য? উদ্দেশ্য এক লক্ষ হতে পারে, কিন্তু সেটা বোঝা না গেলেও এর মধ্যে একটা জিনিস আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না। সমস্ত ধোঁয়াটে অন্ধকারে সেটাই একমাত্র আলোর শিখা।

'সেটা হচ্ছে, এর একটা বিশেষ প্যাটার্ন, যার কথা আপনাকে সেদিন বলছিলুম। যত বাধাই আসুক না কেন, সব ভেঙে চুরে আমার আরব্ধ কাজ আমি করবই, অনেকটা করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গের মতো। সাধারণ লোক বলবে এটা পাগলামি, ফৌজিরা বলবে এটাই স্বাভাবিক। প্যাটার্নটা আসলে মিলিটারি। এদিকে হীরালালবাবুর বাড়িতে প্রথম ভিজিটেই আমার মনে সন্দেহ হয়েছিল, অরবিন্দের দিকে দৃষ্টি রাখত নাগেশ্বর। সে পল্টনের লোক — মিলে গেল।

কিন্তু মিলিটারির লোক তখনই মিলিটারি, যখন সে আদেশ পায়, তার আগে পর্যন্ত কিন্তু সে সাধারণ লোকের মতোই ব্যবহার করে, চিন্তা-ভাবনা করে। আদেশ পেলেই সে মেশিন, ওই করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে। এই আদেশ দিল কে? মনে পড়ল বিনয়ভূষণ কর্নেল ছিলেন। এই আমার প্রথম সন্দেহ গিয়ে পড়ল বিনয়ভূষণের ওপর।

কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারছিলুম না, বিনয়ভূষণের এবম্বিধ আচরণের কারণ কী? প্রথমটা ভেবেছিলুম, অরবিন্দ বোধহয় মারা পড়বেন, যখন রেবেকা নিহত হল, ওর মৃতদেহের ফোটোটা দেখলুম, ওর জুতো দেখলুম, বিনয়ভূষণের ওপর আমার সন্দেহ দৃঢ়তর হল।

আমি যে অরবিন্দকে সন্দেহ করিনি, তার কারণ রেবেকার উলটো করে পরা শাড়ি আর জুতোর পেছনে স্ক্র্যাচ। স্পষ্টতই হত্যাকাণ্ড অরবিন্দের ঘরের নীচে হয়নি এবং মৃত রেবেকাকে সরাতে গিয়ে ওর শাড়ি আর জুতো খুলে গিয়েছিল। আমি হৈ-চৈ করাতে জুতোটা পরদিনই আমাদের পাইয়ে দিলেন বিনয়ভূষণ ঠিকই, কিন্তু শাড়িটার বেলা আর কিছু করবার ছিল না। অন্ধকারে সবুজ সিল্কের শাড়ি সযত্নেই পরিয়েছিলেন, কেবল সোজা-উলটো বুঝতে পারেননি।'

সমরেশ বলল, 'দিনের আলোতেও বুঝতে পারতেন কিনা সন্দেহ। অন্তত আমি তো পারতুম না।'

দময়ন্তী বলল, 'ঠিক কথা। তোমাদের পারা কঠিন। আর একটা কথা জেনে রেখে দিন শিবেনবাবু, যত তাড়া থাক, ঝড়-বৃষ্টি-ভূমিকম্প শুক্কুরবারের আকাশ যাই হোক না কেন, এমনকী ফায়ারিং স্কোয়াডের মুখেও যদি যেতে হয়, কোনো মেয়ে কক্ষনো উলটো করে শাড়ি পরে ঘর থেকে বেরোবে না। কাজেই রেবেকা জীবিত অবস্থায় উলটো শাড়ি পরেছে, এটা হতে পারে না। অতএব, ওর মৃত্যুর পর এটা করা হয়েছে। আপনি অরবিন্দের বিপক্ষে কেসটা যেভাবে সাজিয়েছিলেন, তাতে অথবা অন্য কোনো ভাবেও অরবিন্দের পক্ষে এটা করা অসম্ভব ছিল।

'যা হোক, তবু আমি বিনয়ভূষণকে ঠিক ছবির মধ্যে আনতে পারছিলুম না। যদিও আমার মন বলছিল, ওখানেই সমস্যার সমাধান রয়েছে। আসলে হীরালালবাবু এর মধ্যে ঢুকে গিয়ে জট পাকিয়ে দিয়েছিলেন। কাল রাত্রে বকুলের ফোটোটা দেখেই বিদ্যুৎচমকের মতো সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। বকুলের হাতের সেতারটাই মনে করিয়ে দিল যে, কর্নেল বিনয়ভূষণ রায়চৌধুরী একজন প্রথম শ্রেণির সেতার বাদক ছিলেন। রেবেকাও ছিল তাই। তবে তার পক্ষে ভালো বাদক হওয়া এ-বাড়িতে আসার আগে অসম্ভব ছিল, তার বাপের বাড়ির ইঙ্গ-বঙ্গ বা শুধু ইঙ্গ-আবহাওয়া তার অনুকূল ছিল না। এইবার আমার সামনে হীরালাল, নাগেশ্বর, বিনয়ভূষণ, বকুল, রেবেকার জটিল ল্যাবিরিন্থটা জট খুলে পথ দেখিয়ে দিল। মনে হল, শিক্ষিত, বড়োঘরের ছেলে বিনয়ভূষণের কোনো আত্মসম্মানবোধ নেই, কোনো ইজ্জৎ নেই, এ হতে পারেনা। সিধে পথে সেই বোধ বিকশিত হতে পারেনি, কারণ সেখানে অমৃতপ্রভার পাথর চাপা রয়েছে, কাজেই সে বেরিয়েছে বাঁকা পথে, গোপনে আর এই হত্যাকাণ্ডগুলো তারই অবধারিত চিহ্ন। আমার অনুমান যে ভুল হয়নি, তার প্রমাণ আমরা কাল রাত্রেই পেয়েছি। বকুল আর রেবেকাকে কর্নেলের ছাত্রী কল্পনা করতেই যে নিশ্ছিদ্র গল্পটি তৈরি হল, তা মিলে গেল অক্ষরে অক্ষরে।'

'আচ্ছা, আপনার কী মনে হয়, অরবিন্দও নিহত হয়েছেন?' শিবেন প্রশ্ন করল।

'না, আমার বোধ হয় এটা আত্মহত্যা, অমৃতপ্রভা যা বলেছেন তা ঠিকই। আমার বিশ্বাস অরবিন্দ সন্দেহ করেছিলেন বা হয়তো নিশ্চিতই জানতেন এই হত্যাকাণ্ডের নায়ক কে এবং কেন? তা না হলে, পঞ্চার মা-কে কোনোরকম বাক্যস্ফূর্তি না করতে ইনস্ট্রাকশন দিতেন না। তবে সেইসঙ্গে একথাও বুঝতে পেরেছিলেন যে আমি আসল অপরাধীকে চিনতে বেশি দেরি করব না। তাঁর পরিবারের পক্ষে সেই চূড়ান্ত লজ্জা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হবার আগেই উনি নিজেকে সরিয়ে দিলেন। শুধু অরবিন্দ কেন, কেউই তার আপন ভগ্নীপতিকে খুনের দায়ে ফাঁসিকাঠে চড়তে দেখতে চায় না।'

সমরেশ জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, ঈর্ষার বশে বিনয়ভূষণ হীরালালকে মারবার চেষ্টা করলেন না কেন?'

'কারণ উনি খুব ভালো করেই জানতেন, হীরালাল জাল পেতে তাঁর নায়িকাদের ধরেননি, তাঁরা নিজেরা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায়, লোভের বশবর্তী হয়ে ওঁর ঘাড়ে গিয়ে চড়েছেন। হীরালালবাবু ভদ্রলোক, মহিলাদের উনি অপেক্ষা করিয়ে রাখাটা অপছন্দ করেন!'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সমরেশ বলল, 'হুঁ! কিন্তু দুঃখ হয় যখন ভাবি যে বিনয়ভূষণের মতো এরকম একজন গুণী লোক হয়তো এভাবে সর্বনাশের অতলে তলিয়ে যেতেন না, যদি একটু স্ত্রীর মন পেতেন, একটা শান্ত, স্নিগ্ধ গৃহকোণ পেতেন, দুদণ্ড ঘরে শান্তি পেতেন। খুনই যদি করলেন, তো ওঁর করা উচিত ছিল ওই তাড়কা রাক্ষুসি অমৃতপ্রভাকে।'

অন্যমনস্কভাবে দময়ন্তী বলল, ‘তা কেন? অমৃতপ্রভা আইনত ওঁর স্ত্রী হতে পারেন, কিন্তু উনিও তো তাঁকে ভালোবাসতেন না।’

নীলকান্তপুরের হত্যাকাণ্ড

'আপনি কি ডাক্তার অরিজিৎ বোসের নাম শুনেছেন?' প্রশ্ন করল শিবেন।

দময়ন্তী মাথা নাড়ল।

'না, শোনবারই কথা। ভদ্রলোক পাগলের ডাক্তার, মানে মনস্তত্ত্ববিদ। ডাক্তারি করেন গড়িয়া ছাড়িয়ে নীলকান্তপুর বলে একটা জায়গায়। ওখানেই ওঁর চেম্বার এবং নার্সিং হোম। চলে বেশ ভালোই। যাঁরা এ ব্যাপারে খোঁজখবর রাখেন বা রাখতে বাধ্য হন, তাঁদের কাছে ডাক্তার বোস অপরিচিত নন। সম্প্রতি একটা খুব বিচ্ছিরি ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছেন। কাগজে খুব ছোটো করে বেরিয়েছিল, আপনার নজরে পড়েছে কিনা জানি না।'

দময়ন্তী ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, 'এটা কি সেই স্ত্রীকে খুন করার দায়ে ডাক্তার গ্রেপ্তার— সেই ব্যাপারটা? সে খবরটায় তো নাম ধাম কিছুই ছিল না, কেবল গড়িয়ার কাছে বলে একটা উল্লেখ ছিল।'

'ঠিক বলেছেন। সেই ঘটনাটাই। একবার ব্যাপারটা দেখবেন নাকি?'

'কী হয়েছিল? আপনারা তো তদন্ত করছেনই।'

'তা করছি। তদন্ত শেষও হয়ে গেছে। কিন্তু তদন্তের ফলাফলটা মোটেই আমার পছন্দ হচ্ছে না। কোথায় যেন একটা গোলমাল ঠেকছে।'

'কেন?'

'আসলে আপনি যদি ভদ্রলোককে দেখেন, আপনার কিছুতেই বিশ্বাস হবে না যে তিনি স্ত্রীকে খুন করতে পারেন। হাসবেন না। জানি মানুষের বাইরের চেহারা বা চালচলন দেখে কল্পনাও করা যায় না যে তার ভেতরে কী লুকিয়ে আছে। এত বছরের অভিজ্ঞতার পর বাইরের রূপ দেখে ভোলবার পাত্র আর আমি নই। কিন্তু এত বছরের অভিজ্ঞতায় আবার কেমন একটা ইনটুইশনও গজিয়ে গেছে। কাউকে অপরাধী নয় বলে মনে হলে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখেছি সেটা ভুল হয় না।'

'ঘটনাটা গোড়া থেকে বলবেন?'

সমরেশ এতক্ষণ লম্বা হয়ে ডিভানের ওপর শুয়ে সিগারেট টানছিল। বলল, 'হ্যাঁ, বেশ বিশদভাবে বলবি।'

শিবেন শুরু করল, 'প্রথমে ডাক্তার বোসের চেহারার একটা বর্ণনা দেওয়া প্রয়োজন। ভদ্রলোক পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি লম্বা, রোগাটে গড়ন, গায়ের রং ফ্যাকাশে, বড়ো বড়ো চোখ, মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, মাথায় টাক, বয়েস পঁয়তাল্লিশ। কলকাতা থেকে ডাক্তারি পাশ করে বিলেতে যান, ফিরে আসেন দশ বছর বাদে। সে আজ প্রায় বছর বারো হল। এখনও কিন্তু বিলেতের গন্ধ যায়নি। সবসময় সুট পরে থাকেন। কথা বলেন খুব আস্তে আস্তে, শান্তভাবে।

'এসবের কোনোটাই অবশ্য তাঁর খুনি হওয়ার পথে কোনো বাধা নয়। বাধাটা অন্যত্র। আপনি যদি ওঁর সঙ্গে কথা বলেন, তাহলে বুঝবেন, ভদ্রলোকের সর্ববিষয়ে পাণ্ডিত্য

অসাধারণ, অত্যন্ত বিনীত, নম্র, ভদ্র ব্যবহার, সরল সাদাসিধে কথাবার্তা এবং স্থির বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব— এমন লোক যখন অপরাধী হয়, তখন তাকে চট করে ধরে ফেলা যায় না।

'সে যাই হোক, আমি এবার আসল ঘটনাটা বলি।

'বিলেত থেকে ফিরে ভদ্রলোক কেয়াতলার কাছে একটা ক্লিনিক খুলে বসেছিলেন বছর বারো আগে। চলেনি। বেশ অর্থকষ্টে পড়েছিলেন তখন। এইসময় তাঁর সঙ্গে বিয়ে হয় ডাক্তার বীথিকা মিত্রের। লাভ ম্যারেজ নয়, সম্বন্ধ করে বিয়ে। সেটাই স্বাভাবিক, কারণ বীথিকার সঙ্গে কারুর লাভ হওয়া সম্ভব বলে আমার মনে হয় না। ভদ্রমহিলা মারা গেছেন, তাঁর সম্বন্ধে এরকম মন্তব্য করা হয়তো আমার উচিত নয়। তবে না করেও পারছি না। এঁর সম্পর্কে পরে আরও বলব। তার আগে ডাক্তার বোসের কথাটা বলে নিই।

'বীথিকার সঙ্গে বিবাহের পর অরিজিৎ বোসের ভাগ্য ফিরতে আরম্ভ করে। তার একটা কারণ অবশ্যই বীথিকার টাকা। তাঁর বাবা অন্নদা মিত্র তখন কলকাতার বিখ্যাত বড়োলোকদের একজন। তিনি জামাইয়ের ক্লিনিক সাজিয়ে গুছিয়ে দিয়েছিলেন প্রচুর খরচা করে। তার অন্য কারণ, অন্নদা মিত্র ও তাঁর পরিবারের সমাজে বিশেষ করে ডাক্তার মহলে ইনফ্লুয়েন্স। এইসব কারণে এবং নিজের হাতযশে বছর পাঁচেকের মধ্যেই অরিজিৎ তাঁর কর্মক্ষেত্রে খুব সুনাম অর্জন করেন। এবং, বলাই বাহুল্য, অনেক টাকাও রোজগার করেন। সেই টাকায় বছর সাতেক আগে নীলকান্তপুরে কয়েক বিঘে জমি কিনে প্রজ্ঞা মনবিশ্লেষণ কেন্দ্র বলে একটা ছোটোখাটো মেন্টাল হসপিটাল আর গবেষণা কেন্দ্র খুলে বসেন। আজ ওখানে আছে একটা নার্সিং হোম যেখানে জনা তিরিশেক রুগি থাকতে পারে, একটা ক্লিনিক, একটা লাইব্রেরি, একটা রিসার্চ সেন্টার ইত্যাদি। এ ছাড়া আছে নার্সেস কোয়ার্টার্স, আর একটা ছোটো পোলট্রি। স্বামী-স্ত্রী থাকতেন হাসপাতালেই একটা ফ্ল্যাটে।

'এই ফ্ল্যাটের বেডরুমে বীথিকাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় গত চোদ্দোই জানুয়ারি সন্ধ্যেবেলা। ভদ্রমহিলার কলকাতায় আসবার কথা ছিল। রওনা হবার আগে সাজগোজ করে ঠোঁটে লিপস্টিক লাগিয়েছিলেন। লিপস্টিকে পটাসিয়াম সায়ানাইড লাগানো ছিল। মৃত্যুর সময় কেউ কাছে ছিল না।

'এবার ভদ্রমহিলার কথা বলি। ধলা কুৎসিত কাকে বলে জানেন? ভদ্রমহিলা ছিলেন তাই। যেমন ফর্সা, তেমনি কুৎসিত। পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি লম্বা, ঘোড়ার মতো মুখ, আর তেমনি স্বভাব। প্রজ্ঞা কমপ্লেক্সের একজনও ভদ্রমহিলাকে পছন্দ করত না। সবাই তাঁকে সহ্য করত একমাত্র অরিজিতের জন্যে। বড়ো ডাক্তারবাবুর প্রতি প্রত্যেকের লয়ালটি প্রশ্নাতীত।

'এমন মহিলাকে খুন করতে খুব একটা চমকপ্রদ মোটিভের দরকার হয় না। কিন্তু অরিজিৎ যদি খুনি হয়েই থাকেন, তাহলে তাঁর যে মোটিভ আমরা তদন্ত করে দেখতে পাচ্ছি, সেটা কিন্তু অত্যন্ত চমকপ্রদ। সে সম্পর্কে একটু বিশদভাবে বলা দরকার।

'অরিজিৎ আর বীথিকার জয়েন্ট অ্যাকাউন্টের পাশবই চেক করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই যে গত বছরের এপ্রিল মাসে এবং তার আগের বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে দুটি খুব মোটা অঙ্কের টাকা জমা পড়েছে সেখানে। কোত্থেকে যে সেই টাকাগুলো এল, তার খোঁজ করতে গিয়ে আমরা দেখি যে উভয় ক্ষেত্রেই সেই টাকা এসেছে দুজন সুস্থ হয়ে যাওয়া অর্থশালী রুগির সম্পত্তি থেকে। এই দুজন মৃত্যুর আগে তাঁদের সম্পত্তির একটা

বেশ বড়ো অংশ ডাক্তার অরিজিৎ আর বীথিকা বোসকে দান করে গেছেন। তাঁদের উভয়েরই উইলের বক্তব্য ছিল যে তাঁদের পরিবারের লোকেরা ষড়যন্ত্র করে সম্পত্তি বেদখল করার অসদুদ্দেশ্য নিয়ে তাঁদের পাগল বানিয়ে হাসপাতালে পাঠিয়েছিল। সেখানে থাকার সময় অরিজিৎ আর বীথিকার নিঃস্বার্থ সেবাপরায়ণতার মধ্যে তাঁরা স্বর্গসুখ উপভোগ করেছেন এবং বুঝেছেন যে তাঁদের সত্যিকার আপনার জন ওই দুজন— শয়তান নিকটাত্মীয়েরা নয়। অতএব, তাঁদের সম্পত্তির সিংহভাগ ওই দুজনকেই তাঁরা দান করে গেছেন।

'এরকম ঘটনা যে ঘটে না তা নয়। কিন্তু, আমাদের যেখানে খটকা লাগল তা হচ্ছে যে দুজনেই হাসপাতাল থেকে বেরোনোর ঠিক ছ-মাসের মাথায় মারা গেছেন এবং দুজনেরই মৃত্যুর কারণ এক— কী এক ধরনের জন্ডিস। তখন আরও খোঁজ করে জানা গেল, এরকম আরও একজন বড়োলোক রুগি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার ছ-মাসের মধ্যে মারা যান, একই কারণে। তবে তিনি কোনো উইল করে যাননি বা যেতে পারেননি। এখানে আমরা একটা ফাউল প্লে সন্দেহ করি এবং ডাক্তার বোসের কেস উঠলে এই সন্দেহটার ওপর একটা খুব জোরদার আলোচনা হবে আদালতে।

'এরপর যে ব্যাপারটা আমাদের নজরে পড়ে, তা হচ্ছে যে গত বছরের অগাস্ট মাস থেকে ওই জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট থেকে বড়ো বড়ো চেক কেটে অনেক টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। সেই টাকা তোলেন বীথিকা। কেন, তা ডাক্তার অরিজিৎ বোসের অজানা। তার কারণটা অনুমান করা কিন্তু কঠিন নয়। আমরা জানি যে অন্নদা মিত্র মশাইয়ের মৃত্যুর পর গত পাঁচ বছরে তাঁর দুই ছেলে, রাজমোহন আর রাজকুমার তাঁর বিশাল ব্যবসা লাটে তুলে দিয়ে আপাতত দেউলিয়া হবার উপক্রম করেছে। ওই টাকাগুলো যে ভাইদের প্রতি বোনের সামান্য উপহার তাতে সন্দেহ থাকে না।

'অতএব, পুলিশের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে ডাক্তার অরিজিৎ বোস একটি সাক্ষাৎ শয়তান। তিনি ষড়যন্ত্র করে বড়োলোক রুগিদের সরিয়ে দিয়ে তাদের সম্পত্তি দখল করেছিলেন। বীথিকা তাঁর ওপর বাটপাড়ি করে নিজের ভাইদের সেই টাকা বিলিয়ে দেওয়ায় ক্ষেপে গিয়ে তিনি তাঁকে খুন করে বসেছেন।'

দময়ন্তী মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার বিশ্বাস যে এই সিদ্ধান্ত ভুল, তাই না?'

'হ্যাঁ, তাই বটে।'

'কেন? স্রেফ বড়োলোকের সম্পর্কে আপনার ব্যক্তিগত ধারণা থেকে, না অন্য কোনো কারণ আছে?'

'আছে। প্রথমত লিপস্টিকে সায়ানাইড মাখিয়ে রাখার পেছনে একটা ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছি। এটা হঠাৎ রাগের মাথায় করা কাজ নয়। তাহলে এমন বোকার মতো ষড়যন্ত্র করার কী দরকার ছিল? আগেই বলেছি, ডাক্তার বোস শান্ত প্রকৃতির, কিন্তু মোটেই গাধা নন। বিশেষত, পুলিশ নিজেই যেখানে তাঁকে ধুরন্ধর শয়তান বলে প্রমাণ করার চেষ্টায় আছে।

'দ্বিতীয়ত, সম্পত্তিগুলো যদি শয়তানি করেই আদায় হয়ে থাকে, তাহলে কোনো ক্ষেত্রেই কোনো মামলামোকদ্দমা হয়নি কেন? আত্মীয়স্বজনরা যদি কনটেস্ট করত, তাহলে হয়তো জিতে যেতেও পারত।

'তৃতীয়ত, রাজমোহন আর রাজকুমারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অত্যন্ত ভালো ছিল। এখনও আছে। তারা এমনিতে যতই অপদার্থ হোক, অরিজিৎকে দুজনে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে এবং

ভালোবাসে। তাদের টাকা নেবার জন্যে বীথিকার লুকিয়ে চুরিয়ে কিছু করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। আপনি শুনলে আশ্চর্য হবেন, অরিজিতের মামলা চালাবার সব দায়িত্ব নিয়েছে এই দুই ভাই।'

দময়ন্তী জিজ্ঞেস করল, 'দুই ভাই কী বলছে, তারা বোনের কাছ থেকে কোনো টাকা পায়নি?'

'হ্যাঁ। পুলিশ অবশ্য তাদের কথা বিশ্বাস করছে না।'

'অর্থাৎ আপনি বলছেন বীথিকার আর একটা গোপন জীবন ছিল এবং সেখানেই রয়েছে তার মৃত্যুর সমাধান, এই তো?'

শিবেন সহাস্যে মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ, একেবারে ঠিক ধরেছেন।'

'তাহলে আপনি নিজে বীথিকা সম্পর্কে আর যা যা জানেন, যা আপনার ডিপার্টমেন্টের সহকর্মীরা জানে না, সেগুলো একটু বলুন।'

শিবেন মাথা নেড়ে বলল, 'আশ্চর্য! আপনি কী করে বুঝলেন যে আমি ব্যক্তিগতভাবে কিছু জানতে পারি?'

'খুব সহজে। প্রথম থেকেই বীথিকার সম্পর্কে আপনি যেসব মন্তব্য করেছেন, তাতে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে আপনি তাঁকে তাঁর মৃত্যুর আগে থেকেই জানতেন।'

'ঠিকই। বীথিকা মিত্রকে আমি অনেকদিন থেকেই জানি। মানে তার বিয়ের আগে থেকেই। আমার পিসিমার বাড়ি অবিনাশ ঘোষ রোডে। সেই পাড়াতেই অন্নদা মিত্তিরের অরিজিন্যাল বাড়ি। পরে বালিগঞ্জে উঠে গিয়েছিলেন। তখন বীথিকার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। মহা পাজি মেয়ে ছিল বীথিকা। ওই তো চেহারা, অথচ ঠমকে মাটিতে পা পড়ত না। পাড়াশুদ্ধ সকলের সঙ্গে ঝগড়া, কেউ দু-চক্ষে দেখতে পারত না। ওদিকে আবার নিমফোম্যানিয়াকও ছিল। পাড়ার দুই হ্যান্ডসাম দাদার পেছনে লেগেছিল, তারা কেঁদে কূল পায় না। শেষ পর্যন্ত মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সময় এক সহপাঠীর সঙ্গে ভাগলবা। অন্নদা মিত্তির খুঁজে পেতে তাদের ধরে নিয়ে এলেন পুরীর এক হোটেল থেকে। তারপর পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার অরিজিৎ বোসের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন।'

'বীথিকা কি তাঁর বাবার সবচেয়ে ছোটো মেয়ে ছিলেন?'

'ছোটো মেয়ে তো বটেই, একটিই মেয়ে। আদর দিয়ে মাথা খেয়েছিলেন অন্নদা মিত্তির।'

'বীথিকার কোনো ছেলেপুলে হয়নি?'

'না।'

'কাউকে অ্যাডপ্ট করেছিলেন বা দত্তক নিয়েছিলেন?'

'না।'

'ডাক্তার অরিজিৎ বোসের আত্মীয়স্বজন কে কে আছেন? মানে, নিকট আত্মীয়?'

'ওঁর বাবা আছেন, সুজিত বোস, একসময় তারাচাঁদ বিদ্যাপীঠের হেডমাস্টার ছিলেন। ওঁর মা মারা গেছেন অনেক বছর আগে। এক দাদা আছেন, অভিজিৎ, বসিরহাট মিউনিসিপ্যালিটিতে ওভারসিয়ারের চাকরি করেন। এক বোন আছেন, বিয়ে হয়ে গেছে, থাকেন দুর্গাপুরে বা আসানসোলে কোথাও। তাঁকে এ ব্যাপারে কেউ ডাকেনি।'

‘কেন?’

‘প্রয়োজন মনে করেনি, তাই।’

‘আশ্চর্য।’ বলে দময়ন্তী চুপ করে গেল।

শিবেন কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বলল, ‘আচ্ছা, বেশ, অরিজিতের বোনকে না ডাকাটা হয়তো অন্যায়ই হয়েছে। কিন্তু আমার প্রশ্নটার জবাব এখনও পাইনি। ব্যাপারটা আপনি দেখবেন, না দেখবেন না?’

দময়ন্তী হেসে ফেলল। বলল, ‘ঠিক আছে, দেখব। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার, সন্দেহ নেই। তবে কি জানেন, অরিজিৎকে আপনি যতটা ধোয়া তুলসীপাতা ভাবছেন, ততটা তিনি নন। বীথিকাকে তিনি টাকার লোভে বিয়ে করেছিলেন।’

শিবেন হাত নেড়ে বলল, ‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাদের ডিপার্টমেন্টও সেই কথাই বলছে। টাকার লোভে বিয়ে করেছিলেন, টাকার লোভে খুন করেছেন। কিন্তু আমি আপনাকে বলছি, এই সিদ্ধান্ত ঠিক নয়। আপনি একবার অরিজিতের সঙ্গে কথা বলুন, তাহলেই আমি কী বলতে চাইছি, তা বুঝতে পারবেন।’

দময়ন্তী মাথা নাড়ল। বলল, ‘না, আমি এখনই অরিজিতের সঙ্গে কথা বলতে চাই না। আমি চাই ওঁর বোনের সঙ্গে কথা বলতে। ব্যবস্থা করতে পারবেন?’

শিবেন হাত উল্টে বলল, ‘ঠিক আছে। ব্যবস্থা করা যাবে। আগামী রোববার বিকেলবেলা ভদ্রমহিলাকে নিয়ে আসব এখানে।’

সমরেশ কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘কেমন দেখতে রে ভদ্রমহিলাকে?’

শিবেন বিরক্ত গলায় বলল, ‘কে জানে কেমন। দেখেছি নাকি কোনোদিন?’

রোববার বিকেল বেলা অতিথি এলেন চারজন। শিবেন, একজন মহিলা, একজন ইউনিফর্ম-পরা পুলিশ অফিসার এবং একজন নিতান্ত সাদাসিধে ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত ভদ্রলোক। ভদ্রমহিলা মোটের ওপর সুন্দরী, তবে বয়েস চল্লিশ পেরিয়েছে। মাথার চুলে পাক ধরেছে, মুখের বলিরেখায় সংসারের পোড়-খাওয়া চিহ্ন, পরনে একটি লালপাড় ধূসর রঙের ধনেখালি শাড়ি আর লাল রঙের ব্লাউজ। পুলিশ অফিসারটি প্রকাণ্ড লম্বা-চওড়া, মাথায় টাক, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, হাসিখুশি মুখ, কিন্তু চোখ দুটি সজাগ ও তীক্ষ্ন। ভদ্রলোকটির বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি, মাথার বেশিরভাগ চুলই পাকা, চোখে সরু ফ্রেমের চশমা, শীর্ণ মুখে উদবেগ ও আশঙ্কা।

শিবেন পরিচয় করিয়ে দিল, ‘ইনি ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর হেমন্ত কুমার সরকার, এই কেসটার চার্জে আছেন। ইনি ডাক্তার অরিজিৎ বোসের ছোটো বোন মিসেস অলকা ঘোষ আর ইনি এঁর স্বামী শ্রীবিকাশচন্দ্র ঘোষ। বিকাশবাবু বার্নপুরে মডার্ন স্টিল কোম্পানিতে অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে চাকরি করেন।’

শিবেন থামতেই হেমন্ত সরকার বললেন, ‘দেখুন, গত বুধবার শিবেনদার সঙ্গে আপনার যে কথাবার্তা হয়েছে, তার কিছু কিছু আমি শুনেছি। মিসেস ঘোষকে জেরা না করা সত্যিই আমাদের ভুল হয়েছিল। এখন, আপনি যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে আমি আপনার জেরার সময় উপস্থিত থাকতে চাই।’

হেমন্ত সরকারের কথা শুনে দময়ন্তী একটু গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, 'উপস্থিত আপনি অবশ্যই থাকতে পারেন। তবে মিসেস ঘোষকে আমি কিন্তু জেরা করবার জন্যে ডাকিনি। আমার উদ্দেশ্য ওঁর সঙ্গে একটু কথা বলা, কয়েকটা কথা ওঁর কাছ থেকে জানা।'

সরকার হেঁ হেঁ করে হেসে বললেন, 'না, না, মানে হ্যাঁ, তাই তো, কথাই তো বলবেন। মানে, আই অ্যাম সরি, জেরা করাটা আমার ঠিক বলা উচিত হয়নি। মানে, ওই কথাই আর কী—'

দময়ন্তী হেসে ফেলল। বলল, 'হ্যাঁ, কথাই। আমরা বলি, আপনি শুনুন। তবে, তার আগে একটু জলযোগ না করলে তো চলবে না।'

দময়ন্তী জিজ্ঞেস করল, 'আপনার দাদা ডাক্তার অভিজিৎ বোসের যখন বিয়ে হয়, তখন কি আপনার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল মিসেস ঘোষ?'

অলকা মাথা নাড়লেন। বললেন, 'হ্যাঁ, হয়েছিল। অনেক আগেই হয়েছিল। ছোড়দার বিয়ে তো ওর বেশ বেশি বয়সেই হয়। বোধ হয় পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হবে।'

অ্যাকাউন্ট্যান্ট বিকাশচন্দ্র শুধরে দিলেন। বললেন, 'না, চৌত্রিশ বছর বয়সে। তোমার ছোড়দার বিয়ে হয়েছিল আমাদের বিয়ের সাত বছর বাদে।'

দময়ন্তী মৃদু হেসে আবার অলকাকে প্রশ্ন করল, 'আমাদের দেশের স্ট্যান্ডার্ডে এটা বেশি বয়েস সন্দেহ নেই, কিন্তু এত বয়স পর্যন্ত উনি বিয়ে করেননি কেন?'

অলকা চুপ করে কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন, 'দেখুন, আমরা নিতান্ত মধ্যবিত্ত পরিবার। অভাব অনটনের মধ্যে মানুষ হয়েছি। বাবা ছিলেন স্কুলটিচার, কতই-বা আর মাইনে পেতেন। ছোড়দা এই দারিদ্র্য সহ্য করতে পারত না। ওর মধ্যে অনেক উচ্চাশা ছিল, অনেক বড়ো হবার স্বপ্ন দেখত। কাজেই বিলেত থেকে ফিরে যখন প্র্যাকটিশ জমাতে পারল না, তখন অত্যন্ত মুষড়ে পড়েছিল। বিয়েই করবে না স্থির করেছিল।'

'প্র্যাকটিস জমল না কেন?'

'ছোড়দা যে লাইনে স্পেশালাইজড করেছিল, সে লাইনে পসার জমানো সে সময় বড়ো সহজ ছিল না। এমনিতেই পাগলের ডাক্তারের কাছে কজন রুগি আর যায়? তার ওপর ছোড়দা তখন নতুন ডাক্তার, ওকে চেনেই বা কে, জানেই বা কে?'

'আপনার ছোড়দার বিয়ের গল্প কিছু বলুন।'

অলকা আবার কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবলেন। তারপর বললেন, 'ছোড়দার বিয়ে হবার খবর আমি বার্নপুরে পাই। বাবা চিঠি লিখেছিলেন। সেটা পড়ে জানা গেল যে, বীথিকার সঙ্গে বিয়ে পাকাই হয়ে গেছে। আমার সঙ্গে পরামর্শ করার সময় ওঁরা পাননি, কারণ অন্নদাবাবুর চাপে পড়ে খুব তাড়াতাড়ি সবকিছু শেষ করে ফেলতে হয়েছে। মেয়ে দেখতে গিয়েছিলেন বাবা, ছোড়দা আর বড়োবউদি। বাবা ওখানেই কথা দিয়ে দিয়েছেন। আমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন আশীর্বাদ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্যে। আশীর্বাদের দু-দিন পরেই বিয়ে।

'আমার খুব দুঃখ আর অভিমান হয়েছিল। কিন্তু না গিয়ে তো পারি না। আমার বড়ো ছেলের বয়স তখন চার বছর— ওকে নিয়ে আমরা দুজনে বসিরহাটে বড়দার বাড়িতে গিয়ে উঠলুম। বাড়িতে ঢুকে দেখি চারদিক থমথম করছে। উঠোনে বড়দা গম্ভীর মুখে চুপ

করে দাঁড়িয়ে আর বারান্দায় বাবা একটা মোড়া পেতে প্রচণ্ড রাগী রাগী মুখ করে বসে আছে। আমরা ঢুকতেই বড়দা আমাকে আর বড়োখোকাকে ভেতরে পাঠিয়ে দিল আর ওকে বলল ওখানে থাকতে।

'রাত্রে ওর কাছে সব কথা শুনলুম। শুনে আমার ভীষণ কান্না পেল। ও বলল, বড়দা নাকি খবর এনেছে যে বীথিকার স্বভাবচরিত্র ভালো নয়। কেবল ভালো নয় বললে কম বলা হয়— বেশ খারাপই বলা উচিত। ছোড়দার ঘাড়ে ওই মেয়েকে চাপানো মানে তার সর্বনাশ করা। কিন্তু বাবা এই কথা শুনে ক্ষেপে লাল হয়ে গেছে; বাবা বলছে, এসব দুষ্টু লোকের রটনা। বড়োলোকের মেয়েদের নামে পাড়ার বখাটে ছেলেরা এসব কথা বলেই থাকে। যতই যাই হোক না কেন, বীথিকা একজন পাশ করা ডাক্তার; সে কখানো খারাপ হতে পারে না। এই কথায় বড়দার খুব আঁতে ঘা লাগল। দুঃখে, অপমানে প্রতিজ্ঞা করে বসল যে ছোড়দার বিয়েতে কোনোরকম অংশই নেবে না। শেষ পর্যন্ত, আমরা দুজনে অনেক বলে কয়ে বড়দাকে রাজী করাই।'

দময়ন্তী বলল, 'আপনার বড়োবউদি আপনাকে কী বললেন? এ ব্যাপারে ওঁর মতামত কী ছিল?'

'বড়োবউদি বাবার পক্ষেই ছিল। কারণ বড়োবউদির এক মামা এই সম্বন্ধ এনেছিলেন। তিনি আবার অন্নদাবাবুর অফিসে চাকরি করতেন। শুনেছি অন্নদাবাবু খুব বিশ্বাস করতেন ওঁকে।'

'তারপর কী হল? আপনারা আশীর্বাদে গেলেন?'

'হ্যাঁ, গেলুম। সে এক এলাহি ব্যাপার হয়েছিল। আর, বাবাকে সে কী খাতির! আমার তো বেশ বাড়াবাড়ি বলেই মনে হল। সেই প্রথম ছোটোবউদিকে দেখি। ওই তো ঘোড়ার মতো মুখ, সেটা আবার বেঁকিয়ে বসেছিল। দেখে, ছোড়দার জন্যে দুঃখই হল।'

'আপনার ছোড়দা কোনো আপত্তি করেননি?'

'না। প্রথমে বলেছিল যে বিয়েই করবে না। এই সম্বন্ধটা যখন এল, তখন কিন্তু কোনো আপত্তি করল না। বলল, বাবা যা বলবেন, তাই হবে। আসলে অন্নদাবাবুর টাকা দেখে মাথা ঘুরে গেছল। আজ তার শাস্তি ভোগ করছে।'

অলকার কথা শুনে বিকাশচন্দ্র অসন্তুষ্ট মুখে মাথা নাড়লেন। বোঝা গেল স্ত্রীর কথা তাঁর পছন্দ হয়নি। দময়ন্তী সেট লক্ষ্য করল। বলল, 'আপনি এ ব্যাপারে কিছু বলবেন মিস্টার ঘোষ?'

বিকাশ বললেন, 'দেখুন, আমার মতে ছোড়দার কিন্তু খুব একটা দোষ ছিল না। আপনি সে সময়টার কথা ভাবুন। বিলেত থেকে ফিরে পসার জমাতে পারেনি। দাদার অভাবের সংসারে বোঝার ওপর শাকের আঁটি হয়ে বসেছেন। বিলেত ফিরে যাবেন সে সংগতি পর্যন্ত নেই। সে যে কী ভয়ঙ্কর অবস্থা! সে অবস্থায় ছোড়দার সিদ্ধান্ত খুব একটা অন্যায় হয়েছিল বলে তো আমার মনে হয় না।'

অলকা বললেন, 'তাই বলে টাকার জন্যে বিয়ে করবে?'

'কেন করবে না? টাকার জন্যে লোকে খুন করে, আর বিয়ে করবে না? ব্যাপারটা অন্তত বেআইনি তো নয়। আর রোমান্স? ওসব ছাড়ো তো! অন্নচিন্তা চমৎকারা, কাতরে কবিতা কুতঃ?'

‘থাক, তোমাকে আর সংস্কৃত শ্লোক আওড়াতে হবে না। তাহলে, আশীর্বাদ থেকে ফিরে এসে ব্যাজার মুখে বসেছিলে কেন? কেন বলেছিলে যে ছোড়দার কপালে দুঃখ আছে?’

‘সেটা অন্নদাবাবুর টাকার জন্যে নয়। ছোটোবউদির চেহারার জন্যে।’

দময়ন্তী জিজ্ঞেস করল, ‘কেন, চেহারায় কী দেখলেন?’

‘দেখুন, ছোটোবউদিকে আপনি এখন শুধু ফোটোগ্রাফে দেখতে পাবেন, কাছ থেকে নয়। সেজন্যে ওঁর কতগুলো বৈশিষ্ট্য আজ আর আপনার জানা সম্ভব নয়। কেবল আমার কথায় আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে। ভদ্রমহিলা বাঙালি মেয়েদের তুলনায় খুব লম্বা ছিলেন। আর ওঁর সবকিছুই ছিল খুব বড়ো বড়ো। যেমন, হাতের সাইজ, পায়ের সাইজ। মুখটা তো... সে যাই হোক, নাক-কানও খুব বড়ো বড়ো ছিল। চুল আর চোখ ছিল কটা। হাতে বড়ো বড়ো লোম। আমাদের শাস্ত্রে বলে, এ ধরনের মেয়েরা সংসারে অশান্তি আনার জন্যেই জন্মায়।’

‘আপনি একথা বিশ্বাস করেন?’

‘না, করি না। তবে, আমার ছেলের সঙ্গে এ ধরনের চেহারার মেয়ের বিয়ে আমি স্বেচ্ছায় দেব না।’

‘চমৎকার! আচ্ছা মিসেস ঘোষ, গত এগারো বছরে ডাক্তার বোস, মানে আপনার ছোড়দা, আপনার কাছে তাঁর বিবাহিত জীবন সম্পর্কে কিছু বলেছেন? কোনো দুঃখের কথা বা আনন্দের কথা?’

অলকা মাথা নাড়লেন। বললেন, ‘না, কিচ্ছু না। বলার তেমন সুযোগও হয়নি। বিয়ের পর ছোড়দা কেয়াতলাতেই থাকত। বাবাকে সে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার কথা কোনোদিনও বলেনি। আর, বাবা তো বিয়ের বছর দুয়েকের মধ্যেই মারা গেলেন। তারপর থেকে আমাদের মধ্যে তেমন আর কোনো সম্পর্ক রইল না। ছোড়দা বা ছোটোবউদি কোনোদিনও কোনোরকম যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করেনি। তবে, কোনো নেমন্তন্ন বাড়িতে দেখা হলে খুব ভালো ব্যবহার করত। ওই পর্যন্তই। আসলে, আমরা গরিব আর ছোড়দা দারিদ্র্য সহ্য করতে পারত না। তারপরে তো ওরা নীলকান্তপুরে চলে গেল। তখন থেকে দেখাশুনোও বন্ধ হয়ে গেল।’

‘আপনার ছোটোবউদির মৃত্যুসংবাদ কীভাবে পেলেন?’

‘বড়দার চিঠিতে। বিস্তারিত খবর পাই বড়োবউদির চিঠিতে।’

‘আচ্ছা, আপনার ছোড়দার স্বভাবের একটা দিক আপনার কথায় জানতে পারছি যে উনি দারিদ্র্য সহ্য করতে পারতেন না। এ ছাড়া অন্য কোনোদিক আপনার মনে পড়ে?’

‘ছোড়দা খুব সাজগোজ করতে ভালোবাসত। অভাবের সংসারে দামি জামাকাপড় পেত না, কিন্তু অপরিষ্কার বা ইস্ত্রি না করা জামা কখনো পড়ত না। সবসময় ফিটফাট থাকত। তাই বলে আপনি যদি ভাবেন যে খুব স্টাইল করে কায়দা মেরে হাঁটাচলা করত, তা কিন্তু মোটেই নয়। কক্ষণো জোরে কথা বলত না, জোরে হাসত না, অসভ্য বা খারাপ কথা বলত না, অকারণে আড্ডা মারত না।’

বিকাশ বললেন, ‘আমিও একটু বলতে চাই। আমি অবশ্য ছোড়দাকে খুব বেশিদিন কাছ থেকে দেখিনি। আমাদের যখন বিয়ে হয়, উনি তখন বিলেতে। ফিরে আসার দেড় বছরের মধ্যেই ওঁর বিয়ে হয়। এর মধ্যে যেটুক দেখেছি তাতে আমার মনে হয়েছে যে ওঁর মতো মেন্টাল ডিসিপ্লিন বাঙালিদের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না। ওঁর সময়ের নড়চড় হয় না,

কথার নড়চড় হয় না। ব্যবহার অত্যন্ত মার্জিত, কিন্তু ঘনিষ্ঠ বা গায়েপড়া নয়। আমরা কাছাখোলা বাঙালি, উনি পাক্কা সাহেব।'

সমরেশ বলল, 'অর্থাৎ বাঙালিসুলভ চপলতা আর প্রলাপেতে সফলতা ওঁর মধ্যে একেবারেই ছিল না, এই তো?'

‘ঠিক বলেছেন। তবে কি জানেন, একটা ব্যাপার আমার খুব খারাপ লাগত। স্ত্রীকে খুশি রাখার জন্যেই হোক বা অন্য যেকোনো কারণেই হোক, শ্বশুরমশাইয়ের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করাটা ওঁর উচিত কাজ হয়নি। উনি যে কী কষ্ট করে ছেলে-মেয়েদের মানুষ করেছেন, সে কথা ছোড়দা ছাড়া বেশি ভালো করে আর কে জানতে পারে?’

অলকা বললেন, ‘বাবা তাঁর কৃতকর্মের ফল ভোগ করে গেছেন।’

দময়ন্তী বাধা দিয়ে প্রশ্ন করল, ‘আচ্ছা, ওঁদের যে কোনো ছেলেপুলে হয়নি, তা নিয়ে কোনো দুঃখ বা মনোকষ্টের কথা কি কখনো জানতে পেরেছেন?’

অলকা মাথা নেড়ে বলল, ‘না, কখনো নয়।’

‘আপনার বড়দার সন্তান আছে?’

‘আছে, একটি ছেলে। ভালো নাম সুরজিৎ, ডাকনাম গালু। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে, ফাইনাল ইয়ার।’

‘এই সুরজিতের সঙ্গে তার কাকিমার কীরকম সম্পর্ক ছিল?’

‘কোনো সম্পর্ক ছিল না। কোনোদিন বাড়িতে নেমন্তন্ন করেনি পর্যন্ত।’

‘রাজমোহন বা রাজকুমারকে আপনারা চেনেন?’

‘ছোড়দার দুই শালা তো? মুখ চিনি। ওই পর্যন্ত।’

‘আচ্ছা বিকাশবাবু, আপনার কি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে? বা ক্যাশ সার্টিফিকেট?’

বিকাশ একটু চমকে উঠলেন। বললেন, ‘ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে, বার্নপুরের স্টেট বাঙ্কে, তবে তাতে গেয়ে বেড়াবার মতো কিছু নেই। ক্যাশ সার্টিফিকেটও আছে— হাজার টাকার।’

‘ইন্সিওরেন্স করাননি?’

‘করিয়েছি। তিরিশ হাজার টাকার। তবে মাঝে মাঝে মনে হয় না করলেই বোধ হয় ভালো ছিল। কোয়ার্টারলি প্রিমিয়াম দিতে প্রাণ বেরিয়ে যায়।’

‘আপনার সন্তান ক-টি?’

‘দুটি। বড়োটি ছেলে, এবার মাধ্যমিক দেবে। ছোটোটি মেয়ে, ক্লাস সিক্সে পড়ে।’

অলকা আর বিকাশ চলে গেলে আর এক প্রস্থ চা এল। হেমন্ত সরকার শিবেনকে সম্বোধন করে বললেন, ‘স্যার, এই যে কথাবার্তা হল, এতে কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্তে ভুল আছে প্রমাণিত হল না।’

শিবেন বলল, ‘কীরকম?’

‘অরিজিৎ বোসের চরিত্র যা তার বোনের মুখেই শুনলুম, তাতে তো তাকে খুব একটা আদর্শ পুরুষ বলে মনে হল না। যে দারিদ্র্য সহ্য করতে পারে না, টাকার লোভে বিয়ে করে গরিব আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে, তার পক্ষে অসদুপায়ে বড়োলোক রুগি মেরে তাঁর সম্পত্তি আত্মসাৎ করা বা অতিরিক্ত খরচ-করা স্ত্রীকে খুন করা কি খুব কঠিন বা অসম্ভব কাজ?’

‘না, তা হয়তো নয়। কিন্তু, আমার দুটো প্রশ্নের জবাব দাও তো হেমন্ত। প্রথম, যে লোক অত্যন্ত শিক্ষিত এবং ডিসিপ্লিন্ড, সে বিষ দিয়ে তার বউকে মেরে বিষ-মেশানো লিপস্টিকটা সরিয়ে ফেলল না কেন এবং দ্বিতীয়, এমনভাবে খুন করল না কেন যাতে সেটা স্বাভাবিক মৃত্যু বলে মনে হয়? মনে রেখ, লোকটা ডাক্তার, সে নাকি বাড়ি ফিরে যাওয়া রুগিকে রিমোট কন্ট্রোলে এমনভাবে মেরেছে যাতে সেটা যে খুন সে বিষয়ে কেবল সন্দেহই করা যায়, কিছুই প্রমাণ করা যায় না।’

‘হয়তো রাগের মাথায় খুন করে বসেছে। হয়তো সময় পায়নি।’

‘না হেমন্ত, হয়তো হয়তো করে একজনের মাথায় খুনের দায় চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়! তোমার কাছে সব প্রশ্নের অভ্রান্ত উত্তর থাকতে হবে, কোনো কিছুই হয়তো বলে পাশ কাটিয়ে যাওয়া চলবে না।’

হেমন্ত কিছু-একটা বলতে যাচ্ছিলেন, বাধা দিল দময়ন্তী। প্রশ্ন করল, ‘আচ্ছা, এই যে দুজন বা তিনজন রুগি মারা গেছেন, এঁদের সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছেন?’

হেমন্ত বললেন, ‘হ্যাঁ, নিয়েছি।’ বলে পকেট থেকে একটা নোটবই বের করে সেটা খুলে বলতে লাগলেন, ‘প্রথম যাঁর বাড়িতে আমরা গিয়েছিলুম, তাঁর নাম ঈশ্বর ভোলানাথ চক্রবর্তী। বয়েস হয়েছিল ছাপ্পান্ন। ভোলানাথের মস্ত ওষুধের দোকান রাজেন্দ্রলাল অ্যাভিনিউতে, শ্যামবাজারে প্রকাণ্ড বাড়ি, গোবিন্দপুরে বিশাল জমি আর ব্যাঙ্কে অনেক টাকা। কিন্তু নিকটাত্মীয় বলতে এক দূর সম্পর্কের ভাগনে আর দূরতর সম্পর্কের এক মামাতো ভাই। এরা দুজনেই ভোলানাথের পয়সায় মানুষ বা অমানুষ। দ্বিতীয়, রানি নির্ঝরিণী দেবী, বয়েস ষাট। বাংলাদেশের কোনো স্টেটের রানি ছিলেন। থাকতেন বিদ্যাসাগর রোডে। রাজত্ব না থাকলে কী হবে, এঁর কলকাতায় দুটো বড়ো বড়ো বাড়ি, আর গয়না, শেয়ার আর ব্যাঙ্ক ব্যালান্স মিলিয়ে অনেক সম্পত্তি ছিল। এঁর দুই মেয়ে, দুজনেই বিয়ে হয়ে তাদের স্বামীদের সঙ্গে বিদেশে। যেটুকু জানতে পেরেছি, এদের দুজনের কারুর সঙ্গেই নির্ঝরিণী দেবীর সদ্ভাব ছিল না। গত সাত-আট বছরে এরা একবারও মাকে দেখতে আসেনি। দেখাশুনো করত ওঁর এক ভাগনি আর তার স্বামী। এরা দুজনের কেউই খুব সুবিধের লোক ছিল না। আর, তৃতীয় জনের নাম ঈশ্বর শম্ভুচন্দ্র ধাড়া। এঁরও বয়েস হয়েছিল ষাট। ইনিও প্রথমজনের মতো ব্যবসায়ী, তবে ছেলেপুলে নাতি-নাতনি নিয়ে বিশাল সংসার। থাকতেন বজবজে। স্ত্রী মারা যাবার পর মাথা খারাপের মতো হয়েছিল। তখন ছেলেরা তাঁকে নীলকান্তপুরে রেখে আসে। বছর খানেক মাত্র ছিলেন। অন্য দুজন অবশ্য অনেক বেশিদিন ছিলেন। এঁদের মধ্যে ভোলানাথ উইল করে প্রজ্ঞা মনবিশ্লেষণ কেন্দ্রকে গোবিন্দপুরের জমি আর ডাক্তার বোসেদের সাড়ে চার লক্ষ টাকা দান করে গিয়েছিলেন। রানি নির্ঝরিণী তাঁর বোস্টমঘাটার বাড়িটা প্রজ্ঞাকে এবং ডাক্তার বোসেদের তিন লক্ষ টাকা দান করে গিয়েছিলেন। শম্ভুচন্দ্র অবশ্য কিছু দিয়ে যাননি।’

‘তিনজনেই একই রোগে মারা গিয়েছেন বলছেন। কী রোগ?’

‘জন্ডিস। আমাদের ধারণা ওষুধের সঙ্গে ওই রোগের জীবাণু শরীরে ঢোকানো হয়েছিল।’

‘সেরকম কোনো ওষুধের সন্ধান কি এঁদের বাড়িতে পেয়েছেন?’

‘না। তবে, একটা আশ্চর্য জিনিস আবিষ্কার করেছি।’

‘যথা?’

‘এঁরা তিনজনেই মৃত্যুর আগে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খেতে আরম্ভ করেছিলেন।’

‘ভোলানাথ আর নির্ঝরিণী দেবী দুটো উইলেই সাক্ষী হিসেবে নিশ্চয়ই একজন করে ডাক্তার আছেন? উনি কি হোমিওপ্যাথি করতেন?’

‘না। উভয় ক্ষেত্রেই তাঁদের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ানরা সাক্ষী হিসেবে সই করেছেন। এবং সেই কারণেই আদালতে উইল দুটোর বিরুদ্ধে কোনো মামলা দায়ের করা যায়নি। উভয় ক্ষেত্রেই উইল স্বহস্তে লেখা, ডাক্তার সাক্ষী, অতএব উইলকর্তা যে সুস্থ শরীরে প্রফুল্লচিত্তেই উইল করেছেন, তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে না। পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দেবার কোনো সম্ভাবনাই নেই।’

‘এঁরা বাড়ি ফিরে আসার পর প্রজ্ঞা মনবিশ্লেষণ কেন্দ্রের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছিল কি?’

‘ছিল। প্রথম ছ-মাস পনেরো দিনে একবার এবং তার পরের দু-মাস মাসে একবার করে তাঁদের ওখানে নিয়ে যেতে হত চেক-আপের জন্যে।’

‘আচ্ছা, এঁরা হোমিওপ্যাথি কি কোনো বিশেষ ডাক্তারের কাছে করাতেন? আপনার বর্ণনায় বোঝা যাচ্ছে, এঁরা তিনজনেই প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ। এঁরা কি ডাক্তারের চেম্বারে যেতেন, না ডাক্তার বাড়িতে আসতেন? যদি চেম্বারে যেতেন, তাহলে তখন কি তাঁদের সঙ্গে কেউ যেত?’

হেমন্ত মাথা চুলকে বললেন, ‘এ প্রশ্নগুলো অবশ্য আমরা করিনি। তবে যদি আপনি চান, তাহলে কালই আপনাকে সব জানিয়ে দেব।’

দময়ন্তী বলল, ‘শুধু এই ক-টা প্রশ্ন নয়, আরও আছে। কে এঁদের হোমিওপ্যাথের কাছে যেতে উপদেশ দিয়েছে বা ডাক্তার ঠিক করে দিয়েছে? উইল করবার আগে উইলের বয়ান এঁরা নিকটাত্মীয়দের জানিয়েছেন না জানাননি? জন্ডিসে অসুস্থ হয়ে পড়ার আগে এঁদের ব্যবহার বা চালচলনে কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে কিনা? মৃত্যুর আগে, এঁদের আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে কোনো তুমুল ঝগড়া বা মনোমালিন্য হয়েছে কি না?’

হেমন্ত মৃদু হেসে খাতা বন্ধ করে বললেন, ‘আপনার শেষ প্রশ্নটার উত্তর আমার জানা আছে। এঁরা তিনজনেই প্রচণ্ড খিটখিটে স্বভাবের ছিলেন এবং প্রায় প্রত্যেক দিন ঝগড়াঝাঁটি লেগেই থাকত।’

দময়ন্তী বলল, ‘আপনি তো একথাটা জেনেছেন এঁদের আত্মীয়দের কাছ থেকে। বাড়ির ঠাকুর, চাকর বা ড্রাইভারদের সঙ্গে কথা বলে দেখুন না। হয়তো নতুন তথ্য পাবেন।’

‘আসল কথা কি জানেন, আমরা এই রুগিদের বাড়িতে গেছি তাঁদের মৃত্যুর প্রায় দু-বছর বাদে। তাঁদের মৃত্যু যে অস্বাভাবিক, সে কথাটা কিন্তু সন্দেহের পর্যায়ে আছে, কোনো প্রমাণ নেই। এমনকী কেউ সেরকম অভিযোগও আমাদের কাছে করেননি। কাজেই, বাড়ির লোকেদের আমরা বেশি খোঁচাখুঁচি আর করিনি; দেখি, এবার একটু নাড়াচাড়া দিয়ে কিছু বেরোয় কি না।’

হেমন্ত বিদায় নেবার পর শিবেন বলল, ‘কি মনে হচ্ছে বউদি? ব্যাপারটা বেশ ইন্টারেস্টিং নয়?’

দময়ন্তী হাসল। বলল, ‘নিশ্চয়ই, খুব ইন্টারেস্টিং।’

‘কি ধারণা হল আপনার? অরিজিৎ বোসই খুনি?’

‘আপাতত, সেরকম মনে হওয়ার তো কারণ দেখছি না। তবে, অনেক জায়গায় খটকা আছে। সেগুলোর সদুত্তর না পাওয়া পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছনো একেবারেই ঠিক হবে না।’

পরদিন হেমন্ত এলেন একটু রাত্রের দিকে, সঙ্গে একজন ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত নিরীহদর্শন ভদ্রলোক। শিবেন এসেছিল আগেই। বসে বসে চা খাচ্ছিল আর সমরেশের সঙ্গে দাবা খেলছিল।

হেমন্ত আগন্তুক ভদ্রলোকের সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন, ‘এঁর নাম শ্রীবিবেকানন্দ ধাড়া, থাকেন বজবজে। এঁর বাবার নাম ঈশ্বর শম্ভুচন্দ্র ধাড়া। আজ যখন এঁদের বাড়িতে জিজ্ঞাসাবাদ করবার জন্যে যাই, তখন কথায় কথায় আপনার নাম এসে পড়ায় ইনি নিজেই আপনার সঙ্গে কথা বলবেন বলে আমার সঙ্গে চলে এলেন।’

দময়ন্তী হেসে বলল, ‘তা বেশ তো। সে তো ভালো কথা। বলুন আপনার কী বলবার আছে!’

বিবেকানন্দ নতমস্তকে চিন্তিত মুখে বসেছিলেন। বললেন, ‘দেখুন, আজ থেকে প্রায় বছর দেড়েক আগে আমার বাবার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কারণ ইনফেকটিভ হেপাটাইটিস, যেটা নাকি এক ধরনের জন্ডিস। আমরা জানি যে জন্ডিস একটা খারাপ অসুখ, আমাদের ওদিকে মাঝে মাঝেই দেখা দেয় আর আমার বাবা তখন ষাট বছরের বৃদ্ধ। কাজেই তাঁর মৃত্যু কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার বলে আমাদের কখনোই মনে হয়নি। এই ঘটনার প্রায় বছর খানেক বাদে যখন পুলিশ আমাদের বাড়িতে আসে, তখন আমরা বিরক্তই হয়েছিলুম এবং আমাদের সন্দেহ হয়েছিল যে আমাদের অকারণে কোনো ঝামেলায় জড়িয়ে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু, তারপর গত ছ-মাস ধরে আমি এ ব্যাপারটা নিয়ে ভেবেছি এবং আমার মনে কতগুলো সন্দেহ দেখা দিয়েছে। এই সন্দেহগুলো নিয়ে অবশ্যই আমার পুলিশের সঙ্গে কথা বলা উচিত ছিল। কিন্তু কি জানেন, ওঁরা চলেন বাঁধাধরা রাস্তায়, আমার প্রশ্নগুলো ঠিক যেভাবে গ্রহণ করা উচিত, হয়তো তাঁরা সেভাবে নেবেন না, এই ভেবে আমি চুপ করেছিলুম। আজ যখন ওঁরা এলেন এবং আপনার নাম করলেন, তখন আমি চলেই এলুম। আপনি যদি দয়া করে আমার কথাগুলো শোনেন।’

দময়ন্তী বলল, ‘নিশ্চয়ই শুনব বিবেকানন্দবাবু। এঁরা থাকলে আপনার বলতে কোনো আপত্তি নেই তো?’

বিবেকানন্দ একটু চিন্তা করে বললেন, ‘না, আপত্তি নেই, যদি আমি যা বলব তা রেকর্ড করা না হয়।’

হেমন্ত মাথা নেড়ে বললেন, ‘আপনার কোনো কথা রেকর্ড করা হবে না, আপনি নির্ভয়ে বলুন। এমনকী আমি কোনো নোটও নেব না। এই আমার কলম বন্ধ করলুম।’

বিবেকানন্দ ম্লান হাসলেন। বললেন, ‘ঠিক আছে। বলছি। দেখুন বজবজে আমাদের বহু পুরুষের বসবাস। জমিজমা আছে, টাকাপয়সাও কম নেই। মস্ত যৌথ পরিবার আমাদের। আমার বাবা এ বাড়ির মেজোকর্তা? বড়োকর্তা আমাদের জ্যাঠামশাই, আশির কাছাকাছি বয়েস, কিন্তু এখনও শক্তসমর্থ আছেন, দোর্দণ্ডপ্রতাপ তাঁর। আমার বাবা ছিলেন এমনিতে চুপচাপ, শান্ত প্রকৃতির, কিন্তু রেগে গেলে তাঁর কোনোরকম জ্ঞানগম্যি থাকত না। তখন

তাঁকে কেউ সামলাতে পারত না, এমনকী জ্যাঠামশাই পর্যন্ত না। একমাত্র আমার মা পারতেন! তাঁর একটা অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব ছিল যার সামনে সবাইকে নম্র হতে হত। বছর চারেক আগে তাঁর মৃত্যু হয়। তারপর থেকে বাবা একেবারে পালটে যান। যেভাবেই হোক, তাঁর ধারণা হয়েছিল যে মার মৃত্যুর জন্যে তিনিই দায়ী। তা ছাড়া, মা চলে যাওয়ায় ওই বিশাল সংসারেও তিনি নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে করতে থাকেন। ফলে, ক্রমশ তিনি নিজেকে সমস্ত কাজকর্ম থেকে গুটিয়ে নেন, বাড়ি থেকে বের হওয়া বন্ধ করে দেন এবং সকলের সঙ্গে কথা বলাও প্রায় বন্ধ করে দেন। আমার স্ত্রীকে নাকি একবার বলেছিলেন যে এইভাবে তিনি প্রায়শ্চিত্ত করছেন। এরপর থেকে আস্তে আস্তে তাঁর মধ্যে মাথাখারাপের লক্ষণ দেখা দিতে থাকে। তখন আমরা কয়েক জন মানসিক রোগের ডাক্তারকে দেখাই এবং পরে তাঁদেরই একজনের রেকমেন্ডেশনে বাবাকে নীলকান্তপুরে ভরতি করে দিয়ে আসি। উনি ওখানে ছিলেন বছর খানেক। তারপর ডাক্তার বোস ওঁকে সুস্থ বলে সার্টিফিকেট দেওয়ায় আমরা ওঁকে বাড়িতে ফেরত নিয়ে আসি।

‘বাড়িতে আসার পর তিনি কিন্তু ভালোই ছিলেন। অসংলগ্ন কথা বা চালচলন একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এমনকী তিনি কাজকর্মও করতে শুরু করেছিলেন। হঠাৎ ওঁর একবার পেটের অসুখ করল। আমরা ডাক্তার ডাকলুম। উনি বললেন, ‘হোমিওপ্যাথি করবেন, অ্যালোপ্যাথি ওষুধ ওঁর বড্ড কড়া লাগে। এটা আমাদের একটু আশ্চর্য লাগল, কারণ অসুস্থ হবার আগে পর্যন্ত উনি হোমিওপ্যাথি দু-চক্ষে দেখতে পারতেন না, হোমিওপ্যাথদের ঠগ জোচ্চোর ইত্যাদি বলে গালাগাল করতেন। তবু, ব্যাপারটা আমরা খুব একটা সিরিয়াসলি নিইনি, কারণ বয়েস হলে অনেক লোকেরই অনেকরকম ধারণা পালটে যায়। তখন আমরা আমাদের পাড়ার সবচেয়ে নামকরা হোমিওপ্যাথকে নিয়ে এলুম। বাবা তাঁকে দেখাতে অস্বীকার করলেন। বললেন, ওঁর চেনা একজন ডাক্তার আছেন, তাঁকেই তিনি দেখাবেন। ডাক্তারের নাম রজার ওয়ালটন, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান, বসেন পার্ক সার্কাসে। এটাও আমাদের খুব অদ্ভুত লাগল। ব্যবসা সূত্রে আমাদের মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতে হয় বটে, কিন্তু ওঁর অসুখেরও অনেক আগে থেকেই এদিকে আসা বন্ধ ছিল। তাহলে এই অ্যাংলো ইন্ডিয়ান হোমিওপ্যাথের সঙ্গে ওঁর পরিচয়ই বা হল কখন আর আস্থা গড়ে ওঠবারই বা সময় হল কখন? যাহোক, তবু আমরা তাঁকে বাধা দিইনি, তার একটা কারণ ছিল বাধা দিলে না আবার হিতে বিপরীত হয়।

‘এই ডাক্তারের কাছে উনি বার পাঁচ-ছয় গিয়েছেন। তারপর হঠাৎ একদিন উনি আমাদের অর্থাৎ ওঁর ছেলে-মেয়েদের ডেকে পাঠালেন। বললেন, আমি উইল করতে চাই, তোমরা ডাক্তার প্রামাণিক, আমাদের ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান আর অ্যাডভোকেট নিতাই মল্লিককে খবর দাও। এঁরা দুজনেই আমাদের বাড়ির খুব কাছেই থাকেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই এঁরা দুজনেই এসে উপস্থিত হলেন। বাবা তখন এঁদের সামনে একটা ফুলস্ক্যাপ কাগজে স্বহস্তে একটা উইল লিখলেন। তারপর সেটা নিতাইকাকার হাতে দিয়ে বললেন, পড়ো, পড়ে সাক্ষীর জায়গায় সই করো। নিতাইকাকা উইলটা পড়লেন, পড়ে ভয়ানক গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর সেটা ডাক্তারকাকার হাতে দিয়ে বললেন, তুমি অন্যায় করছ শম্ভু, ভয়ানক অন্যায় করছ। ডাক্তারকাকাও সেই কথাই বললেন। তখন জানা গেল, বাবা তাঁর ব্যাঙ্কে গচ্ছিত সমস্ত টাকা, সব শেয়ার আর আচিপুরের দু-বিঘে ধানজমি নীলকান্তপুরের হাসপাতালকে লিখে দিয়েছেন। সেটা যদি এমনি করতেন তাহলে মানবিকতার খাতিরে হয়তো মেনে নেওয়া যেত। কিন্তু, সেইসঙ্গে এরকম কাজ করার কারণ হিসেবে তিনি তাঁর ছেলে-মেয়েদের দায়ী করেছেন। বলেছেন, তিনি নাকি কখনোই পাগল ছিলেন না। সম্পত্তির লোভে আমরা তাঁকে পাগল বানিয়েছি, অতএব তার

শাস্তিস্বরূপ তিনি তাঁর স্বোপার্জিত সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছেন আমাদের। ওঁর প্রকৃত বন্ধু নাকি নীলকান্তপুরের ডাক্তার বোসেরা।

'নিতাইকাকা কিন্তু সাক্ষীর জায়গায় তক্ষুনি সই করলেন না। বললেন, আমি এক্ষুনি এই কাগজে সই করছি না। আগে সমস্ত ব্যাপারটা আমাকে খতিয়ে দেখতে হবে। তুমি যা দান করতে চাইছ, সেটা করবার সত্যি সত্যি তোমার কোনো অধিকার আছে কিনা সেটা বিচার করে তারপর যা করবার করা যাবে। আমি আইনের লোক হয়ে এমন একটা দলিলে সই করতে পারি না যেটা আদালতে গ্রাহ্য নাও হতে পারে।

'বাবা অনেক পেড়াপেড়ি করলেন, কিন্তু নিতাইকাকা টললেন না। ডাক্তারকাকাও ওঁকেই সমর্থন করলেন। তারপর কাগজটা নিয়ে দুজনে উঠে পড়লেন। সেদিন রাত্রি থেকেই বাবা অসুস্থ হয়ে পড়েন। আর সুস্থ হননি। ওঁর মৃত্যুর পর নিতাইকাকা আমাদের বলেছিলেন যে কেউ ওঁকে এই উইল করবার জন্যে ব্রেন ওয়াশ করেছিল। আমাদের নামে ওইসব খারাপ কথা লেখবার একটা কারণ হচ্ছে যে আমরা মামলা করতে গেলে আদালতের সহানুভূতি বা অনুকম্পা আমাদের বিরুদ্ধে যাওয়ারই সম্ভাবনা বেশি হত। কিন্তু, রহস্য হল যে এরকম ব্রেন ওয়াশ করল কে?

'এ ছাড়া, আর একটা রহস্য হল, উনি হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খেতেন গোপনে। এক একবারে পাঁচ-ছ শিশি ওষুধ আনতেন, প্রত্যেকটি শিশি শেষ হওয়া মাত্র ভেঙে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিতেন। এটা যে কেন করতেন, তার কারণ তখনও বুঝিনি, আজও জানি না।

'এখন ব্যাপার হচ্ছে, এই রহস্যগুলোর কোনোটাই খুব ভয়ঙ্কর রকমের কিছু নয়। সবগুলো মিলিয়ে দেখলে মনে হয় কোথায় যেন একটা গণ্ডগোল আছে। হয়তো, বাবার মৃত্যুটা যতটা স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে, ততটা সম্ভবত নয়।'

বিবেকানন্দ চুপ করলেন। দময়ন্তী গভীর মনোযোগ দিয়ে ওঁর প্রতিটি কথা শুনছিল। এখন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'রজার ওয়ালটনকে আপনি দেখেছেন?'

'আমি দেখিনি। আমাদের ড্রাইভার রতন দেখেছে। সে বলেছে, সেই সাহেব ডাক্তার নাকি বেঁটেখাটো, চোখে নীল কাচের চশমা, মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, সবসময় সুট বুট পরে থাকেন। বয়েস চল্লিশের ওপরে।'

'আপনি দেখেননি কেন? ওঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যাননি কখনো?'

'না। উনি সাধারণত সপ্তাহের মাঝে কোনোদিন দুপুরবেলা যেতেন। তখন আমাদের সকলেরই কাজকর্ম থাকে। আর রতন আমাদের বহুদিনের লোক, ছোটোবেলা থেকে আমাদের পরিবারে মানুষ, সে আমাদেরই একজন বলতে পারেন। কাজেই, ওর সঙ্গে যাওয়ায় কারুরই কোনো অসুবিধে বা আপত্তির কোনো কারণ থাকতে পারে না।'

হেমন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'বেঁটে, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, সুটেড বুটেড— আগে বলেননি তো?'

'আপনি তো আমার কাছে সাহেব ডাক্তারের চেহারার বর্ণনা চাননি।'

'সে কথা ঠিক। কিন্তু আপনি তো ডাক্তার অরিজিৎ বোসকে দেখেছেন। তাঁর চেহারার সঙ্গে এই বর্ণনার কি অস্বাভাবিক মিল নয়?'

'হ্যাঁ, মিল আছে ঠিকই। কিন্তু ডাক্তার অরিজিৎ বোসকে রতনও দু-একবার দেখেছে। সাহেব ডাক্তার আর অরিজিৎ বোস এক লোক হলে ও ঠিক বুঝতে পারত।'

‘ছাই পারত! টাক মাথায় উইগ পরলে আর চোখে নীল কাচের চশমা লাগালে একটা মানুষের চেহারা আমূল পালটে যেতে পারে, সে কথা জানেন?’

দময়ন্তী প্রশ্ন করল, ‘সাহেব ডাক্তারের ঠিকানা জানেন?’

বিবেকানন্দ বললেন, ‘বাড়ির ঠিকানা তো জানি না। চেম্বারের ঠিকানা জানি। চোদ্দো নম্বর রহিম ওসমান লেন।’

‘আচ্ছা, যে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ আপনার বাবা খেতেন, সেগুলো কখনো দেখেছেন?’

‘দেখেছি। ছোটো ছোটো শিশি ভরতি জলের মতো ওষুধ। মনে হয় মাদার টিংকচার হবে।’

‘আপনার বাবা বাড়ি ফিরে আসার পর নীলকান্তপুর থেকে কেউ দেখা করতে এসেছে কখনো?’

‘না, কখনো নয়।’

‘এমন কোনো লোক এসেছে, যাকে আপনারা কেউ চিনতেন না?’

‘সেটা তো বলা কঠিন। উনি বাইরের ঘরে থাকলে অনেক লোকই আসত ওঁর সঙ্গে দেখা করতে। তাদের কেউ চেনা, কেউ-বা নয়। তা ছাড়া, সবসময় তো ওঁর সঙ্গে লোক থাকত না।’

‘উনি মর্নিং ওয়াক করতেন?’

‘করতেন। সেটা ওঁর থেরাপির একটা অঙ্গ ছিল। খুব ভোরে উঠে বেরিয়ে যেতেন। ঘণ্টা দেড়েক বাদে ফিরে আসতেন।’

‘সঙ্গে কেউ যেত না?’

‘প্রথম প্রথম যেত। পরে, উনি একাই যেতেন। অত ভোরে কেউ উঠতে চাইত না। উনিও একা যাওয়াই পছন্দ করতেন।’

‘উনি কি হাসপাতালে যাওয়ার আগেও মর্নিং ওয়াক করতেন?’

‘করতেন।’

‘এ উইল লেখার অব্যবহিত আগে কি আপনাদের সঙ্গে ওঁর কোনোরকম ঝগড়া হয়েছিল?’

‘হয়েছিল। আমার ছোটো ভাইয়ের স্ত্রীকে খুব বকাবকি করেছিলেন তার আগের দিন সন্ধ্যেবেলায়। ছোটো ভাই তার প্রতিবাদ করে। বাবা তাকে রাগের মাথায় কতগুলো এমন কথা বলেন, যেগুলো বলা তাঁর উচিত হয়নি। তখন আমি এবং আমাদের ছোটো বোন তার প্রতিবাদ করি। তখন তিনি রাগে দিশেহারা হয়ে আমাদের এই বলে শাসান যে আমাদের সকলকে উনি এমন শাস্তি দেবেন যা নাকি আমরা কোনোদিনও ভুলতে পারব না।’

‘তাহলে তো ওঁর উইল করা এবং তাতে আপনাদের বঞ্চিত করা খুব একটা রহস্যময় ব্যাপার বলে তো মনে হয় না। ওঁর দিক থেকে ব্যাপারটা যুক্তিপূর্ণ বলা চলে, তাই না।’

‘না, ঠিক তা বলা চলে না। আগেই বলেছি, রেগে গেলে ওঁর কোনো জ্ঞান থাকত না। কাজেই, এরকম ঝগড়া ঘন ঘন না হলেও মাঝে-মধ্যে হতই। সেদিন এমন কিছু হয়নি যাতে এই উইল লেখা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। তবু সেটা যদি মেনে নেওয়া যায়,

তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায় যে উইলের বয়ানটা উনি এমনভাবে লিখলেন কী করে যাতে সেই উইল আদালতে কনটেস্ট করা কঠিন হয়। উনি আইন যে ভালো জানতেন তা বলা যায় না আর এমন কিছু লেখাপড়াও শেখেননি যে নিজে নিজেই অমন ভাষায় একটা উইল লিখে ফেলবেন।'

'কতদূর লেখাপড়া করেছিলেন?'

'ম্যাট্রিক পাশ করেননি। খুব সম্ভব ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছিলেন।'

'আপনারা ভাই-বোন কজন? তাঁরা কে কী করেন?'

'পাঁচজন। তিন ভাই, দু-বোন। এক বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। সে শ্যামপুকুরে থাকে। ছোটো বোনের বিয়ে বাকি। আমি বড়ো। পারিবারিক ব্যবসা দেখি; মেজো ভাই আর্মিতে আছে— অফিসার। ছোটো ভাই দীননাথ কলেজে পড়াত। ছেড়ে দিয়ে আমার সঙ্গে কাজ শুরু করতে যাচ্ছে।'

বিবেকানন্দ চলে গেলে হেমন্ত বিজয়গর্বে শিবেনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'স্যার, এই রজার ওয়ালটন আর অরিজিৎ বোস যে একই ব্যক্তি, সে বিষয়ে আর আপনার কোনো সন্দেহ আছে?'

শিবেন ভাবলেশহীন মুখে সিগারেট টানতে টানতে বলল, 'আছে, প্রচুর সন্দেহ আছে। আগে আইডেন্টিফাই করাও, তারপর নিঃসন্দেহ হওয়া যাবে।'

দময়ন্তী এই বাক্যালাপে বাধা দিয়ে বলল, 'হেমন্তবাবু, আপনার অন্য দুটো বাড়িতে ইনভেস্টিগেশনের ফলাফল তো আমাকে জানালেন না?'

হেমন্ত আবার ব্যাগ খুললেন। বললেন, 'হ্যাঁ, এই যে। রেজাল্ট খুব ইন্টারেস্টিং। প্রথমে ধরুন, নির্ঝরিণী দেবী। ইনিও এক সাহেব হোমিওপ্যাথের কাছে যেতেন। পার্ক সার্কাসে। ডাক্তারের নাম অবশ্য ওঁর ভাগনির মনে নেই। গাড়িতে যেতেন। ড্রাইভার বলল, রাস্তার নাম রহিম ওসমান লেন। ওঁকে যে কে এই ডাক্তারের নাম রেকমেন্ড করেছিল তা কেউ জানে না। উইল করবার আগের দিন রাত্রে ভাগনি আর তার হাজব্যান্ডের সঙ্গে ওঁর তুমুল ঝগড়া হয়েছিল ঝি, চাকর আর ড্রাইভারের সামনে। উইলে সই আছে সলিসিটার হৃদয়রঞ্জন গাঙ্গুলি আর ডাক্তার প্রতাপ ভাদুড়ির। আপনি তো জানেন, দুজনেই খুব বিখ্যাত লোক, অত্যন্ত ব্যস্ত। এঁদের সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু একদিনের নোটিসে দেখা করা সম্ভব হয়নি। যদি বলেন তো কাল একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।

'এরপর ভোলানাথ চক্রবর্তী। ইনি ওঁর ভাগনের সঙ্গে ডাক্তারের কাছে যেতেন। একই ডাক্তার, একই ঠিকানা। ডাক্তার রুগি দেখতেন একা, তখন কাছে কেউ থাকত না। এঁর একটা ইনফরমেশন বেশ অদ্ভুত। ডাক্তারের চেম্বারে ওঁরা যখন যেতেন, তখন সেখানে একমাত্র একজন বেয়ারা গোছের লোক ছাড়া অন্য কোনো রুগি কখনো দেখা যেত না। এর কারণ হিসেবে ভোলানাথ অবশ্য বলতেন যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রুগিরা আসে, সাহেব ডাক্তার তো, কাউকে অপেক্ষা করতে হয় না।'

দময়ন্তী হাসল। বলল, 'বেশ, এই ডাক্তারের ব্যাপারটা মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে। কেবল এই রজার ওয়ালটনটি কে সেটা জানা প্রয়োজন। সে ব্যাপারে কি কোনো খোঁজখবর নিয়েছেন?'

'লোক পাঠিয়েছি আজ। রিপোর্ট কাল পাওয়া যাবে।'

‘উইলে কার কার সই আছে?’

‘ভোলানাথের উকিল সহদেব রায় আর ডাক্তার বিমল দাশগুপ্তের। সহদেব রায়ের সঙ্গে দেখা করেছি। উনি বললেন, ”এরকম উইল করে ভোলাবাবু উচিত কাজই করেছেন।” দেখলুম, ওঁর দুজন গলগ্রহের ওপরেই ভদ্রলোক মহা খাপ্পা। বিশেষত ভাগনেটির ওপর। বললেন, সে নাকি একটা ক্রিমিন্যাল, সোশ্যাল প্যারাসাইট, আরও কত কী! ওকে যা দিয়েছেন, তাও দেওয়া উচিত হয়নি।’

‘ভাগনে কী করে?’

‘কিছুই করে না। বড়োলোক মামা থাকলে করবার দরকারই বা কী?’

‘তাহলেও একটু ডিটেলস জেনে বলবেন? ভোলানাথের মামাতো ভাই আর নির্ঝরিণীর ভাগনীজামাই সম্পর্কেও একটু খোঁজখবর চাই।’

হেমন্ত প্রশ্রয়ের হাসি হাসলেন। বললেন, ‘যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই— সেইরকম ব্যাপার? ঠিক আছে, বলছেন যখন খোঁজখবর নেওয়া যাবে। কাল বাদে পরশু আসব। তার পরদিন ছুটি আছে। একটু সন্ধ্যে করেই আসব।’

দময়ন্তী মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

শিবেন ধরাচুড়ো পরেই ঘরে ঢুকল। বলল, ‘অফিস থেকে সোজা আসছি, বাড়ি যাইনি। হেমন্তও এখনই আসবে। আর রমলার আমার ওপর অর্ডার আছে আজ রাত্রে আপনাদের আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার। রাত্রের খাওয়াটা আজ ওখানেই।’

দময়ন্তী সহাস্যে বলল, ‘আমি জানি। রমলা দুপুরবেলা ফোন করেছিল।’

শিবেন সমরেশকে বলল, ‘তুই আবার অফিস থেকে ফিরে একগাদা জলখাবার খেয়ে রাখিস নি তো? তোর জন্যে রমলা স্পেশাল মাংসের বন্দোবস্ত করেছে। না খেলে তোর কপালে দুঃখ আছে।’

সমরেশ বলল, ‘স্পেশাল মাংস? সর্বনাশ! ভাগ্যিস কাল অফিস নেই।’

বলতে বলতেই হেমন্ত এসে উপস্থিত হলেন। ধপাস করে সোফায় বসে খাতা খুলে ফেললেন। বললেন, ‘আপনি যা যা জানতে চেয়েছিলেন, তার প্রায় সমস্ত ইনফরমেশনই জোগাড় করে এনেছি। কোনটা দিয়ে শুরু করব, বলুন?’

দময়ন্তী বলল, ‘ডাক্তার রজার ওয়ালটন, আর কে?’

‘ডাক্তার রজার ওয়ালটন ভাগলবা। তাঁর কোনো পাত্তাই নেই, চেম্বারে তালা ঝুলছে। বাড়িওলার কাছে এখনও দু-মাসের ভাড়া জমা আছে, তারপর সে নোটিশ দেবে, বলেছে। কিন্তু দেবে কাকে? রজার সাহেব তাকে নিজের যে ঠিকানা দিয়েছিলেন, সেটা একেবারেই ভুয়ো। ওরকম কোনো ঠিকানা কলকাতা শহরে নেই।’

‘বাড়িওলার নাম কী? কোথায় থাকে?’

‘নাম আবদুল লতিফ নুরুদ্দিন, ওই চোদ্দো নম্বর রহিম ওসমান লেনেই থাকেন। তিনতলায়। ডাক্তারের চেম্বার দোতলায়। একতলায় অনেকগুলো দোকান।’

‘দোতলাটা কি পুরোটাই ডাক্তার ভাড়া নিয়েছিলেন?’

‘না, আধখানা। সেদিকে দুটো ঘর। অন্যদিকে একটা অফিস আছে।’

দময়ন্তী প্রশ্ন করল, 'ওই ডাক্তার সম্পর্কে বাড়িওলা কী বলল?'

'বলল যে বছর তিনেক আগে এক ভদ্রলোক ওর কাছে এসে ফ্ল্যাটটা ভাড়া নেন। এক দালাল ওঁকে নিয়ে এসেছিল। তখন ওকে বলা হয়েছিল যে এই ডাক্তার বিলেত থেকে পাশ টাশ করে কলকাতায় ফিরে এসে চেম্বার খুলে বসতে চান। সপ্তাহে দু-চারদিন বসবেন। এক বছরের ভাড়া অগ্রিম দেন। ব্যস, এই পর্যন্ত। ডাক্তারকে বাড়িওলা দু-চারবার দেখেছে, সামান্য দু-একটা কথা হয়েছে, তার বেশি কিছু নয়।'

'বেশ, এবার ভোলানাথ আর নির্ঝরিণীর আত্মীয়দের কথা বলুন।'

'প্রথমে বলছি নির্ঝরিণীর ভাগনি আর স্বামীটির কথা। ভাগনির নাম মঞ্জুলা, খুব চাপা স্বভাবের, কথা কম বলেন, কিন্তু চোখের দৃষ্টি দেখলে বুকের রক্ত শুকিয়ে যায়। আমার তো মনে হয়েছে, নিঃশব্দে হেন কর্ম নেই যা ওই মহিলা করতে পারেন না। খুনখারাপি পর্যন্ত। বয়েস তিরিশের ওপর, কিন্তু কমবয়সি বলে মনে হয়। সোজা কথায়, আমি কখনো গায়ে পড়ে ওই মহিলার সঙ্গে কাজিয়া করতে যাব না, এই বলে দিলুম।'

'লেখাপড়া? কোনো কাজকর্ম করতেন বা করেন?'

'বি এ পাশ। কাজকর্ম কিছু করেন না। স্বামী আর মামী, এই নিয়েই আছেন।'

হেমন্তর রসিকতায় কেউ হাসল না। দময়ন্তী বলল, 'এবার স্বামীটির কথা বলুন।'

'হ্যাঁ, স্বামীর নাম পঙ্কজ রায়চৌধুরি, কিন্তু খুব একটা সার্থকনামা বলা চলে না। বরং উলটোটাই বলা যায়। পূর্ববঙ্গের কোনো জমিদার বংশে জন্ম। এখন মোটামুটি মামিশাশুড়ির অন্নদাস। লেখাপড়া শেখেননি। নানারকম ব্যবসা করতে গিয়ে ক্রমাগত লসই খেয়েছেন। আপাতত পুরোনো গাড়ি কেনা-বেচার ব্যবসা করছেন, তবে সেটাও টলটলায়মান। নানারকম নেশা আছে বলে মনে হল। নানারকম রোগও নিশ্চয়ই আছে। ফলে, চল্লিশ বছর বয়েসে দেখলে মনে হয় যেন পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছেন।

'এরপর আসছি ভোলানাথের মামাতো ভাইয়ের কথায়। এঁর নাম সোমনাথ ভট্টাচার্য। বয়েস তিরিশের একটু ওপরে হবে। নবকার্তিকের মতো চেহারা। এককালে পাড়ায় মস্তান বলে বেশ সুনাম বা দুর্নাম ছিল, কয়েক বার হাজতবাসও করেছেন। শুনেছি ইদানীং মতিগতি একটু ফিরেছে। কাজেকর্মে মন হয়েছে, চালচলন কিছু সভ্যভব্য হয়েছে।'

'কী কাজ করেন ইনি?'

'ওষুধের ব্যবসা করেন। কিছুদিন দাদার দোকানে বসেছিলেন, সেখান থেকেই বোধ হয় আইডিয়া পান। তারপর এখন কয়েকটা ছোটো-বড়ো কোম্পানির এজেন্ট। তারাতলা অঞ্চলে একটা গোডাউনও ভাড়া নিয়েছেন। মোটের ওপর নেহাত মন্দ নেই। তবে শুনেছি দাদার মতোই চণ্ডাল রাগ, ক্ষেপে গেলে মানুষ থাকেন না।'

'ভদ্রলোকের গাড়ি আছে?'

'আছে। একটা পুরোনো অ্যাম্বাসাডার। তবে বেশ ভালো কন্ডিশন। এই গাড়ি নিয়েই ডাক্তারের কাছে বড়োমামাকে নিয়ে যেতেন ওঁদের ভাগনে।'

'এরপর ভাগনের কথা বলুন।'

'ভাগনেটি তার ছোটোমামার মতোই পাড়ার মস্তান ছিল, কিন্তু তার থেকে আর কোনোরকম পদোন্নতি হয়নি, এখনও তাই রয়ে গেছে। শ্যামল রায়কে পাড়ার সবাই যথাসাধ্য এড়িয়ে চলে। কয়েক বার হাজতবাসের অভিজ্ঞতা আছে, মামার জোরে ছাড়া

পেয়ে এসেছেন এতদিন। কাজকর্ম কিছুই করে না। মাঝখানে সিনেমায় নেমেছিল, সুবিধে হয়নি।'

'বয়েস কত এর? চেহারা?'

'এরও বয়েস তিরিশের কাছাকাছি। সোমনাথের চেয়ে সামান্য ছোটো হবে। চেহারা সোমনাথের মতো অত সুন্দর না হলেও কাছাকাছি।'

'একবার হৃদয়রঞ্জন গাঙ্গুলি আর ডাক্তার প্রতাপ ভাদুড়ির সঙ্গে কথা বলবেন? ওঁরা কী বলেন জানতে পারলে ভালো হত।'

'ঠিক আছে। তাই হবে। তবে দু-একদিন দেরি হতে পারে।'

গাড়িতে উঠে শিবেন বলল, 'যাওয়ার পথে একবার চোদ্দো নম্বর রহিম ওসমান লেনটা ঘুরে যাব নাকি?'

দময়ন্তী সহাস্যে বলল, 'তাহলে তো খুব ভালোই হয়।'

'তা তো বুঝতেই পারছি। হেমন্তর দেখা যে আপনার খুব একটা পছন্দ হয়নি তাতে তো কোনো সন্দেহই নেই।'

'না, না, তা নয়। হেমন্তবাবুর কাজ তো কিছু খারাপ নয়। তবে কি জানেন, যে যুগে রাজারা কান দিয়ে দেখতেন, সে যুগেও তাঁরা কিন্তু মাঝে মাঝেই ছদ্মবেশে বেরিয়ে পড়তেন স্বচক্ষে রাজ্যের অবস্থা দেখবার জন্যে।'

'হুঁ, তা তো বটেই। কিন্তু, কি জানেন? এত রাতে ওখানে কোনো লোকজন পাওয়া যাবে কিনা বা বাড়ির দরজা খোলা পাওয়া যাবে কিনা, সে ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে।'

সমরেশ বলল, 'এত রাত মানে? সবে তো সাড়ে নটা। এটা কি একটা রাত হল?'

শিবেন বলল, 'তোর কাছে হয়তো হল না। কিন্তু অনেকের কাছেই এটা অনেক রাত।'

কিন্তু গাড়ি যখন রহিম ওসমান লেনে পৌঁছল, তখন দেখা গেল যে শিবেনের সন্দেহ নিতান্তই অমূলক। রাস্তাটা লেন বটে, কিন্তু মোটেই কোনো সরু এঁদো গলি নয়। যথেষ্ট চওড়া। অনেক দোকান, তাদের বেশিরভাগই বন্ধ। কিন্তু পানের দোকান, চায়ের দোকান আর রেস্টুরেন্টগুলো খোলা, রাস্তায় অনেক লোক আর প্রচুর শব্দ যার বেশিরভাগই আসছে একটা ফুটপাথের ক্যাসেটের দোকানের তারস্বর স্পিকার থেকে।

চোদ্দো নম্বর বাড়িটা তিনতলা। মাঝখানে সিঁড়ি, দু-পাশে ফ্ল্যাট। একতলার একদিকে একটা দর্জির দোকান, অন্যদিকে একটা পাম্পসেট এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতির শোরুম। দুটোই বন্ধ। দোতলার পুরোটাই অন্ধকার। তিনতলার আলো জ্বলছে। একতলার সিঁড়ির দরজাটা খোলা।

শিবেন বাড়ির সামনে গাড়ি রাখল।

দময়ন্তী জিজ্ঞেস করল, 'বাড়ির ভেতরে এখন ঢোকাটা বোধ হয় উচিত হবে না, না?'

শিবেন মাথা নাড়ল। বলল, 'না। উচিত হবে না। তার ওপর, আবার ইউনিফর্ম পরে আছি। এটার আবার একেকজনের ওপর একেকরকমের এফেক্ট হয়, জানেন তো?'

দময়ন্তী হাসল। বলল, 'তা আর জানি না? তার ওপর, হেমন্তবাবু কালই এসে জিজ্ঞাসাবাদ করে গেছেন। কাজেই, আজকে বোধ হয় আমাদের ফিরে যাওয়াটাই শ্রেয় হবে। তবে, জায়গাটা কেমন সেটা জানবার ইচ্ছে ছিল, সেটা জানা গেল।'

সমরেশ জিজ্ঞেস করল, 'জায়গাটা কেমন, মানে?'

'মানে নির্জন বা অন্যরকম, এই আর কী!'

এই কথার মধ্যে একজন প্রৌঢ় মুসলমান ভদ্রলোক আস্তে আস্তে গাড়িটার দিকে এগিয়ে এলেন। ভদ্রলোক বেঁটেখাটো, দোহারা চেহারা, মাথাজোড়া টাক, মুখে কাঁচা-পাকা চাপ দাড়ি, পরনে গেরুয়া খদ্দরের পাঞ্জাবি আর ঢোলা পাজামা।

নীচু হয়ে শিবেনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কাউকে খুঁজছেন কি? ওঃ, আপনি দেখছি পুলিশ।'

শিবেন বলল, 'হ্যাঁ, আমি পুলিশই বটে। আচ্ছা, ওই বাড়িতে বাড়িওলা যিনি থাকেন, তাঁকে আপনি চেনেন? তাঁর নাম বোধ হয় আবদুল লতিফ নুরুদ্দিন।'

ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, 'চিনি। আমিই আবদুল লতিফ। কী ব্যাপার বলুন তো? আপনারাও কি ওই ওয়ালটনের সম্পর্কে খোঁজখবর করতে এসেছেন নাকি? কী করেছে কি লোকটা?'

আবদুল লতিফ হয়তো আরও প্রশ্ন করতেন, কিন্তু তার আগেই গাড়ির তিনজন আরোহী বেরিয়ে এসে তাঁকে নমস্কার করায় তা আর পারলেন না। দময়ন্তীর পরিচয় পেয়ে তিনি যে ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গেছেন তা তাঁর মুখের অবস্থা দেখেই পরিষ্কার বোঝা গেল। মিনমিন করে বললেন, 'চলুন, বাড়ির ভেতরে যাই।'

দময়ন্তী বলল, 'না, না, এখন আপনাকে আর বিরক্ত করব না। শুধু যদি দয়া করে ডাক্তার ওয়ালটনের সম্পর্কে কিছু বলেন।'

আবদুল লতিফ বললেন, 'কী আর বলব? ওকে আমি দেখেছি বোধ হয় সাত-আট বারের বেশি নয়। রোজ তো আসত না, মাঝে মাঝে আসত। রুগি প্রায় ছিলই না। হয়তো অন্য কোথাও সে লোকটার চেম্বার ছিল। তবে আমার এখানে চেম্বারে ভিড় টিড় কখনো দেখিনি। ওর একটা বেয়ারা ছিল, ববি রোজারিও, নূরপুরে বাড়ি, সে আমাকে মাঝে মাঝে ভাড়া দিয়ে যেত।'

'আপনি কি কখনো ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছেন?'

'বলেছি। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-নামতে বা এই ফুটপাথে।'

'কোনো অস্বাভাবিক কিছু কখনো লক্ষ করেছেন কি? চেহারায় বা চালচলনে বা কথাবার্তায়?'

'নাঃ, কিচ্ছু না। তবে সাধারণ অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের তুলনায় লোকটা বেশ ভদ্র আর মার্জিত ছিল। অবশ্য, তা তো হবেই— শত হলেও ডাক্তার তো।'

'শুনেছি লোকটা খুব বেঁটে ছিল। তাই কি?'

'না, না, মোটেই বেঁটে ছিল না। এই সমরেশবাবুর তুলনায় হয়তো বেঁটে, আমাদের তুলনায় একেবারেই নয়। কে বলেছে আপনাদের?'

'ওর রুগি শম্ভুচন্দ্র ধাড়ার ড্রাইভার।'

‘ওঃ রতন? ও তো বলবেই। তাকে দেখেননি বুঝি? তালগাছের মতো লম্বা।’

‘রতনকে আপনি চেনেন?’

‘চিনি না? শম্ভুবাবুকে নিয়ে ডাক্তারের চেম্বারে ঢুকিয়ে দিয়ে আমার কাছে এসে বসত আর দুনিয়ার আষাড়ে গপ্পো জুড়ে দিত। আচ্ছা, এই ডাক্তারটা কী করেছে? খুনটুন করেছে নাকি?’

‘সেইটে তো সঠিক বোঝা যাচ্ছে না। আপনার কি ধারণা, লোকটা খুন করতে পারে?’

‘পারে। লোকটাকে আমার ভালো লাগত না। খুব হাসিখুশি ছিল ঠিকই, কিন্তু হাসিটা পরিষ্কার ছিল না। আসলে কি জানেন, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি আর চোখে কালো চশমা দেখলেই যেন কেমন কেমন মনে হয়।

খাওয়াদাওয়ার পর শিবেনের বসার ঘরে কথা হচ্ছিল। শিবেন বলল, ‘একটা জিনিস বোঝা গেল যে ডাক্তার ওয়ালটন সমরেশের চেয়ে খাটো, আবদুল লতিফের চেয়ে লম্বা। অর্থাৎ পাঁচ চার থেকে পাঁচ এগারোর মধ্যে। কিন্তু পাঁচ আট থেকে পাঁচ এগারো বাদ দেওয়া যেতে পারে, কারণ রতন যতই তালগাছের মতো লম্বা হোক না কেন, এরকম হাইটের লোকেদের সে কখনোই বেঁটে বলবে না। আমার ধারণা রজার সাহেবের উচ্চতা পাঁচ চার থেকে পাঁচের মধ্যে। বড়োজোর মেরে কেটে সাড়ে পাঁচ।’

সমরেশ বলল, ‘ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, কালো চশমা, অপরিষ্কার হাসি, সবসময় সুটবুট পরা। নির্ঘাত ছদ্মবেশ। তুমি কি বলো?’

দময়ন্তী অন্যমনস্কভাবে বলল, ‘হতে পারে। তবে আমি কিন্তু সে কথা ভাবছি না। আমার আশ্চর্য লাগছে যে রহিম ওসমান লেন বেশ একটা জনবহুল জায়গা আর ডাক্তার ওয়ালটন আবদুল লতিফ সাহেবের সঙ্গে সিঁড়িতে বা ফুটপাথে দেখা হলে হেসে হেসে কথা বলেছেন।’

শিবেন আর সমরেশ মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। তারপর শিবেন বলল, ‘আর কী কী ব্যাপারে আপনার আশ্চর্য লাগছে?’

দময়ন্তী মৃদু হাসল। বলল, ‘লক্ষ করে দেখুন, যে দুজন তাঁদের সম্পত্তি নীলকান্তপুরকে দান করে গেছেন এবং আর একজন যিনি তা করতে যাচ্ছিলেন, তাঁদের কেউই কিন্তু তাঁদের আশ্রিতদের ঘরছাড়া করেননি যদিও তাঁদের ওপর রাগের বশেই এঁদের উইল করা।

‘ভোলানাথ, নির্ঝরিণী বা শম্ভুচন্দ্র— এঁদের কারুর সঙ্গেই বাড়ি ফিরে আসার পর নীলকান্তপুরের বিশেষ যোগাযোগ ছিল না। যেটুকু ছিল, সেটা তাঁদের আত্মীয়দের সামনেই ছিল, কোনো গোপনীয়তা ছিল না। অথচ, কেউ এঁদের ডাক্তার ওয়ালটনের নাম রেকমেন্ড করেছিল। কীভাবে করেছিল?’

শিবেন জিজ্ঞেস করল, ‘আপনার কি ধারণা যে এই ওয়ালটনই এঁদের আত্মীয়ের বিরুদ্ধে কুচিন্তা, উইল করার কুযুক্তি আর বিষাক্ত ওষুধ সাপ্লাই করত?’

‘হ্যাঁ, আমার ধারণা অনেকটা সেরকমই বটে। কিন্তু কে এই রজার ওয়ালটন? কে হতে পারে? আচ্ছা, নূরপুরে ববি রোজারিওর সন্ধান চালানো যায়?’

‘যায়। কালই লোক পাঠাচ্ছি। লোকাল থানায়ও খবর নিচ্ছি। যদিও সুবিধে বিশেষ হবে বলে মনে হয় না।’

‘আমারও মনে হয় না। একবার আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করা যাবে?’

‘যাবে। চলুন, কাল ভোলানাথের বাড়ি যাওয়া যাক। রোববার আছে, ভাইটিকে হয়তো পাওয়া যাবে। ভাগনের অবশ্য যাঁহা রোববার তাঁহা অন্যান্য দিন। সকালবেলাই যাওয়া যাবে।’

‘বেশ, তাই চলুন।’

শিবেন মাথা চুলকে বলল, ‘আর একটা কথা বলব?’

‘বলুন।’

‘খুব লম্বা কোনো মেয়েকে ছেলেদের পোশাক পরালে তাকে তখন কিন্তু বেঁটে পুরুষমানুষ বলে মনে হয়।’

দময়ন্তী হেসে উঠল। বলল, ‘হ্যাঁ, তাই হয় বটে।’

শ্যামবাজারে ভোলানাথ চক্রবর্তীর বাড়ি। মাঝখানে উঠোন ঘিরে চারদিকে অসংখ্য ঘর নিয়ে তিনতলা বাড়ি। একতলাটা গোডাউন, উঠোন জুড়ে প্যাকিং বাক্সের সমারোহ। দোতলাটা সম্পূর্ণ আর তিনতলায় আংশিক ভাড়া। বাকি অংশটায় থাকতেন ভোলানাথ। সেখানে পাঁচটা ঘর। একটা বসবার, বাকি চারটে শোবার।

বসবার ঘরটা প্রকাণ্ড, স্যাঁতসেঁতে আর একটু অন্ধকার। একদিকে মাত্র দুটো জানলা এতবড়ো ঘরের পক্ষে যথেষ্ট আলো-হাওয়া ঢোকাতে পারে না। মেঝেয় অতি প্রাচীন একটা কার্পেট, তার ডিজাইন আজ কারুর বোঝা দুঃসাধ্য, কতকাল যে পরিষ্কার হয় না কে জানে! দেওয়ালে কতগুলো অতি প্রাচীন ছবি। তাদের অবস্থাও ওই কার্পেটেরই মতো, কার বা কীসের ছবি বোঝবার উপায় নেই। ঘরের একপাশে একটা অতি প্রাচীন অতিকায় সোফাসেট আর মার্বলটপ সেন্টার টেবিল, অন্যপাশে একটা আইভরি ইনলেড টেবিল ঘিরে পাঁচটা উঁচু ব্যাকরেস্টওলা কারুকার্য করা চেয়ার।

অতিথি তিনজন এই চেয়ারেই বসেছিল, সাহস করে সোফায় আর বসে উঠতে পারেনি। বাকি দুটো চেয়ার দখল করে বসেছিল ভোলানাথের মামাতো ভাই সোমনাথ আর ভাগনে শ্যামল। এদের দুজনেরই পরনে সাদা পাঞ্জাবি আর পাজামা। হেমন্ত ঠিকই বলেছিলেন, দুজনেই অত্যন্ত সুদর্শন, তবে শ্যামল উদ্ধত, দুর্বিনীত আর সোমনাথ দৃশ্যত শান্ত, ঠান্ডা মাথার লোক।

শ্যামল বলছিল, ‘কেন আপনারা বারবার আমাদের বিরক্ত করছেন, বলুন তো? বড়োমামা মারা গেছে জন্ডিসে, ডাক্তার দাশগুপ্ত যতই ফালতু ডাক্তার হোক না কেন, কোনোরকম গোলমাল থাকলে ঠিক ধরতে পারত। কিন্তু সেও ডেথ সার্টিফিকেট দিয়েছে চুপচাপ।’

সোমনাথ বলল, ‘তুই চুপ কর শ্যামল। আচ্ছা, ব্যাপারটা কী বলবেন? ছোড়দা মারা গেছে অনেকদিন হল। তারপর থেকে অনেক বার আপনারা এসেছেন, আমাদের সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছেন কিন্তু খোলসা করে একবারও বলছেন না যে কেন এসব করছেন। কখনো বলছেন, ছোড়দার মৃত্যু নাকি স্বাভাবিক নয়, মানে কেউ তাকে খুন করেছে।

হাস্যকর কথা। ডাক্তার বলেছে স্বাভাবিক মৃত্যু, মৃতদেহ দাহ করা হয়ে গেছে, এখন এসব কথা বলার কোনো মানে হয়? আবার কখনো বলছেন, ডাক্তার মিসেস বোসের মার্ডারের সঙ্গে ছোড়দার মৃত্যুর সম্পর্ক আছে! সেটা আরও হাস্যকর কথা, কারণ ছোড়দা মারা গেছে ওই মার্ডারের বহু আগে। তাহলে সেই মার্ডারের সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকে কীভাবে?'

শিবেন বলল, 'দেখুন, আপনার আমাদের ওপর অসন্তুষ্ট হওয়া অন্যায় নয়। আসলে কি জানেন, অনেকগুলো রহস্য জট পাকিয়ে রয়েছে। আপনাদের একটু সাহায্য পেলে সেই জট ছাড়াতে আমাদের একটু সুবিধে হয়।'

'আর কীভাবে আপনাদের সাহায্য করব বলতে পারেন? আপনাদের সব প্রশ্নের উত্তর তো আমরা দিয়ে দিয়েছি! আরও কিছু বাকি আছে?'

'সামান্য কিছু বাকি আছে।' বলল দময়ন্তী, 'আপনাদের কয়েকটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করলে কোনো আপত্তি থাকবে কি?'

'নিশ্চয়ই থাকবে। নীলকান্তপুর না ধাপধাড়া গোবিন্দপুর কোথায় এক মহিলা ডাক্তার খুন হলেন, আর তাঁর মেন্টাল হোমের এক মৃত রুগির আত্মীয় হয়ে আমাকে পার্সোনাল প্রশ্নের জবাব দিতে হবে— এটা খুব বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?'

দময়ন্তী হাসল। বলল, 'হ্যাঁ, তা যে হচ্ছে না, তা নয়। ঠিক আছে। আমাদের ফিরে যাওয়াটাই বোধ হয় এখন বাঞ্ছনীয়। কেবল, যাওয়ার আগে একটা প্রশ্ন করতে চাই। ইচ্ছে হলে উত্তর দেবেন, না হলে দেবেন না।'

সোমনাথ গম্ভীর মুখে বলল, 'প্রশ্ন আপনি নিশ্চয়ই করবেন এবং উত্তরও আমাকে দিতেই হবে। উত্তর দিতে রিফিউজ করলে হয়তো আমাকেই খুনি বলে সন্দেহ করতে শুরু করবেন।'

দময়ন্তী হাসতে হাসতেই মাথা নাড়ল। বলল, 'না, না, ব্যাপারটা অতদূর গড়াবে না। যাই হোক, আমার প্রশ্নটা হল, একতলায় একটা গোডাউন থাকতেও আপনি তারাতলায় একটা গোডাউন ভাড়া নিয়েছেন কেন?'

উত্তর দিল শ্যামল। বলল, 'এ বাড়ির গোডাউনগুলো বড়োমামার ছিল। ছোটোমামা যখন ব্যবসা শুরু করে, বড়োমামা তখন ওকে ওটা ব্যবহার করতে অ্যালাউ-ই করল না। তাই তো...

গাড়িতে উঠে শিবেন বলল, 'এখানকার কাজ তো বেশ তাড়াতাড়িই হয়ে গেল। যাবেন নাকি বিদ্যেসাগর রোডে এখনই? বেশি দূরে তো নয়। যেতে বড়োজোর দশ মিনিট লাগবে।'

দময়ন্তী সম্মতি জানাল।

বিদ্যাসাগর রোড বেলগাছিয়ায়। বেশ চওড়া রাস্তা, দু-পাশের বাড়িগুলো অনেক জমি নিয়ে তৈরি। একমাত্র ঢোকার মুখে একটা প্রকাণ্ড ফ্ল্যাটবাড়ি ছাড়া বাকি সবগুলোই বেশ সুদৃশ্য।

রানি নির্ঝরিণীর বাড়িটা দোতলা, সামনে বাগান, পেছনের অনেকটা জমি আছে। গেটের থামে শ্বেতপাথরের ফলকে লেখা আছে, 'এস্টেট অফ মহারাজা অফ হিরাগঞ্জ।'

‘হিরাগঞ্জটা আবার কোথায়?’ সমরেশ জিজ্ঞাসা করল।

শিবেন গাড়ির দরজা লক করতে করতে বলল, ‘ইস্ট পাকিস্তানে কোথাও ছিল। খুব সম্ভব রাজশাহীতে।’

নুড়ি পাথর ছড়ানো রাস্তা দিয়ে কড়মড় আওয়াজ করতে করতে তিনজনে ভেতরে ঢুকল। শব্দ শুনে একতলার বারান্দায় যিনি বেরিয়ে এলেন, তিনি অভ্যাগতদের দেখে খুব একটা পুলকিত হয়েছেন বলে মনে হল না। ভদ্রলোক হাড়-জিরজিরে রোগা, গালভাঙা, চোখ গর্তে বসা, চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে, অনেকটা ছাগলের মতো, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পরনে একটা আধময়লা গেঞ্জি আর গোলাপি রঙের স্লিপিং পাজামা। দময়ন্তীর সর্বাঙ্গে একটা অশ্লীল দৃষ্টি বুলিয়ে মুখ বেঁকিয়ে প্রশ্ন করলেন, ‘কে আপনারা? কী চান?’

শিবেন সকলের পরিচয় দিল। তাতে ভদ্রলোকের মুখের বিরক্তি আরও ঘনীভূত হল। বললেন, ‘মেয়েছেলে গোয়েন্দা? সঙ্গে পুলিশ। তা, আমার সঙ্গে কি? এই সাতসকালে?’

শিবেন বলল, ‘আমরা আপনার মামিশাশুড়ির মৃত্যুর ব্যাপারে কিছু খোঁজখবর নিতে এসেছি পঙ্কজবাবু।’

‘আবার কীসের খোঁজখবর। হয়ে গেছে তো একপ্রস্থ। যত্ত ঝামেলা! মশাই, আমার মামিশাশুড়ি অনেকদিন হল স্বর্গে গেছেন। নিজেও বেঁচেছেন, আমাদেরও বাঁচিয়েছেন। আবার তাঁকে নিয়ে টানাটানির কি দরকার?’

‘কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে?’ জনান্তিকে বলল সমরেশ।

কথাটা কিন্তু কানে গেল ভদ্রলোকের। বললেন, ‘ঠিক বলেছেন। বাঃ, দাদা। আপনার তো দেখছি দিব্যি কবিতা টবিতা আসে, অ্যাঁ! পুলিশের হৃদয়ে কাব্যি? ভাবাই যায় না।’ বলে একগাদা হলদে এবড়োখেবড়ো দাঁত বের করে হাসলেন।

সমরেশ বলল, ‘আমি মশায় পুলিশ টুলিশ নই। আমি হচ্ছি এই মহিলার দরোয়ান।’

‘দারোয়ান? বলেন কি? ভাগ্যবান লোক মশাই আপনি, খাসা চাকরিটা জোগাড় করেছেন। যদি কখনো ছাড়ার কথা ভাবেন তো আমাকে খবর দেবেন, আমি হচ্ছি একজন ক্যান্ডিডেট।’ বলে পুনরায় হলদে দন্তবিকাশ করলেন।

দময়ন্তী এই বাক্যালাপে বাধা দিল। বলল, ‘আমরা কি ভেতরে গিয়ে কথাবার্তা চালাতে পারি?’

বিনয়ে অবনত হয়ে পঙ্কজ বললেন, ‘বিলক্ষণ! ভেতরে আসবেন বই কী। মহিলাদের পঙ্কজ রায়চৌধুরি কক্ষনো বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখে না। তার ওপর সঙ্গে পুলিশ। ধুলো পায়ে বিদেয় করলে যে কী আতান্তরে পড়ব তা কি আর আমি জানি না ভেবেছেন?’

শিবেন আরক্ত মুখে কিছু বলতে যাচ্ছিল, বাধা দিল দময়ন্তী। নিঃশব্দে তিনজন পঙ্কজের পেছনে পেছনে বাড়ির ভেতরে ঢুকল। ড্রইংরুমটা অনেকটা বাংলা সিনেমায় যেরকম দেখা যায়, সেইরকম। একটা চওড়া সিঁড়ি, তার গোড়ায় সোফাসেট পাতা, সিঁড়ির রেলিংয়ের পাশে একটা স্ট্যান্ডার্ড ল্যাম্প, মাথার ওপরে একটা দর্শনীয় ঝাড়লণ্ঠন। সোফাসেটের মাঝখানে সেন্টার টেবিলের ওপর একটা দিশি হুইস্কির বোতল আর একটা গেলাস শোভা পাচ্ছে। গেলাসে তখনও কিছু তরল পদার্থ বিদ্যমান।

পঙ্কজ অতিথিদের সোফায় বসিয়ে পুনশ্চ হলদে দাঁত বের করে বললেন, ‘হেঁ হেঁ, মানে, সক্কালবেলাতেই মদ্যপান করছিলুম, সে কথা যেন ভেবে বসবেন না। আসলে, কাল

রাতে একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল কিনা, তাই তার খোঁয়াড়ি ভাঙছিলুম আর কী।' বলে একটা চেয়ার টেনে একপাশে বসলেন। তারপর অলসভাবে সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'বলুন, কীভাবে আমি আপনাদের সাহায্য করতে পারি।'

দময়ন্তী বলল, 'আমরা আপনাকে এবং আপনার স্ত্রীকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। তার উত্তর পেলে উপকৃত হব।'

পঙ্কজ নাটকীয়ভাবে মুখে বিষণ্ণ ভাব এনে বললেন, 'অবশ্য, অবশ্য। তবে প্রশ্নগুলো কি আমাদের একসঙ্গে করবেন? আমাকে আলাদা আড়ালে করতে হত না?'

দময়ন্তী নির্বিকার মুখে বলল, 'হ্যাঁ, আপনাকে আলাদাই প্রশ্ন করা হবে। আমরা আড়ালে কোথায় যেতে পারি, বলুন, সেখানেই যাওয়া যাবে। আমাদের প্রশ্নগুলো আপনার স্ত্রীর না শোনাই বাঞ্ছনীয়।'

এইবার পঙ্কজের মুখে অকৃত্রিম উদবেগের ছায়া পড়ল। বললেন, 'কেন? আমার মামিশাশুড়ির মৃত্যুর সঙ্গে আমার কীসের সম্পর্ক, অ্যাঁ, যে সে সম্বন্ধে কথা আমার স্ত্রী শুনতে পাবে না? এ ব্যাপারে আমাকে ফাঁসানোর ধান্দা? বটে?'

'ফাঁসানো মানে? কীভাবে ফাঁসানো?'

পঙ্কজ ব্যাকুলভাবে এদিক-ওদিক তাকালেন। 'না, মানে, ফাঁসানো মানে...'

বাধা এল সিঁড়ির ওপর থেকে। একটা নারীকণ্ঠ হিসহিস করে উঠল, 'চুপ করো, গাধা কোথাকার! মদ খেলে মাথা ঠিক রাখতে পারো না তো খাও কেন? একদম মুখ না খুলে চুপ করে বসে থাকো।'

সেই কথার ছোবলে পঙ্কজের সমস্ত শরীরটা যেন কুঁকড়ে গেল। নারীকণ্ঠের অধিকারিণীটি এবার তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলেন। ইনি অবশ্যই মঞ্জুলা রায়চৌধুরি, নির্ঝরিণীর ভাগনি। আঁটসাট শরীর, গৌরবর্ণা, সুন্দরী। নীচে নামার আগে একটু প্রসাধনও করে নিয়েছেন মনে হচ্ছে। কিন্তু চাপা পাতলা ঠোঁটে এবং ছোটো ছোটো চোখে এমন একটা ঠান্ডা কাঠিন্য যে মনে হয় না যে কেউ কখনো সাহস করে এর সঙ্গে ঠাট্টা ইয়ার্কি করবার চেষ্টা করতে পেরেছে।

মঞ্জুলা দময়ন্তীর সামনে দাঁড়িয়ে একটু অবজ্ঞার ভঙ্গিতে নীচু গলায় বললেন, 'আপনার নাম আমি শুনেছি। আপনি যা জিজ্ঞেস করার আমাকে করতে পারেন। আমি মঞ্জুলা রায়চৌধুরি, হীরাগঞ্জ এস্টেটের আমিই উত্তরাধিকারিণী।'

দময়ন্তী মৃদু হেসে মাথা নাড়ল। বলল, 'ধন্যবাদ। আপনার মামিমার মৃত্যু যে স্বাভাবিক নয়, তাঁকে যে খুন করা হয়েছে, সেকথা কি আপনার জানা আছে?'

'পুলিশ সেইরকমই বলেছে বটে। প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত আমি জানি না!'

'আপনার মামিমা পার্ক সার্কাসে এক হোমিওপ্যাথের কাছে যেতেন। কে তাঁকে নাম রেকমেন্ড করেছিল?'

'আমি জানি না।'

'সেটা খুবই আশ্চর্য ব্যাপার। রানি নির্ঝরিণীকে আপনারা দেখাশুনো করতেন, নিশ্চয়ই একজন না একজন সবসময়েই তাঁর কাছে থাকতেন। অথচ কে তাঁকে একজন কলকাতায় সদ্য-আসা ডাক্তারের নাম জানাল, সেটা আপনারা জানেন না?'

‘মামিমার কাছে সবসময়েই আমি বা আমার স্বামী বসে থাকতুম, আপনার এ ধারণা ভুল। মামিমার একজন নাইট নার্স আর একজন আয়া ছিল। আমাদের পক্ষে চব্বিশ ঘণ্টা তাঁর কাছে বসে থাকা সম্ভব ছিল না।’

‘তা তো বটেই। আচ্ছা, এই নার্স বা আয়া আপনি কোত্থেকে পেয়েছিলেন? প্রজ্ঞা মনবিশ্লেষণ দিয়েছিল কি?’

‘না। আয়াটিকে পেয়েছিলুম আমাদের পাড়ার এক নার্সিং হোম থেকে।’

‘কী নাম সেই নার্সিং হোমের? ঠিকানা জানেন?’

‘জানি। এই রাস্তার মুখে একটা বড়ো ফ্ল্যাটবাড়ি আছে, নাম বাসবদত্তা। তার দোতলায় একটা নার্সিং হোম আছে, নাম ড. তালুকদার’স ক্লিনিক অ্যান্ড নার্সিং হোম।’

‘বেশ। আর নার্স? তাকে কোথায় পেয়েছিলেন?’

একটু চিন্তা করলেন মঞ্জুলা। তারপর বললেন, ‘আমার ঠিক মনে নেই। অনেকদিন আগেকার কথা। আমাদের কোনো বন্ধু বোধ হয় দিয়েছিলেন।’

‘আপনাদের কি অনেক বন্ধু?’

‘আছেন কয়েক জন।’

‘তাঁদের মধ্যে কে হতে পারেন? মনে করতে পারছেন না?’

‘না।’

‘আপনি কি শম্ভুচন্দ্র ধাড়া বা ভোলানাথ চক্রবর্তীকে চিনতেন?’

‘না।’

‘আপনাদের বাড়িতে যে আয়া কাজ করতেন, তার নাম কী?’

‘যদ্দূর মনে পড়ে লীলা হালদার।’

‘আপনাদের ড্রাইভার যে আপনার মামিমাকে পার্ক সার্কাসে নিয়ে যেত, তার সঙ্গে একটু কথা বলা যাবে?’

‘না, তাকে আমরা বিদেয় করে দিয়েছি।’

‘তার ঠিকানা জানেন?’

‘না।’

‘আপনার মামিমা যে উইল করে গেছেন, আদালতে তার বিরুদ্ধে কোনোরকম মামলা করবেন না?’

‘না, করে কোনো লাভ নেই। উনি আটঘাট বেঁধেই উইল করেছেন। পায়ে পা দিয়ে উইল করার আগের দিন প্রচণ্ড ঝগড়া করেছেন। উকিল আর ডাক্তার দিয়ে সাক্ষীর সই করিয়েছেন। যা গেছে, তা তো গেছেই। মামলা করতে গেলে যা আছে, সেটুকুও যাবে।’

‘আপনার কি মনে হয় যে এই উইল করার পেছনে কোনো ষড়যন্ত্র কাজ করছে?’

‘না। আমার তা মনে হয় না। উনি যা করেছেন তা সচেতনভাবেই করেছেন। অন্য কেউ ষড়যন্ত্র করে করিয়েছে, তা হতে পারে না।’

‘আপনি কি আপনার মামিমাকে খুব শ্রদ্ধা বা ভক্তি করতেন?’

প্রশ্নটা শুনে পঙ্কজ গলার মধ্যে হেঁচকির মতো একটা শব্দ করলেন, মঞ্জুলা কোনো কথাই বললেন না।

অতঃপর ড.: তালুকদার'স ক্লিনিক অ্যান্ড নার্সিং হোমে শ্রীমতী লীলাবতী হালদার। মোটাসোটা কালোকোলো মহিলা, বয়েস তিরিশ থেকে পঞ্চাশ যা-খুশি হতে পারে। তার অনর্গল বাক্যস্রোতের ভেতর থেকে যে কটি তথ্য বের করা গেল, তা হচ্ছে— এক, পঙ্কজ রায়চৌধুরি একটি অত্যন্ত পাজি বদমাশ লোক। দুই, তাঁর স্ত্রী মঞ্জুলা একটি অত্যন্ত পাজি বদমাশ মহিলা, তিন, ওঁদের ড্রাইভার হরিপদ একটি অত্যন্ত পাজি বদমাশ লোক এবং চার, রানি নির্ঝরিণী একটি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, চিন্তার বাইরে পাজি বদমাশ মহিলা। এইসব ভয়ানক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের বাইরে আর কিছুই লীলাবতীর কাছ থেকে জানা গেল না। এমনকী নাইট নার্স সম্পর্কেও নয়।

বাসবদত্তা থেকে বেরিয়ে শিবেন গাড়ির চাবিটা সমরেশের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'তুই চালা। বউদি, আপনি সামনে বসুন। আমি পেছনের সিটে বসে একটু চিন্তা করি।'

'তুই চিন্তা করবি?' বলে সমরেশ হ্যা হ্যা করে হাসতে লাগল।

শিবেন চোখ পাকিয়ে বলল, 'চুপ কর, পাজি বদমাশ কোথাকার!'

দময়ন্তী সহাস্যে বলল, 'কী চিন্তা করছেন, বলুন।'

'দেখুন, দুটো কথা আমার কাছে আজকের অভিজ্ঞতা থেকে স্পষ্ট হল। প্রথমত, যাঁরা মারা গেছেন, তাঁদের কেউই তাঁদের আত্মীয়দের কাছে খুব একটা শ্রদ্ধা বা ভক্তিভাজন ছিলেন না। শম্ভুচন্দ্র ছাড়া বাকি দুজন বাইরের লোকের কুপরামর্শ ছাড়াই আলাদা আলাদাভাবে তাঁদের আত্মীয়দের হাতে নিহত হতে পারতেন। যদিও, নিঃসন্দেহে এঁদের তিনজনের মৃত্যুর মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে এবং সেই যোগসূত্র নীলকান্তপুরে সৃষ্ট হয়ে ডাক্তার রজার ওয়ালটনের ভেতর দিয়ে এসেছে। অথচ, ডাক্তার ওয়ালটনের সঙ্গে নীলকান্তপুরের কী সম্পর্ক সেটা এখনও সঠিক বোঝা যাচ্ছে না। দ্বিতীয়ত, এই তিনজনকেই ডাক্তার ওয়ালটনের নাম রেকমেন্ড করার সুযোগ যে কেউ ইচ্ছে করলেই পেতে পারত। শম্ভুচন্দ্র মর্নিংওয়াক করতেন, নির্ঝরিণীর নাইট নার্স ছিল, ভোলানাথের বাড়িভরতি ভাড়াটে, একতলায় গোডাউন, লোকজনের আসা-যাওয়ার অন্ত নেই। কিন্তু সেই সুযোগগুলোর সদ্ব্যবহার করল কে? ডাক্তার অরিজিৎ বোস? বীথিকা? দুজনে একসঙ্গে? না, অন্য কেউ? এই তিনজনের মধ্যে আমি কমন ফ্যাক্টর এঁদেরই দেখতে পাচ্ছি— অরিজিৎ, বীথিকা আর রহস্যময় রজার ওয়ালটন।'

'নীলকান্তপুরকে দেখতে পাচ্ছেন না?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।' বলতে বলতে শিবেন চুপ করে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'শম্ভুচন্দ্রের মর্নিংওয়াকের কথা ভাবছেন, তাই না?'

দময়ন্তী নীচু গলায় বলল, 'হ্যাঁ। আর রহিম ওসমান লেনের ভিড়ের কথাও ভাবছি।'

এরপর সারা রাস্তা আর কেউ কোনো কথা বলল না।

'আজ বিকেলে কী করছেন?' জিজ্ঞেস করল শিবেন।

গাড়ি থেকে নামতে নামতে দময়ন্তী বলল, 'আপনি কী করছেন? যদি অসুবিধে না হয় তো যাবেন নাকি একবার নীলকান্তপুরে? ট্রেনে যাব, গাড়ি চালানোর কোনো দরকার নেই।'

শিবেন হাসল। বলল, 'ট্রেনে যাওয়ার দরকার নেই, গাড়িতেই যাব। গাড়ি চালাতে আমার কোনো কষ্ট হয় না, ভালোই লাগে। আর, রমলাকেও নিয়ে আসব।'

দময়ন্তী আর সমরেশ একসঙ্গে বলে উঠল, 'নিশ্চয়ই। সে তো খুব ভালো কথা।'

বিকেল বেলা শিবেন আর রমলা এসে দেখল দময়ন্তী চিন্তিত মুখে বসে আছে। সমরেশ বলল, 'বিকাশবাবু এসেছিলেন। তোরা আসার একটু আগে গেলেন।'

শিবেন বলল, 'বিকাশবাবু আবার কে?'

'মনে নেই তোর? সেই যে ডাক্তার অরিজিৎ বোসের ভগ্নীপতি, আসানসোলে থাকেন।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিকাশ ঘোষ। তা, তিনি কী মনে করে? কি ব্যাপার বউদি? গোপনীয় কিছু নয় তো?'

দময়ন্তী মাথা নাড়ল। বলল, 'আপনার কাছে নয়, তবে আপনার ডিপার্টমেন্টের কাছে গোপনীয়। ভদ্রলোক পুলিশকে কতগুলো কথা বলেননি। সেগুলো আমাকে বলতে এসেছিলেন।'

'পুলিশকে বলেননি কেন?'

'পারিবারিক কেচ্ছা। সব কথা কি পুলিশকে বলা যায়?'

'কথাগুলো কী?'

'প্রথমত, বীথিকার চরিত্র সত্যিই ভালো ছিল না। প্রথম দিন আপনি আমাদের বলেছিলেন যে বীথিকা নিমফোম্যানিয়াক ছিল, বিকাশবাবুও সেই কথাই বললেন। অন্নদা মিত্তির আশা করেছিলেন যে বিয়ের পর স্বভাব শুধরোবে, কিন্তু তা হয়নি। বিয়ের পরেও নানারকম কুকীর্তি করেছে। অরিজিৎ নাকি দু-একবার বাধা দিতে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাতে উলটো ফল হয়েছে। বীথিকা লজ্জিত তো হয়ইনি, উলটে ওঁকে অপমান করেছে। প্রজ্ঞা কেন্দ্রের টাকাটা দিয়েছিলেন অন্নদা মিত্র, কাজেই সেই জোরটা তার ছিল।'

'বিকাশবাবু এসব কথা জানলেন কী করে?'

'সে ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং। আজ থেকে মাস আষ্টেক আগে অরিজিৎ বিকাশবাবুকে গোপনে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল বিকাশবাবুকে প্রজ্ঞার একটা চাকরি দেওয়া। সেইসময় বিকাশবাবু কয়েক বার নীলকান্তপুরে গিয়েছিলেন। সেখানেই এইসব কথা জানতে পারেন।'

'কে বলেছিল এসব কথা? ডাক্তার অরিজিৎ বোস?'

'না। প্রজ্ঞা কেন্দ্রের স্টাফ নার্স। তাঁর আর অন্য কয়েক জনের নাম আমি লিখে নিয়েছি। আজ তাঁদের সঙ্গে কথা বলা যাবে।'

'অরিজিৎ নিজের ভগ্নীপতিকে গোপনে ডেকে পাঠিয়েছিলেন কেন? প্রকাশ্যে ডাকতে কোনো বাধা ছিল?'

'ছিল বোধ হয়। বিকাশবাবু তা জানতে পারেননি।'

‘চাকরিটা হয়নি?’

‘না। বিকাশবাবুর ধারণা, বীথিকা বাধা দিয়েছিল।’

‘যাদের নাম বিকাশবাবু করেছেন, তারা কারা?’

‘ডাক্তার মিসেস স্বপ্না চৌধুরি, প্রজ্ঞা ল্যাবরেটরির সুপারিনটেন্ডেন্ট, মদনমোহন কাঞ্জিলাল, প্রজ্ঞার হেডঅফিসের বড়োবাবু, মিসেস রাধিকা মৌলিক, স্টাফ নার্স আর দরোয়ান ব্রজনন্দন শুক্লা।

‘ও ব্বাবা, এ যে অনেক লোক! সময় লাগবে তো অনেক।’

‘প্রত্যেকের জন্যে দু-মিনিট, তাহলে হবে?’

গড়িয়া থেকে যে রাস্তাটা নীলকান্তপুরে গেছে, তার ওপরেই প্রজ্ঞা মনবিশ্লেষণ কেন্দ্র, নীলকান্তপুরের আধমাইলটাক আগেই। কেন্দ্রের চারদিকে প্রায় দশ ফুট উঁচু কাঁটাতার লাগানো ইটের পাঁচিল। রাস্তার ওপরে যে টিনের পাত লাগানো আট ফুট চওড়া গেট আছে, তার ওপর দিয়ে কেবল দুটো বাড়ির ছাদটুকু ছাড়া জায়গাটার আর কিছুই দেখা যায় না। গেটের দু-পাশে থামের মাথায় দুটো মস্ত আলো আর তাদের ওপর ইংরেজিতে আর বাংলায় লাল রঙের অক্ষরে প্রজ্ঞা মনবিশ্লেষণ কেন্দ্রের নাম লেখা।

শিবেনের ফিয়াট গেটের সামনে এসে দাঁড়াল। সমরেশ বলল, ‘ঢুকতে দেবে তো রে?’

শিবেন বলল, ‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেবে। আসার আগে ফোন করে দিয়েছি।’

রমলা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘আচ্ছা, পাগলরা কি ভেতরে এমনি ঘুরে বেড়ায়? মানে, ছাড়া?’

সমরেশ বলল, ‘তাতে তোমার কী? ওঁরা তো আর তোমাকে কিছু বলতে যাচ্ছে না। জানো না, পাগলরা পাগলদের কিছু বলে না?’

ঠিক তক্ষুনি শিবের হর্ন বাজাল বলে রমলা কী বলল তা আর শোনা গেল না। গেটটা অবশ্য তৎক্ষণাৎ খুলে গেল। খাকি ইউনিফর্ম পরা ফর্সা মোটাসোটা একজন দরোয়ান বাইরে বেরিয়ে এসে হাত নেড়ে গাড়ি ভেতরে ঢোকার ইশারা করল।

শিবেন আস্তে আস্তে গাড়ি গেটের ভেতরে ঢোকাল। দেখা গেল, গেটের বাঁ-দিকে সাদা রং করা একটা লম্বাটে দোতলা বাড়ি। একতলার সামনে ঢাকা বারান্দা আর পর পর সবুজ পর্দা ঝোলানো দরজা, কোনোটার মাথার ওপরে লেখা রিসেপশন, কোনোটার ওপরে আউট পেশেন্টস ডিপার্টমেন্ট, কোনোটা অফিস, কোনোটা ডিসপেন্সারি, ইত্যাদি। গেটের ডানদিকে একটা সুন্দর বাগান; নানারঙের মৌসুমি ফুলের বাহার সেখানে, মাঝখানে একটা পাথরের ফোয়ারাও আছে। তার পেছনে হলুদ রঙের একটা লম্বা তিনতলা বাড়ি, তার মাঝখানে বেশ বড়ো একটা গাড়িবারান্দাওলা ঢোকার দরজা, তার দু-পাশে আর ওপরে সার সার গ্রিল লাগানো জানলা। গাড়িবারান্দার ওপর দিয়ে মাধবীলতার ঝাড় তুলে দেওয়া হয়েছে। আর গেটের সামনে একটা খেলার মাঠ, তার চারপাশে নানারকম দোলনা, স্লিপ ইত্যাদি শোভা পাচ্ছে এবং মাঝখানে পাশাপাশি দুটো ব্যাডমিন্টন কোর্ট। এই মাঠের পেছনে আর একটা সাদা দোতলা বাড়ি। এই বাড়িটা অন্য দুটো বাড়ির চেয়ে স্বতন্ত্র। কারণ অন্য দুটো আধুনিক, ওটা প্রাচীন, যদিও অত্যন্ত ভালো অবস্থায় রাখা আছে।

খিলেন করা দরজা জানলা, কারুকার্য করা থাম, কাঠের ঝিলমিল বাড়িটাকে একটা গাম্ভীর্য দিয়েছে যা বাকি দুটো বাড়িতে অনুপস্থিত।

শিবেন গাড়িটা বাঁ-দিকের বাড়িটার সামনে দাঁড় করাল। বারান্দায় দুজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন। একজন খুব লম্বা, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, মুখে তদ্রূপ চাপ দাড়ি, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, পরনে ট্রাউজার্স আর শার্ট। অন্যজন মাঝারি, অত্যন্ত রোগা, টাকমাথা, পরনে খদ্দরের ধুতি আর পাঞ্জাবি। দুজনে তাড়াতাড়ি নেমে এলেন অতিথিদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে।

চাপদাড়ি বললেন, 'নমস্কার। আমার নাম মদনমোহন কাঞ্জিলাল, আমি এখানকার অফিস-ইন-চার্জ। আর এঁর নাম রজতকান্তি শীল, এখানকার গার্ডেন সুপারভাইজার।'

শিবেন প্রতি নমস্কার করে সকলের পরিচয় দিল।

মদনমোহন দময়ন্তীকে বললেন, 'আপনার কথা আমি শুনেছি। কিন্তু, আপনাকে এমপ্লয় করল কে? বড়ো ডাক্তারবাবু কি? আমি কিন্তু কোনোরকম ইন্সট্রাকশন পাইনি।'

জবাবটা দিল শিবেন। বলল, 'দেখুন, ওঁকে কেউই এমপ্লয় করেনি। আমাদের বিশেষ অনুরোধে উনি এই কেসটা দেখতে রাজি হয়েছেন। বলতে পারেন যে উনি আমাদের কনসালট্যান্ট।'

মদনমোহন চিন্তিত মুখে বললেন, 'তাহলে ওঁর ফি পেমেন্ট করবে কে? গভর্নমেন্ট না প্রজ্ঞা মনবিশ্লেষণ?'

শিবেন মৃদু হেসে বলল, 'সে ব্যাপারে আপনার চিন্তার কোনো কারণ নেই। ফি যে-ই দিক, প্রজ্ঞাকে দিতে হবে না।'

মদনমোহনের মুখের মেঘ কিছুটা কেটে গেল। বললেন, 'তাহলে তো ভালোই। কি জানেন, আমি তো স্পেসিফিক অর্ডার ছাড়া কোনো টাকাপয়সা ডিসবার্স করতে পারি না। বুঝতেই পারছেন, চাকরি করতে হয়। তা যাকগে সেকথা। এখন বলুন ম্যাডাম, আমরা আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি।'

দময়ন্তী বলল, 'আমি জায়গাটা একটু ঘুরে দেখতে চাই, বিশেষ করে ডক্টর ঘোষের বাড়িটা। আর, কয়েক জনের সঙ্গে কথা বলতে চাই। এই এঁরা।' বলে কয়েকটা নাম লেখা একটা কাগজ মদনমোহনের হাতে দিল।

কাগজটায় চোখ বুলিয়ে মদনমোহন বললেন, 'আজ তো ছুটির দিন। ডক্টর স্বপ্না চৌধুরি আর মিসেস মৌলিক তাঁদের কোয়ার্টার্সে আছেন কিনা কে জানে! যান তো রজতবাবু, একবার দেখে আসুন এঁরা আছেন কিনা। থাকলে একবার এখানে আসতে বলুন। আর, ওহে বৃজনন্দন, একবার এদিকে এসো তো। ইনি তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলবেন।'

দময়ন্তী রজতকে বলল, 'আপনি যাঁদের ডাকতে যাচ্ছেন, তাঁদের বলবেন যে আমি দু-মিনিটের বেশি কারুর কাছ থেকে নেব না।' তারপর মদনমোহনকে বলল, 'বৃজনন্দন আসতে আসতে আপনাকে দু-চারটে প্রশ্ন করে নিই, কেমন?'

মদনমোহন তার চাপদাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, 'বেশ, করুন।'

মদনমোহনের কাছে জানা গেল যে প্রজ্ঞার প্রায় সৃষ্টি থেকেই তিনি এখানে আছেন। এর আগে ছিলেন অন্নদা মিত্রের শ্যামপুকুরের ছাপাখানায়। সেখানেই ছোটো থেকে বড়ো

হয়েছেন। লেখাপড়ায় ম্যাট্রিক পাশ, কিন্তু অন্নদাবাবু ওঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং বিশ্বাস করতেন। প্রজ্ঞায় আডমিনিস্ট্রেশন আর অ্যাকাউন্টস দেখার ভার অন্নদাবাবুর রেকমেন্ডেশনেই বড়ো ডাক্তারবাবু ওঁকে দিয়েছিলেন। বীথিকাকে উনি জন্মাতে দেখেছেন। ভালো মেয়ে ছিল, তবে খামখেয়ালি— বড়োলোকের মেয়েরা যেমন হয় আর কী! আর খুব বদরাগী। তবে আনন্দ ফুর্তি করতে ভালোবাসত। বড়ো ডাক্তারবাবু অবশ্য সেটা পছন্দ করতেন না, তাই বলে দুজনরে মধ্যে কক্ষনো ঝগড়াঝাঁটি হত না। বড়ো ডাক্তারবাবু আবার একটু গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন কিনা। হ্যাঁ, বীথিকার কিছু কিছু ছেলে বন্ধু ছিল, তারা কিন্তু মোটেই সুবিধের লোক ছিল না। না, মদনমোহন তাদের নাম-ধাম জানেন না, জানার চেষ্টাও করেননি। তবে বীথিকাকে এ ব্যাপারে সাবধান করার কথা তিনি কখনো ভাবেননি। তিনি সামান্য কর্মচারী, এসব তাঁর এক্তিয়ারের বাইরে। আর, বিকাশ ঘোষ বলে কাউকে তিনি চেনেন না।

মিসেস রাধিকা মৌলিক লম্বা-চওড়া মাঝবয়সি মহিলা। তাঁর কথাবার্তা অত্যন্ত প্রাঞ্জল। তিনি বললেন যে বীথিকা একটি নষ্ট মেয়েমানুষ ছিল। বড়ো ডাক্তারবাবুর মতো দেবতুল্য লোককে দিনের পর দিন কী অপমানটাই না করেছে। সে অপমান অন্য কেউ হলে সহ্য করত না। না, না, তার মানে এই নয় যে বড়ো ডাক্তারবাবু খুনি। অমন কাজ উনি কখনোই করতে পারেন না। কখনোই নয়। এই সম্পত্তির মালিক ছিল বীথিকা, তাই অত দাপট আর দেমাক দেখাতে পারত। হ্যাঁ, ছেলে-বন্ধু ছিল বই কী! না থাকলে নষ্টামি করবে কী করে! যত সব হাড়হাভাতে শয়তান! একটা যেত আর একটা আসত। কে জানে তাদের নামধাম কী? তাদের দিকে তাকাতে প্রবৃত্তি হত না। না, বিকাশ ঘোষ বলে কাউকে তিনি চেনেন না। ভোলানাথ চক্রবর্তীকে মনে নেই। রানি নির্ঝরিণীকে মনে আছে। রুগিদের সম্পর্কে ভালো-খারাপ কিছু বলতে নেই। শম্ভুচন্দ্র ধাড়াকেও মনে পড়ে না। কতরকম রুগি যে উনি দেখেছেন ওঁর তিন বছরের চাকরিতে।

ব্রজনন্দন শুক্লার বাড়ি উত্তরপ্রদেশে। গত পাঁচবছর সে এখানে আছে। মালকিন ভালো লোক ছিলেন। যেদিনই অনেক রাত করে ফিরতেন, সেদিন অনেক টাকা দিতেন গেট খুলে দেবার জন্যে। গাড়ি নিজেই চালাতেন। কখনো কখনো খুব সকালেও বেরিয়ে যেতেন। কত সকালে? ছটা-সাতটা হবে। সঙ্গে লোক থাকত কখনো, কখনো একা। কে লোক তা অবশ্য সে দেখেনি। না, তাদের চেনবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ব্রজনন্দনের সাধারণত রাত্রিবেলা আর ছুটির দিন ডিউটি পড়ে। দিনের ডিউটি দেয় অন্য লোক।

ডক্টর স্বপ্না চৌধুরিকে বেশ কালোই বলা যায়, কিন্তু হাবভাবে আর কথাবার্তায় একেবারে পাক্কা মেমসাহেব। বয়েস ত্রিশের ওপারেই হবে, কিন্তু সেটা কম দেখানোর একটা আগ্রহ এবং চেষ্টা লক্ষ্য না করে পারা যায় না। ডক্টর চৌধুরি বললেন যে বীথি ওয়াজ এ ভেরি নাইস গার্ল। হ্যাপি গো লাকি। জীবনটা উপভোগ করতে ভালোবাসত। সেজন্যে অনেকে ওর সম্পর্কে খারাপ কথা বলত। বাট শি কুডন্ট কেয়ার লেস। অ্যান্ড হোয়াই শুড শি? হার হাজব্যান্ড ওয়াজ এ গ্রাম্পি রামগড়ুরের ছানা। এ গুড ম্যান, ইয়েস। কিন্তু বেশি ভালো আবার ভালো নয়। দুজনের ছিল দু-রকমের চরিত্র। তাই বলে একটা চরিত্র ভালো আর অন্যটা খারাপ, এরকমের কথা যারা বলে তারা ঠিক করে না। ড. চৌধুরি কলকাতা থেকে ডাক্তারি পাশ করে বিলেতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে বেশ

কয়েকটা ডিগ্রি নিয়ে এসেছেন। এখানকার রিসার্চ ডিপার্টমেন্টটা উনি চালান। এই ডিপার্টমেন্টটাই ছিল বীথিকার আন্ডারে। বীথিকা পাগলের ডাক্তার ছিল না, ছিল প্যাথলজিস্ট। তা ছাড়া রিসার্চে ওর একটা ফ্লেয়ার ছিল। সেই কারণে, একটা ওয়েল ইকুইপড ল্যাবরেটরি এখানে গড়ে তুলেছিল। নানারকম ড্রাগস নিয়ে এখানে কাজকর্ম হয়। কয়েক জন রিসার্চ স্কলার আছেন। প্রত্যেকেই কোয়ালিফায়েড ডাক্তার। তাঁরা এখানে থাকেন না, কলকাতা থেকে যাতায়াত করেন। হ্যাঁ, নানারকম বিষ নিয়েও কাজকর্ম হয়। না, পটাসিয়াম সায়ানাইড নিয়ে কখনো কাজ হয়নি। না, রুগিদের ওপর কখনো এক্সপেরিমেন্ট চালানো হয় না। আর সবশেষে ড. চৌধুরি জানালেন যে ড. অরিজৎ বোস ওয়াজ পারফেক্টলি কেপেবল অফ কিলিং হিজ ওয়াইফ অর এনিবডি এলস ফর দ্যাট ম্যাটার। ওঁর মধ্যে একটা স্ট্রীক অফ সেডিজিম ছিল। অবশ্য, তার কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ তিনি পাননি, তবে এটা তাঁর বদ্ধমূল ধারণা। হ্যাঁ, বিকাশ ঘোষ বলে একজনের সঙ্গে এখানে পরিচিত হয়েছিলেন। সুবিধের লোক নয়। বীথিকা তাকে দেখে বেশ আপসেট হয়ে পড়েছিল। শি কাইন্ড অফ থ্রু হিম আউট অফ দিস প্লেস।

ড. চৌধুরির সঙ্গে বাক্যালাপ শেষ হবার পর দময়ন্তী বীথিকার শোবার ঘরটা দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করল। মদনমোহন পকেট থেকে একগোছা চাবি বের করে বললেন, 'আমার কি সঙ্গে যাবার দরকার আছে?'

দময়ন্তী বলল, 'নিশ্চয়ই। আপনি না গেলে কী করে হবে?'

মদনমোহন ম্লান হেসে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'এই কাজটা করতে আমার একদম ভালো লাগে না, জানেন? ওই ঘরটায় যতবার যাই, সেই ভয়ঙ্কর দিনটার কথা মনে পড়ে। ভালো লাগে না।' বলে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা পেরিয়ে রাস্তায় নামলেন। সামনে আঙুল বাড়িয়ে বললেন, 'ওই যে, খেলার মাঠের ওপারে বাড়িটা দেখছেন, ওটাই বীথিকার বাড়ি ছিল।'

রমলা জিজ্ঞেস করল, 'সমস্ত বাড়িটা নিয়েই থাকতেন? এটা তো মস্ত বাড়ি!'

'না। সমস্ত বাড়িটা নিয়ে থাকতেন না। একতলায় আছে স্পেশাল ওয়ার্ড। ডাক্তার বোসেরা থাকতেন দোতলায়।'

দময়ন্তী জিজ্ঞেস করল, 'স্পেশাল ওয়ার্ড মানে?'

'সাধারণ ওয়ার্ডের থেকে আলাদা এই আর কী! থাকার বন্দোবস্ত, খাওয়াদাওয়া ইত্যাদি একটু ভালো। পারসোনালাইজড সার্ভিস।'

'এখানে থাকতে গেলে কি বেশি পয়সা দিতে হয়?'

'হয়, তবে সবক্ষেত্রে নয়। এ ব্যাপারটা ডাক্তার বোসের মর্জির ওপর নির্ভর করে।'

'এই ওয়ার্ডটা কি প্রজ্ঞার গোড়া থেকেই ছিল?'

'না। আগে ওখানে লাইব্রেরি ছিল। পরে লাইব্রেরিটা উঠে আসে আমার অফিসের দোতলায়।'

'এই ওয়ার্ডটা তৈরি করার কোনো বিশেষ কারণ ছিল কি?'

'ছিল। অনেক রুগি জেনারেল ওয়ার্ডে থাকতে চাইতেন না। অনেকের স্পেশাল ট্রিটমেন্টের দরকার হত। কোনো কোনো রুগি আইসোলেশন পছন্দ করতেন। এইসব

কারণে।'

'কতদিন চালু হয়েছে এই ওয়ার্ডটা?'

'বছর তিনেক হবে।'

কথা বলতে বলতে খেলার মাঠ পার হয়ে সকলে বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। মদনমোহন বললেন, 'প্রজ্ঞা এই বাড়িতেই প্রথম খোলা হয়েছিল। পুরোনো বাড়ি, সারিয়ে টারিয়ে অনেক ধুমধাম করে উদ্বোধন করা হয়েছিল। অন্নদাবাবু আর তাঁর দুই ছেলে এসেছিলেন, কলকাতা থেকে নামকরা গাইয়েরা এসেছিলেন। কত আনন্দ উদ্দীপনার মধ্যে সব শুরু হয়েছিল। তখন কে জানত যে আজ তার এই অবস্থা হবে। বড়ো ডাক্তারবাবুর অনেক প্ল্যান ছিল, উনি আস্তে আস্তে সেগুলো চালু করছিলেন। সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি বসিয়েছেন, রুগিদের বিজ্ঞানসম্মত রিক্রিয়েশনের ব্যবস্থা করেছেন, জেনারেল ওয়ার্ডে আজ চল্লিশ জন রুগির চিকিৎসা হচ্ছে। সব হয়তো নষ্ট হয়ে যাবে!' বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রকাণ্ড দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন।

ঢুকেই একটা হলঘর। লাল কার্পেটে মোড়া, একপাশে একটা আধুনিক সোফাসেট, অন্যপাশে একটা লম্বাটে টেবিল, রিসেপশনিস্টের জন্য। দেওয়ালে দুটো বড়ো অয়েল পেন্টিং, একটা যীশুর জন্মের, অন্যটা লুম্বিনিতে বুদ্ধের জন্মের। বেশ একটা শান্ত, স্নিগ্ধ পরিবেশ। ঘরটার তিনদিকে তিনটে দরজা। দুটোর ওপর লেখা 'স্পেশাল ওয়ার্ড', অন্যটার ওপর লেখা 'প্রাইভেট'।

মদনমোহন চাবি দিয়ে প্রাইভেট দরজাটি খুললেন। ভেতরে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। দোতলায় দু-দিকে দুটো ফ্ল্যাট। একটার দরজায় অরিজিৎ আর বীথিকার নেমপ্লেট, অন্যটায় কিছু নেই।

মদনমোহন অরিজিতের ফ্ল্যাটের দরজা খুলতে খুলতে বললেন, 'বড়ো ডাক্তারবাবু এইদিকে থাকতেন। ওই ফ্ল্যাটটা গেস্টদের জন্যে।'

দময়ন্তী প্রশ্ন করল, 'গেস্ট কীরকম? এখানে কী ধরনের গেস্ট থাকতেন?'

'অনেকেই থাকতেন। বড়ো ডাক্তারবাবু বা বীথিকার বন্ধুবান্ধবেরা মাঝে মধ্যে এসে থাকতেন। কখনো কখনো বিদেশি স্পেশালিস্টরাও আসতেন। কখনো কখনো রুগিদের কোনো আত্মীয়ও থেকে যেতেন এমার্জেন্সির সময়।'

'আচ্ছা, নীচে স্পেশাল ওয়ার্ডে এখন কজন রুগি আছেন?'

'এখন একজনও নেই। তবে জেনারেল ওয়ার্ডের একজন আসতে চাইছেন। বড়ো ডাক্তারবাবু নেই, কাজেই কেউ ডিসিশন নিতে পারছেন না।' বলে মদনমোহন একটা দরজা খুলে ধরে বললেন, 'আসুন। এটা বীথিকার শোবার ঘর ছিল।'

ঘরটা বেশ বড়ো। একপাশে একটা জোড়াখাট, তার ওপর ঝালর দেওয়া চকমকে বেডকভার পাতা। অন্যপাশে প্রকাণ্ড বড়ো ড্রেসিং টেবিল আর তার অতিকায় আয়না। ড্রেসিং টেবিলের ওপর অসংখ্য প্রসাধনের জিনিসপত্র সাজানো। একদিকে দুটো ওয়ার্ডরোব, বেশ বড়ো। সেগুলোর পাশে বাথরুমে যাওয়ার দরজা। খাটের পাশে দুটো চেয়ার আর একটা ছোটো টেবিল।

দময়ন্তী ঘুরে ঘুরে সব দেখল। বাথরুমের দরজা খুলে ভেতরে উঁকি দিল। ওয়ার্ডরোব দুটো খুলে দেখল। তারপর মদনমোহনকে প্রশ্ন করল, 'দুটো ওয়ার্ডরোবই তো দেখছি বীথিকার! অরিজিৎবাবুর জামাকাপড় কোথায় থাকত?'

মদনমোহন কিঞ্চিৎ বিপন্ন কণ্ঠে বললেন, 'ইয়ে, মানে, ওঁর ওয়ার্ডরোবটা আছে ওই কোণের ঘরটায়।'

'সেটা একবার দেখে আসি?'

'চলুন।' বলে মদনমোহন সবাইকে নিয়ে দীর্ঘ করিডরের অন্য প্রান্তে একটা ঘরে নিয়ে গেলেন।

এই ঘরটা আগেরটার তুলনায় অনেক ছোটো। একটা সিঙ্গল খাট, একটা আলমারি, একটা টেবিল আর গোটাদুয়েক চেয়ার ছাড়া আর কোনো আসবাবপত্র নেই। দময়ন্তী এই আলমারিটাও খুলে দেখল। তারপর মদনমোহনকে বলল, 'চলুন, আমার দেখা হয়ে গেছে।'

গাড়িতে উঠে দময়ন্তী শিবেনকে জিজ্ঞেস করল, 'ড্রেসিং টেবিলে বীথিকার সবরকমের প্রসাধনের জিনিস দেখলুম, দেখলুম না কেবল লিপস্টিক। সেগুলো কি আপনারা নিয়ে গেছেন?'

শিবেন বলল, 'হ্যাঁ। ফরেনসিকে দেওয়া হয়েছিল।'

'কটা লিপস্টিক ছিল?'

'একগাদা। ত্রিশ-চল্লিশটা তো হবেই।'

'হুঁ, তাই হবে। বীথিকার সবকিছুই দেখছি অতিরিক্ত বেশি। অসংখ্য শাড়ি, অসংখ্য জুতো, অজস্র ব্যাগ। অদ্ভুত!' বলে কিছুক্ষণ জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। তারপর প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, শিবেনবাবু, প্রথমে বোধ হয় রানি নির্ঝরিণী মারা যান, তাই না? তারপর ভোলানাথ, সবশেষে শম্ভুচন্দ্র?'

'হ্যাঁ, তাই বটে। এই মারা যাওয়ার পারম্পর্যটা কি খুব দরকারি?'

'হ্যাঁ। খুব দরকারি।'

'আপনি কী করে বুঝলেন?'

'এই, সকলের কথাবার্তায়। আচ্ছা, একটা ব্যাপার লক্ষ করলেন যে বিকাশ ঘোষকে মদনমোহন চিনতে পারলেন না, কিন্তু ডক্টর স্বপ্না চৌধুরি পারলেন?'

'হ্যাঁ। স্বপ্না চৌধুরি দেখলুম তাঁর মালকিনের অত্যন্ত গুণমুগ্ধ।'

'এবং খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। হয়তো একই কলেজ থেকে পাশ করেছেন, সামান্য দু-এক বছরের ফারাক থাকলেও থাকতে পারে। আগামী রবিবার আমরা আবার এঁর বাড়িতে যাব। ইতিমধ্যে এঁর সম্পর্কে কিছু খোঁজখবর নিলে ভালো হয়।'

'ব্যাপারটা আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে এসেছে মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, প্রায়। তবে প্রমাণ চাই, শিবেনবাবু। নিশ্ছিদ্র প্রমাণ না হলে এই নিরেট শয়তানির দেওয়ালটা ভাঙা যাবে না।'

পরের মঙ্গলবার সন্ধ্যেবেলা শিবেন এল। বলল, 'ডাক্তার স্বপ্না চৌধুরি সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছি। খুব ইন্টারেস্টিং কিছু নয়, তবে নেহাত ফেলনাও নয়।'

দময়ন্তী আর সমরেশ একসঙ্গে জিজ্ঞেস করল, 'কীরকম?'

'ডাক্তার চৌধুরি আর বীথিকা এক ক্লাসে পড়তেন। বীথিকা একবছর ফেল করেছিল। ডাক্তার চৌধুরি বিয়ের আগে ছিলেন সান্যাল, ডাক্তার হিরন্ময় সান্যালের মেয়ে। বুঝতেই পারছেন, স্বপ্না আর বীথিকা, দুজনেই মস্ত পয়সাওলা পরিবারের মেয়ে। স্বপ্নার দু-বার বিয়ে হয়েছিল, দু-বারই বিচ্ছেদ হয়েছে। বিলেত থেকে ফেরার পর ভাইদের সঙ্গে গোলমাল বেঁধেছিল। তখন বীথিকা ওঁকে নীলকান্তপুরে নিয়ে যায়। এই পর্যন্ত। এবার বলুন, এর থেকে কী বুঝলেন?'

'বিশেষ কিছু নয়। কেবল এইটুকু মনে হচ্ছে যে স্বপ্না বীথিকার অনেক গোপন কথা জানতেন যা সম্ভবত আর কেউ জানত না।'

'আচ্ছা বীথিকার ভাইদের সঙ্গে কথা বলতে চান না?'

'না। আপনারা যা জেরা করেছেন, তাই যথেষ্ট। ওদের কাছ থেকে আর বিশেষ কিছু জানা যাবে বলে মনে হয় না। ওরা ওদের ভগ্নীপতিকে শ্রদ্ধা করত, ভালোবাসত আর বীথিকা ওদের বোন। এ অবস্থায় ওরা দুজনকেই আড়াল করে কথা বলবে। সেটাই স্বাভাবিক। আচ্ছা, নূরপুরে ববি রোজারিওর কোনো খোঁজ পাওয়া গেল?'

'নাঃ! ভুয়ো নাম বা ভুয়ো ঠিকানা।'

দময়ন্তী বলল, 'হুঁ, আমিও তাই অনুমান করেছিলুম।'

'আপনার আর কিছু জানবার নেই?'

'আছে। রানি নির্ঝরিণী, ভোলানাথ আর শম্ভুচন্দ্রের মৃত্যুর সঠিক সময়গুলো বলবেন?'

'নির্ঝরিণী মারা যান গত বছরের আগের বছর জানুয়ারি মাসে। ভোলানাথ মারা যান গত বছর ফেব্রুয়ারি মাসে আর শম্ভুচন্দ্র গেছেন গত বছর ডিসেম্বরে, বীথিকা মারা যাওয়ার মাসখানেক আগে।'

'আর গত বছরের আগস্ট মাস থেকে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নেওয়া হয়, তাই না?'

'হ্যাঁ, তাই।'

দময়ন্তী আর কোনো প্রশ্ন করল না। চুপ করে বিষণ্ণ মুখে বসে রইল অনেকক্ষণ। তারপর বলল, 'বড়ো নোংরা ব্যাপার। নোংরা ষড়যন্ত্র। কিন্তু প্রমাণ কোথায়? সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্সও নেই। একমাত্র উপায় সম্মুখ যুদ্ধ।'

সমরেশ পুলকিত মুখে বলল, 'উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু কার সঙ্গে?'

দময়ন্তী শিবেনকে বলল, 'কাল সন্ধ্যেবেলা বিবেকানন্দের ছোটো ভাইকে ধরে আনতে পারেন? যদি আসতে না চায়, অ্যারেস্ট করে নিয়ে আসবেন। ওয়ারেন্ট নিয়ে যাবেন।'

শিবেন ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। বলল, 'তাই হবে।'

বিবেকানন্দ ধাড়ার ছোটোভাই বিশ্বানন্দ ডিগডিগে রোগা, গর্তে বসা চোখ, ভাঙা গাল, ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ— এককথায় যাকে বলে চোয়াড়ে চেহারা। বয়েস তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে। ঘরে ঢুকেই খোলা গলায় চিৎকার জুড়ে দিলেন, 'আমাকে এখানে জোর

করে ধরে আনার অর্থ কী? এ কি মগের মুলুক? দেশে আইনকানুন নেই? দাদা এক্ষুনি উকিল নিয়ে এসে পড়বে, তখন মজা টের পাবেন আপনারা।'

দময়ন্তী অবিচলিত গলায় বলল, 'নিশ্চয়ই, তবে আপনি কতটা মজা টের পাবেন সেটা নির্ভর করছে আপনি কতটা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চান তার ওপরে। একটি হত্যাকাণ্ডে কোনোরকমভাবে লিপ্ত থাকার কি শাস্তি, আপনি তা জানেন?'

'কী? কী? কোন হত্যাকাণ্ড? আ-আমি কোনো হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত নই।'

'আলবত লিপ্ত! কে আপনাকে দশ হাজার টাকা দিয়েছিল? যা দিয়ে আপনি কলেজের তহবিল থেকে সরানো টাকা পুরিয়ে দিয়েছিলেন? সে টাকা তো আপনি ঘোড়ার খুরে উড়িয়েছিলেন।'

'কে? কে? এসব কথা কে বলেছে আপনাকে? বাজে কথা। যে বলেছে সে মিথ্যে কথা বলেছে। পারবেন আদালতে এসব কথা প্রমাণ করতে?'

'নিশ্চয়ই পারব। আমার কাছে এমন সাক্ষ্য প্রমাণ আছে যা দিয়ে আপনি যে সেই টাকার বিনিময়ে আপনার বাবাকে ডাক্তার রজার ওয়ালটনের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেই ডাক্তারের দেওয়া ওষুধ খেয়েই আপনার বাবার মৃত্যু হয়েছিল, তাও আমি প্রমাণ করতে পারব। দীননাথ কলেজের প্রিন্সিপাল দয়া করে আপনার চুরি ক্ষমা করেছিলেন, কিন্তু দেশের আইন আপনার এই নরহত্যায়, বিশেষ করে পিতৃহত্যায়, সাহায্য করতে ক্ষমা করবে না।'

'বা-বাজে কথা সব! আমি আমার বাবাকে মারিনি। বাবা জন্ডিসে মারা গিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ, কিন্তু ডাক্তার রজার ওয়ালটনের দেওয়া জন্ডিসের জীবাণুমিশ্রিত ওষুধ খেয়েই যে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল—'

দময়ন্তী কথাটা শেষ করতে পারল না। বিশ্বানন্দ আর্তনাদ করে উঠলেন, 'রজার ওয়ালটন কী ওষুধ দেবে তা আমি কী করে জানব?'

'আলবত জানতেন! নইলে রজার ওয়ালটনের নাম প্রস্তাব করেছিলেন কেন? সেই লোকটার সঙ্গে কী করে পরিচয় হয়েছিল আপনার?'

'আমার কোনো পরিচয় ছিল না। চিনতুমই না ওকে।'

'কে তাহলে ওর নাম-ঠিকানা দিয়েছিল আপনাকে?'

'মিস্টার কামতাপ্রসাদ শর্মা বলে এক অবাঙালি ভদ্রলোক। রেসের মাঠে পরিচয় হয়েছিল।'

'সে আপনাকে কেবল বলেছিল যে আপনার বাবাকে রজার ওয়ালটনের নাম করতে আর তার কাছে একদিন নিয়ে যেতে, আর তাহলেই আপনার গচ্চা যাওয়া টাকাটা সে পুরোটা দিয়ে দেবে, তাই না?'

'হ্যাঁ, অনেকটা তাই বটে। আমি কেবল কথায় কথায় তাকে বলেছিলুম যে বাবা হোমিওপ্যাথি করাতে চান, কিন্তু কোনো ডাক্তার পছন্দ হচ্ছে না।'

'আপনাকে যখন কামতাপ্রসাদ টাকা দিতে গেল, আপনার মনে হল না যে এর পেছনে কোনো নোংরা ব্যাপার থাকতে পারে?'

‘শর্মাজি আমাকে বলেছিলেন যে রজার ওয়ালটন খুব ভালো ডাক্তার, কিন্তু পসার জমাতে পারছেন না। তাই কেউ রুগি নিয়ে গেলে উনি খুশি হয়ে তাকে কিছু দিয়ে থাকেন। তা ছাড়া, তখন আমার টাকার ভীষণ দরকার ছিল।’

‘তা তো বুঝতেই পারছি। তাই বলে, কিছু দেওয়া মানে দশ হাজার টাকা?’

‘রেসের মাঠে আপনি গেছেন কোনোদিন? গেলে বুঝবেন যে ওটা ওখানে এমন একটা বিরাট বড়ো অঙ্কের কোনো ব্যাপার নয়।’

‘ওই কামতাপ্রসাদের ঠিকানা আপনি জানেন?’

‘নাঃ! রেসের মাঠে কত লোকের সঙ্গে আলাপ হয়, সকলের ঠিকানা কি মনে রাখা সম্ভব? তবে শুনেছি ভদ্রলোক বম্বেতে থাকেন, বোধ হয় সেখানেই ফিরে গেছেন।’

ঠিক এইসময় বিবেকানন্দ সঙ্গে সম্ভবত তাঁর উকিলকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। দময়ন্তী তাঁদের স্বাগত জানিয়ে বলল, ‘আপনার ভাইকে নিয়ে যেতে পারেন বিবেকানন্দবাবু। আমাদের আলোচনা যা হবার তা হয়ে গেছে। তবে আপনাকে কয়েকটা কথা বলার ছিল। সেগুলো দয়া করে শুনে যাবেন।’

‘তুমি এই বিশ্বানন্দ বেটাচ্ছেলেকে সন্দেহ করলে কীভাবে?’ সমরেশ জিজ্ঞেস করল।

শিবেন হাত নেড়ে বলল, ‘সন্দেহ করাটাই তো স্বাভাবিক। আমাদেরও করা উচিত ছিল। কিন্তু বিশ্বানন্দ ধাড়ার কথাটা একবারও খেয়াল হল না! আশ্চর্য! তবে, এই লোকটার এত খবর আপনি পেলেন কোত্থেকে?’

‘দীননাথ কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল ডক্টর অজিত চট্টোপাধ্যায় আমার প্রোফেসর ছিলেন। তাঁকে একটা ফোন করে সব খবর জোগাড় করেছি। তবে, কেউ চেনা না থাকলে আপনাকে বলতুম খোঁজখবর করবার জন্যে। বুঝতেই পারছেন, ভেতরে লোক না থাকলে ষড়যন্ত্র বানচাল হয়ে যেতে পারত। রিমোট কন্ট্রোলের একটা সীমা আছে তো।’

শিবেন মাথা নেড়ে বলল, ‘তা তো বটেই।’

‘মোটেই তা তো বটেই না।’ সমরেশ হাত-পা ছুড়ে বলল, ‘তা তো বটেই মানে কী? আমি জানতে চাই বিশ্বানন্দ ধাড়াকে কেন এবং কী প্রকারে তোমার সন্দেহ হইল? তার অপর দুই ভ্রাতাকে কেন হইল না?’

দময়ন্তী বলল, ‘বড়োভাই নিজেই তাঁর বাবার মৃত্যুর পেছনে কোনো রহস্য আছে— এ ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করলেন। মেজোভাই মিলিটারি, বাড়িতে আসেন না। ছোটোভাই প্রোফেসারি ছেড়ে দাদার ব্যবসায় যোগ দিচ্ছেন। এঁদের মধ্যে ছোটোভাইটিকেই সন্দেহ হবে না তো কার ওপরে হবে? যদি আমার সন্দেহ অমূলক প্রমাণিত হত, তখন জাঠতুতো ভাইদের সম্পর্কে খোঁজ নিতুম। তবে আমি প্রায় নিশ্চুত ছিলুম যে আমার ভুল হয়নি।’

‘কিন্তু: ভাইদের মধ্যে একজন কেন? রজার ওয়ালটনের নাম তো যে-কেউ সাজেস্ট করতে পারত? শম্ভুচন্দ্র তো দরজা বন্ধ করে বসে থাকতেন না। তাঁর কাছে অনেক লোক দেখা করতে আসত। তাদের মধ্যে যে-কেউ তা করতে পারত।’

‘তা যে করতে পারত না, তা নয়। কিন্তু সেটা একটু কঠিন ব্যাপার হত।’

‘কেন?’

‘তাহলে ষড়যন্ত্রটা সম্বন্ধে একটু বলা দরকার। যারা ষড়যন্ত্র করেছিল, তারা দেখেছিল যে বড়োলোক খিটখিটে প্রায় উন্মাদ বৃদ্ধ লোকেদের আত্মীয়স্বজন তাঁদের দীর্ঘজীবনের চেয়ে মৃত্যু কামনাই বেশি করে থাকে। সরাসরি খুন হয়তো করতে চায় না বা পারে না, কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে খুব ছোটোখাটো অন্যায় কাজ করতে বড়ো একটা আপত্তিও করে না। এক্ষেত্রে দেখ, তারা কী করছে? তাদের আত্মীয়দের এক হোমিওপ্যাথের কাছে নিয়ে যাচ্ছে। তাতে তাদের বিবেকদংশন হবার কোনো কথাই নয়। কিন্তু, যে উপায়ে তাদের সেই কাজটা করানো হচ্ছে, তাতে তাদের মনে একটা সন্দেহ বা সংশয় হবার কথা। তারা কেবল সেই জায়গাটায় চোখ বন্ধ করে থাকছে। ধরো, আজ যদি তোমাকে কেউ বলে যে তোমার স্ত্রীর টেবিলে এই ফুলের তোড়াটা রেখে এসো, তার জন্য তোমাকে দশ হাজার টাকা দেব তাহলে প্রথমেই তোমার সন্দেহ হওয়া উচিত যে এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো ভয়ঙ্কর গণ্ডগোল আছে। সেই সন্দেহটাই এঁরা চেপে রেখেছেন।’

‘তার মানে, পঙ্কজ রায়চৌধুরি যে হঠাৎ তেরিয়া হয়ে বলেছিলেন, আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা, সেটা এই অপরাধবোধেরই বহিঃপ্রকাশ?’

‘ঠিক তাই। পঙ্কজ পেঁচি মাতাল। মামিশাশুড়ির তহবিল থেকে মদের টাকা খুব সহজে বেরোত বলে মনে হয় না। আজ যদি ছপ্পর ফুঁড়ে সেই টাকা আসে, তাহলে একজন হোমিওপ্যাথের কাছে তাঁকে নিয়ে যেতে আপত্তির তো কোনো কারণ নেই।’

শিবেন বলল, ‘দুজনেই সমান। সন্দেহ করতে গেলে দুজনকেই একসঙ্গে এবং আলাদা আলাদা ভাবে করা উচিত। তাই না, বউদি?’

দময়ন্তী মাথা নাড়ল। বলল, ‘হ্যাঁ, তাই।’

সমরেশ মাথা চুলকে বলল, ‘কিন্তু নিকট আত্মীয়দেরই জড়াতে হবে কেন? বাইরের লোকও তো লাগানো যেত।’

‘তা যেত। কিন্তু ষড়যন্ত্রটায় টাইমিং এবং পারম্পর্য— দুটোই খুব জরুরি ছিল। কাছের লোক না হলে, এটা ভেস্তে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল খুব বেশি।’

‘তাহলে এই তিনটে হত্যাকাণ্ড এবং বীথিকার মৃত্যুর সঙ্গে সম্পর্কটা কোথায়?’

‘সেইটে জানতে গেলে, আরও সাক্ষ্য প্রমাণ দরকার। স্রেফ অনুমানের ওপর নির্ভর করলে চলবে না। শিবেনবাবু, কাল একবার পঙ্কজ রায়চৌধুরিকে বাজিয়ে আসবেন?’

‘আসব। আপনার যাবার দরকার নেই, ব্যাপারটা আমি বুঝে গেছি। কেবল, সমরেশের শেষ প্রশ্নটার উত্তর কিন্তু এখনও বুঝে উঠতে পারিনি। আর, আমার এখনও বিশ্বাস যে বীথিকা এবং রজার ওয়ালটন একই ব্যক্তি।’

দময়ন্তী মৃদু হাসল। বলল, ‘হতে পারে। আর হ্যাঁ, একটা কথা। বিবেকানন্দ, বিশ্বানন্দ, পঙ্কজ, সোমনাথ আর শ্যামল, এদের প্রত্যেকের একটা করে ফোটো জোগাড় করতে পারেন?’

‘পারি। কাল না পেলেও পরশু পাবেন।’

শিবেন এল একটু রাতের দিকে। বলল, ‘সেই একই ব্যক্তি। শ্রীযুক্ত কামতাপ্রসাদ শর্মা। বিশ্বানন্দের বেলায় রেসের মাঠে, পঙ্কজের বেলায় শুঁড়িখানায়। কিপটে মাগি যা হাতখরচা দিত, তাতে বাংলা খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গেসল মশায়, কেউ যদি স্কচ খাওয়ায়,

খাঁটি স্কচ, স্কটল্যান্ডে তৈরি, তাহলে তার অনুরোধ না রাখা কি ভদ্দরলোকের কাজ? আর, সামান্য অনুরোধ— এক বেচারি ডাক্তার বিলেত থেকে ফিরে পসার জমাতে পারছে না, তার কাছে রুগি পাঠানো। এর মধ্যে অন্যায়টা কী আছে?'

দময়ন্তী হাসতে হাসতে বলল, 'আমি এরকমই সন্দেহ করেছিলুম। ফোটো এনেছেন?'

'ধাড়া ব্রাদার্স আর পঙ্কজের ছবি এনেছি। সোমনাথ আর শ্যামলের ছবি পাবেন কাল। এখন রেডি নেই।'

'সোমনাথ আর শ্যামল কী বলল?'

'আপনি তো ওদের জেরা করতে বলেননি, তাই কিছু জিজ্ঞেস করিনি। তবে, ফোটো চাওয়ায় খুব ক্ষেপে গেছে। বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে দু-চার কথা শুনিয়ে দিল। কাল বিকেলে গিয়ে নিয়ে আসতে বলেছে।'

সোমনাথ ভট্টাচার্য আর শ্যামল রায়, দুজনেই সন্ধ্যের একটু আগেই উপস্থিত। সমরেশ ঠিক তক্ষুনি অফিস থেকে ফিরেছে। অ্যাপায়ন করে দুজনকে বসবার ঘরে বসাল। একটু আলাপচারি করবার চেষ্টা করল, কিন্তু তেমন সাড়া পাওয়া গেল না। দময়ন্তী যখন ঘরে ঢুকল, তখন তিনজনেই গম্ভীর মুখে নীরবে বসে আছে।

সোমনাথ সরাসরি প্রশ্ন করল, 'আমাদের ছবি চেয়েছেন কেন?'

দময়ন্তী বলল, 'আপনাকে সে কৈফিয়ত দিতে আমি বাধ্য নই। আপনার ইচ্ছে হলে দেবেন, না হলে দেবেন না।'

সোমনাথের মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠল। সমরেশের মনে হল, ঠিকই বলেছিলেন হেমন্ত সরকার, চণ্ডাল রাগ।

অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করল সোমনাথ। বলল, 'কৈফিয়ত চাইছি না। জানতে চাইছি কী আমাদের অপরাধ যে আপনাকে আমাদের ছবি দিতে হবে?'

দময়ন্তী বাঁকা হেসে বলল, 'কে বলেছে আপনাকে যে কেবল অপরাধীদেরই ছবি সংগ্রহ করি আমি? দেওয়ালে ওই যে ছবি ঝুলছে, ওঁকে চেনেন? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।'

'বাজে বকবেন না।' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল সোমনাথ, 'আপনার কি ধারণা আমরা ছোড়দাকে খুন করেছি? ডাক্তার দাশগুপ্তের সার্টিফিকেট ভুয়ো?'

দময়ন্তী পূর্ববৎ বলল, 'আপনার এসব প্রশ্নের জবাব দিতেও আমি বাধ্য নই। তবে হ্যাঁ, আপনারা যদি নিজেদের উপকার চান, তাহলে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন।'

'কী প্রশ্ন?'

'ডাক্তার রজার ওয়ালটনের নাম আপনাদের কে দিয়েছিল?'

সোমনাথ এই প্রশ্নের জবাব দিতে যেতেই শ্যামল তাকে বাধা দিতে গেল। কিন্তু সোমনাথ হাত নেড়ে বলল, 'তুই চুপ করে বসে থাক! সোমনাথ ভট্টাচার্য কাউকে ভয় পায় না। হ্যাঁ, ডাক্তার রজার ওয়ালটনের নাম দিয়েছিলেন একজন অবাঙালি ভদ্রলোক।'

'তার সঙ্গে কোথায় আলাপ হয়েছিল আপনার?'

'তারাতলায়। আমার গোডাউনের পাশে একটা ফ্যাক্টরি আছে। উনি সেখানে আসতেন। ওখানেই আলাপ।'

‘উনি কত টাকা দিয়েছিলেন আপনাকে?’

‘এক পয়সাও না।’

দময়ন্তী ধমকে উঠল, ‘মিথ্যে কথা!’

হঠাৎ শ্যামল রায় উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘মুখ সামলে কথা বলবেন বলে দিচ্ছি। মেয়েছেলে বলে রেয়াত করব ভাববেন না। আমি শ্যামল রায় ক্ষেপে গেলে জানোয়ার।’

‘ক্ষেপে না গেলে কোনো ইতর বিশেষ হয় বলে তো মনে হয় না।’ অবিচলিত গলায় বলল দময়ন্তী।

‘যা বলেছেন।’ পেছন থেকে বলল শিবেন। একটু আগে এসে ঢুকেছে। ‘চুপ করে বসো তো হে ছোকরা! এটা তোমার পাড়ার গলি নয়। বেশি গোলমাল করলে এক্ষুনি চালান করে দেব। আর, এবার একেবারে লালবাজার।’

সোমনাথ নীচু গলায় বলল, ‘বসে পড় শ্যামল, ঝামেলা করিসনি। এই নিন, ছবি চেয়েছিলেন, দিয়ে গেলুম। আর কিছু করতে হবে কি?’

দময়ন্তী মাথা নাড়ল। বলল, ‘না, আপাতত এতেই হবে। কেবল, আমার প্রশ্নের জবাব এখনও পাইনি। কত টাকা দিয়েছিলেন কামতাপ্রসাদ?’

‘সে সময়ে বাজারে আমার একটা লোন ছিল, সেটা শোধ করে দিয়েছিলেন। আমাকে না জানিয়েই করেছিলেন।’

‘কত টাকা?’

সোমনাথের মুখ আবার লাল হয়ে উঠল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ‘আপনার এ প্রশ্নের জবাব দিতে আমি বাধ্য নই। আয় শ্যামল।’

কথা হচ্ছিল পরদিন সন্ধ্যেবেলা।

দময়ন্তী বলল, ‘দারুণ দেখতে কিন্তু মামা-ভাগনেকে।’

শিবেন হাসল। বলল, ‘যা বলেছেন। ফিল্মস্টার ফিল্টস্টার চেহারা। ভাগনেটি কেন যে সিনেমায় সুবিধে করতে পারল না, কে জানে!’

এই আলোচনা আর এগোতে পারল না। দরজায় বেল বেজে উঠল। সমরেশ দরজা খুলে দিতে যিনি ঘরে ঢুকলেন, তিনি শ্রীমতী মঞ্জুলা রায়চৌধুরি, এয়ারেস টু দি এস্টেট অফ দি লেট মহারানি নির্ঝরিণী দেবী অফ হিরাগঞ্জ।

ঘরে ঢুকেই মঞ্জুলা দময়ন্তীকে বললেন, ‘আপনার সঙ্গে আমার একটা বিশেষ জরুরি কথা আছে।’

দময়ন্তী বলল, ‘বলুন।’

‘এদের সামনেই বলব?’ বলে বাকি দুজনের মুখের দিকে দেখে বললেন, ‘আচ্ছা, বলছি; গতকাল আপনি এই এঁকে আমার স্বামীর কাছে পাঠিয়েছিলেন। আমার স্বামী মাতাল, ওঁর বুদ্ধিশুদ্ধির ঠিক নেই। উনি এঁকে যা বলেছেন, সব বাজে কথা, মিথ্যে কথা। ওঁকে কেউ ওই অ্যাংলো ডাক্তারের কথা বলেনি। আমার মামিমাকে কে এর খবর দিয়েছিল, তা আমাদের জানা নেই।’

দময়ন্তী একটু চুপ করে থেকে বলল, 'ভয় দেখানো ফোনটা কবে পেয়েছেন? কাল রাত্রেই না আজ?'

মঞ্জুলা বিস্ফারিত চোখে বললেন, 'কে? কী? কীসের ফোন?'

'কামতাপ্রসাদ সম্পর্কে কোনো কথা বললে কাকে খুন করা হবে? আপনার স্বামীকে না আপনাদের দুজনকেই?'

মঞ্জুলা কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে চুপ করে রইলেন। তারপর শিউরে উঠে প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন, 'আ-আ-আমি জানি না। আমি কিচ্ছু জানি না।' বলে ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সমরেশ বলল, 'হীরাগঞ্জের এরারেস খুব ভয় পেয়েছেন দেখছি।'

দময়ন্তী চিন্তিত মুখে বলল, 'হুঁ। আর ক্ষেপে গেলে জানোয়ার শ্যামল রায়ও পেয়েছে।'

শিবেন বলল, 'তাই দেখলুম বটে। এই কামতাপ্রসাদটাই বা কে? দু-দুটো গাঁইগোত্রহীন লোক— রজার ওয়ালটন আর কামতাপ্রসাদ শর্মা। আরও বাড়বে না কি?'

দময়ন্তী গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ল। বলল, 'সে সম্ভাবনা তো দেখছি না।'

'এখন তাহলে কী কর্তব্য?'

'কাল সকালেই একবার ডাক্তার মিসেস স্বপ্না চৌধুরির সঙ্গে দেখা করতে হবে। নয়তো দেরি হয়ে যেতে পারে।'

'কত সকালে?'

'যত সকালে সম্ভব। ধরুন সাড়ে ছ-টায় এখান থেকে রওনা হব।'

'তাই হবে। সঙ্গে লোকজন নেব?'

'হ্যাঁ। প্লেন ড্রেসে। পারলে আজ রাত্রেই প্রজ্ঞা যেন ঘিরে ফেলা হয়। কারা ঢুকছে বা বেরুচ্ছে, সেদিকে যেন নজর রাখে। আর প্রয়োজন হলে যেন এগিয়ে আসতে পারে। গুলি চালাতে হতে পারে।'

শিবেন শান্ত গলায় বলল, 'বেশ, সব ব্যবস্থা করা যাবে।'

শিবেনের ফিয়াট যখন প্রজ্ঞার সামনে পৌঁছল, তখন প্রায় সাড়ে সাতটা বাজে। আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে, বড়ো রাস্তায় লোকজনের চলাচল ভালোরকম শুরু হয়ে গেছে। প্রজ্ঞার গেটের উলটোদিকে একটা প্রাইভেট বাস দাঁড়িয়ে আছে। বোধ হয় সেটার চাকা পাংচার হয়ে গেছে, সারানোর কাজ চলছে। গেটের পাশে গাছের তলায় চারজন দেহাতি লোক পুঁটুলি মাথায় অঘোরে ঘুমোচ্ছে। তারা ওই বাসের যাত্রীও হতে পারে, আবার সাধারণ পথিকও হতে পারে।

শিবেন এদের দেখিয়ে বলল, 'এরা আমাদের লোক। বাসের ভেতরে কয়েকজন আছে। প্রজ্ঞার পেছনের ক্ষেতের ভেতরেও আছে। মোটামুটি চারদিকেই ঘেরা আছে। কজনকে সামলাতে হবে মনে করেন?'

দময়ন্তী অন্যমনস্কভাবে বলল, 'একজনকেই। সেই নাটের গুরু।'

শিবেন একটু হতাশ হল বলে মনে হল। তারপর হর্ন বাজাল। গেট খুলে দিল বৃজনন্দন। গাড়ির ভেতরে ইউনিফর্ম পরা শিবেনকে দেখে সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়াল।

শিবেন গাড়ি ভেতরে ঢুকিয়ে প্রশ্ন করল, 'ডাক্তার স্বপ্না চৌধুরির কোয়াটার্স কোনটা?'

বৃজনন্দন নীরবে ডানদিকের বড়ো বাড়িটার দিকে আঙুল দেখাল। শিবেন গাড়িটা সেইদিকে ঘুরিয়ে গাড়িবারান্দার নীচে এনে দাঁড় করাল। একজন নার্স তখন সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিলেন। শিবেন তাকে স্বপ্না চৌধুরির কোয়াটার্সের কথা জিজ্ঞেস করায় তিনি তিনতলার ছাদে চলে যেতে বললেন। সেখানে পেছন দিকে দুটো ফ্ল্যাট আছে। তারই একটা ডাক্তার চৌধুরির।

তিনজনে সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠল। বাঁ-দিকের ফ্ল্যাটের দরজায় বড়ো বড়ো করে লেখা 'ড. এস চৌধুরি'। শিবেন বেল বাজাল।

দরজাটা খুলতে একটু দেরি হল। ড. চৌধুরি একটা হালকা সবুজের ওপর গাঢ় সবুজ রঙের বড়ো বড়ো ছোপ দেওয়া পা পর্যন্ত লম্বা ড্রেসিং গাউনের কোমরের দড়ি বাঁধতে বাঁধতে দরজা খুলে দিলেন। ভদ্রমহিলার চোখ দুটো ফোলা ফোলা, অল্প লাল, মনে হল সারা রাত ঘুমোননি। অতিথিদের দেখে মুখে হাসি টেনে বললেন, 'একী, আপনারা এত সকালে?' কিন্তু কথার সুরে খুব একটা বিস্ময় ফুটে উঠল না। তারপর একটু থেমে বললেন, 'আসুন, ভেতরে আসুন।'

বসবার ঘরটা খুব একটা বড়ো নয়। একগাদা আসবাবপত্রে ভরতি। একটা সোফাসেট, গোটা পাঁচেক চেয়ার, একটা ইজিচেয়ার, দুটো বড়ো বড়ো বইয়ের আলমারি, একটা শো-কেস, একটা রেফ্রিজারেটার, কী নেই! ভদ্রমহিলা সবাইকে সোফায় বসিয়ে নিজে একটা চেয়ার টেনে বসলেন। তারপর খুব নীচু গলায় প্রশ্ন করলেন, 'আমি কি আপনাদের কোনো সাহায্য করতে পারি?'

দময়ন্তী মাথা নাড়ল। বলল, 'পারেন। ডক্টর বীথিকা বোসের হত্যাকারী যে কে তা এই মুহূর্তে নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে। তার পরিচয় প্রকাশ করতে আমাদের সাহায্য করলেই আমরা কৃতজ্ঞ হব।'

স্বপ্না সামান্য ইতস্তত করে বললেন, 'আপনি কী বলছেন আমি বুঝতে পারছি না। আমি তো আপনাদের আগেই বলেছি যে বীথিকার মার্ডারার তার হাজব্যান্ড অরিজিৎ।'

'আপনি যখন একথা আমাদের বলেছিলেন আপনি তখন খুব সম্ভব সে কথাই বিশ্বাস করতেন। কিন্তু এখনও তা করেন কি? বোধ হয় না। অতএব, আমাদের কাছে সত্য প্রকাশ করে বলুন। তাতে আপনারও উপকার হবে, কারণ হত্যাকারীকে আশ্রয় দেওয়া বা তার পরিচয় গোপন রাখার চেষ্টা করাও আইনের চোখে গুরুতর অপরাধ। তা ছাড়া, কৃতজ্ঞতা বোধ বলেও একটা জিনিস আছে। আপনি ভুলে যাবেন না যে বীথিকা আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল, আপনার বিপদের দিনে আপনাকে আশ্রয় দিয়েছিল, সাহায্য করেছিল।'

স্বপ্না কম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'অরিজিৎ মার্ডারার নয়— একথা মনে করবার কোনো কারণ আছে কী? স্ত্রীর ঘরে ঢুকে তার লিপস্টিকে বিষ মাখিয়ে রেখে আসার সুযোগ তারই সবচেয়ে বেশি ছিল, তাই না?'

দময়ন্তী মাথা নাড়ল। বলল, 'না, তা নয়। এবং আপনিও সে কথা জানেন। অরিজিৎ সম্ভবত অনেকদিনই তার স্ত্রীর ঘরে ঢোকেননি। আমরা তাঁদের আলাদা ঘর দেখে এসেছি।'

‘তাহলে বীথিকাকে কে মেরেছে? আপনি কী বলতে চান?’

‘আমি বলতে চাই বীথিকাকে মেরেছে তার প্রেমিক এবং শয্যাসঙ্গীদের একজন। তিনি যে কে তা আপনি জানেন। আপনিই সম্ভবত তাকে বীথিকার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। বীথিকার মৃত্যুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ না থাকলেও, তার মৃত্যুর বেশ কিছুটা দায়িত্ব কিন্তু আপনার ওপর বর্তায়।’

স্বপ্না প্রবল বেগে মাথা নেড়ে প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, ‘না, না, না। আমি এ ব্যাপারে কিচ্ছু জানি না। আমাদের অনেক কমন ফ্রেন্ড ছিল। তাদের কে কী করেছে, তার জন্যে আমি কেন দায়ী হব?’

‘দায়ী হবেন, কারণ আপনি তার পরিচয় জেনেও তাকে আড়াল করে রাখতে চাইছেন।’

‘বিশ্বাস করুন—’ কাতর গলায় বললেন স্বপ্না, ‘আমি ইচ্ছে করে কাউকে আড়াল করতে চাইছি না।’

‘খুব সম্ভব আপনার কথাই সত্যি। সোমনাথ কি আপনাকে খুন করে ফেলার ভয় দেখিয়েছে?’

স্বপ্না বিস্ফারিত চোখে দময়ন্তীর দিকে তাকালেন। সে চোখে অবিমিশ্র আতঙ্ক। কিন্তু কোনো কথা বললেন না।

শিবেন তখন উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘ডক্টর চৌধুরি, আমাকে একবার আপনার ফ্ল্যাটটা সার্চ করে দেখতে হবে। যদি ওয়ারেন্ট দেখতে চান, তাও দেখাতে পারি।’

স্বপ্না কোনো কথা বলার আগেই হঠাৎ নীচে একটা গাড়ি স্টার্ট দেবার শব্দ পাওয়া গেল। ফিয়াট গাড়ি।

শিবেন চমকে উঠে বলল, ‘আমার গাড়ি! এ ফ্ল্যাট থেকে বেরুবার অন্য রাস্তা ছিল?’ বলে এই প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষা না করে বিদ্যুদ্বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে ছাদে চলে গেল। বাকি তিনজন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল পেছনে পেছনে।

ওপর থেকে দেখা গেল শিবেনের গাড়ি বেশ জোরে চলেছে গেটের দিকে। বৃজনন্দন গেটটা খুলে দিয়েছে। গাড়িটা বেরিয়ে যাওয়ার বেশি দেরি নেই। শিবেন তখন কোমর থেকে পিস্তল বের করে শূন্যে দু-বার গুলি ছুড়ল। সঙ্গে সঙ্গে গেটের ওপারে নানারকম কার্যকলাপ শুরু হয়ে গেল। গাছের নীচে যারা ঘুমোচ্ছিল, তারা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে গেটের সামনে চলে গেল। কিন্তু শিবেনের গাড়িটা আসতে দেখে একটু ইতস্তত করে পাশে সরে দাঁড়াল। তখন শিবেন আবার দু-বার গুলি ছুড়ল। তখন বাসের লোকেদের একজন ওপরে তাকিয়ে শিবেনের ইউনিফর্ম পরিহিত মূর্তি দেখতে পেয়ে চিৎকার করে কী একটা বলল সামনে থাকা সঙ্গীদের। কিন্তু তখন তাদের কিছু করবার নেই। গাড়িটা তাদের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে এসে তখন প্রায় বড়ো রাস্তায় উঠে পড়েছে। তার ঠিক সামনে তখন বাসটা।

হঠাৎ বাসের ভেতর থেকে একঝলক গুলি ছুটে এল। ফিয়াটটা মাতালের মতো টলে উঠে একপাশে বেঁকে সামনে মুখ থুবড়ে পড়ল।

শিবেন কাতরে উঠে বলল, ‘গেল, আমার নতুন গাড়িটা গেল!’

ইতিমধ্যে শিবেনের লোকেরা গাড়িটা ঘিরে ফেলেছে। দুজন ড্রাইভারের দিকের দরজা খুলে একজনকে টেনে বের করল। তার শার্টে রক্তের ছোপ আর দেখে মনে হল হয়

অজ্ঞান নয়তো মরে গেছে। অন্যদিকের দরজা খুলে আর একজনকে বের করা হল। তার ঘাড়টা একদিকে এমনভাবে বেঁকে গেছে যে সন্দেহ থাকে না যে তার শরীরে আর প্রাণ নেই।

সমরেশ বলল, 'দুজন ছিল দেখছি। ডানদিকেরটা তো সোমনাথ, মরেনি বোধ হয়, তবে জোর চোট পেয়েছে। অন্যটা কে? শ্যামল?'

'না।' বললেন স্বপ্না, 'ওটা একটা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান গুন্ডা, নাম রজার ওয়ালটন।'

সমরেশের অর্কিড রোডের ফ্ল্যাটের বসবার ঘরে কথা হচ্ছিল। দময়ন্তী বলল, 'বীথিকার খুন হওয়ার ব্যাপারে প্রথমেই যে ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগে সেটা হচ্ছে খুন করার পদ্ধতিটা। লিপস্টিকে তার স্বামী বিষ মিশিয়ে রেখেছিল বলে পুলিশ ধরে নিয়েছিল। তার মানে এটা হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে খুন করা নয়। বেশ ধীরে ধীরে করা যেন হত্যাকারীর কাছে সময়ের কোনো মূল্যই নেই। অর্থাৎ, হত্যাকারী বীথিকাকে মেরে ফেলতে চায়, কিন্তু সে যখন খুশি মরুক, তাতে তার কিছু যায় আসে না। সে লিপস্টিকে বিষ মাখিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে। তাও যদি বীথিকার একটা কি দুটো লিপস্টিক থাকত! হত্যাকারী জানে যে তার অগুন্তি লিপস্টক; তাদের সবগুলোই সে ব্যবহার করে এবং তার মতো খামখেয়ালী মেয়ে কখন কোনটা করে সে ব্যাপারে নিশ্চয়ই কারুর সঙ্গে পরামর্শ করে না। তার মানে, এটা ভেবেচিন্তে খুন করা। তাই যদি হবে, যদি তার পতিদেবতাই তাকে খুন করে থাকবে, তাহলে সে লিপস্টিকটা পুলিশ আসার আগেই সরিয়ে ফেলল না কেন? বড়ো ডাক্তারবাবু খুব ভালো করেই জানতেন যে মৃতদেহের পাশে পড়ে থাকা একটা লিপস্টিক তুলে নিয়ে তিনি যদি ড্রেসিং টেবিলের ওপর অসংখ্য লিপস্টিকের সঙ্গে রেখে দিতেন, তাহলে কেউ কোনো প্রশ্নই করত না। আর পুলিশও কোনোদিন ধরতে পারত না বীথিকার ঠোঁটে লেগে থাকা পটাসিয়াম সায়ানাইড এসেছে লিপস্টিক থেকে। আসলে, এই সমস্ত ঘটনাটা একটা জিনিসই প্রমাণ করে যে হত্যাকারী চেয়েছিল যখন বীথিকা মারা যাবে তখন সে যেন অনেক দূরে থাকে। এই লোক তার স্বামী হতে পারে না। তাহলে সে কে?

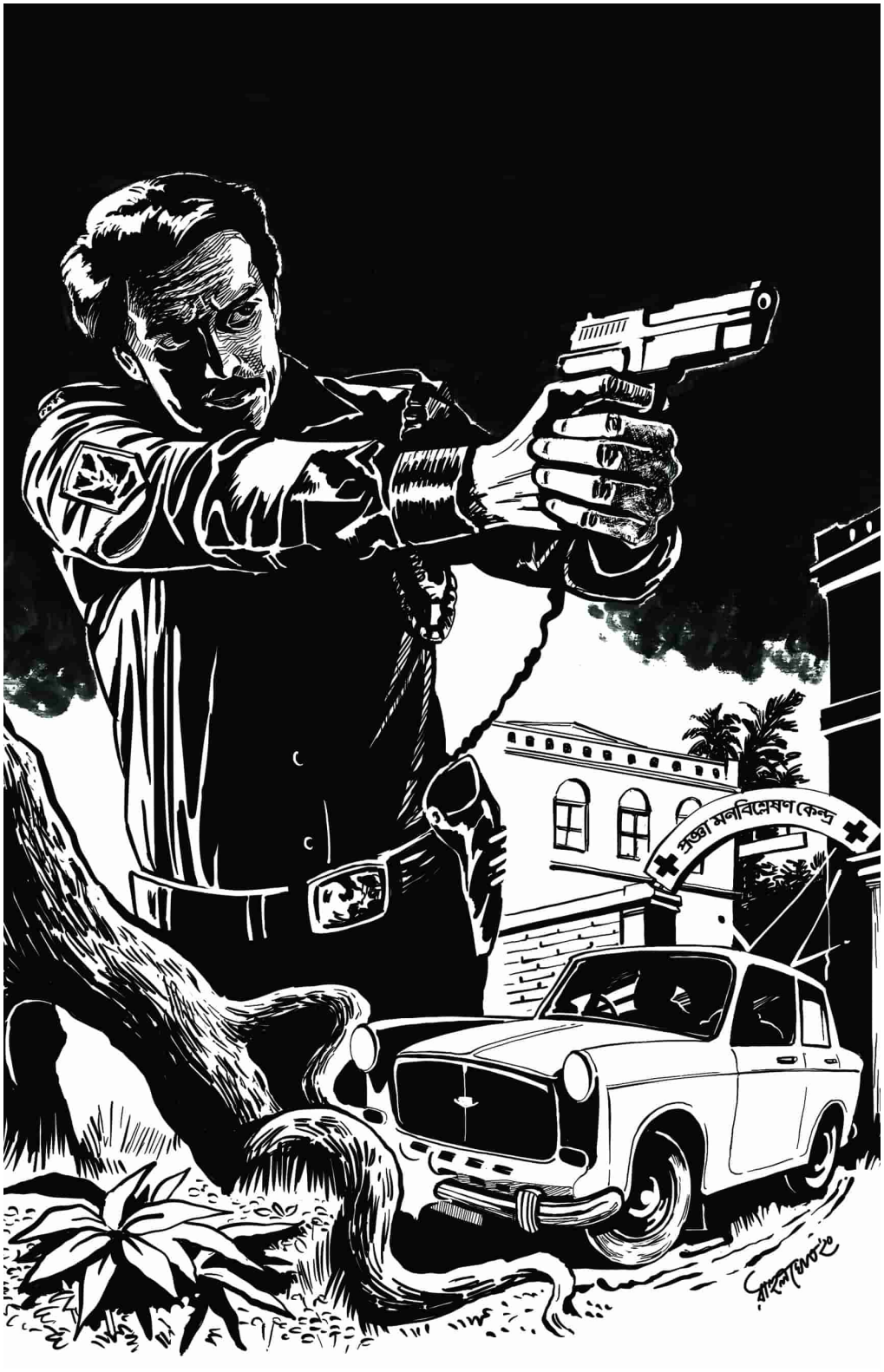

‘শিবেনবাবু প্রথমেই বলেছিলেন যে বীথিকার স্বভাবচরিত্র ভালো ছিল না, সে নিমফোম্যানিয়াক ছিল। তাহলে ধরে নেওয়া যেতে পারে যেকোনো প্রেমিকই তার খুনের জন্যে দায়ী। সে কে হতে পারে?

‘এখানে এসে বাঁশবনে ডোম কানা। বীথিকার ভালোবাসার লোকের অভাব ছিল না। কাকে ছেড়ে কাকে ধরা যাবে? তা ছাড়া, তাদের সকলের পরিচয় কে জানে? জানতে পারে দুজন, বৃজনন্দন আর মদনমোহন কাঞ্জিলাল। কিন্তু দুজনের কেউই এ ব্যাপারে কিছু জানাবে না, কারণ এরা দুজনেই তাদের অন্নদাত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞ। এরা দুজনেই বীথিকার চরিত্রের খারাপ দিকটার প্রতি চোখ বন্ধ করে রেখেছেন।’

হেমন্ত সরকার বললেন, ‘কিন্তু ডাক্তার অরিজিৎ বোসকে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ ছিল।’

‘নিশ্চয়ই ছিল। ভদ্রলোকে একদিকে পাক্কা সাহেব, অন্যদিকে টাকার জন্যে নিজের বিবেক জলাঞ্জলি দিতে একেবারেই অপারগ নন। টাকার জন্যে যিনি নিজের আত্মীয়স্বজন, এমনকী নিজের বাবাকেও ত্যাগ করতে পারেন, তিনি যে স্ত্রী লক্ষ লক্ষ টাকা ওড়াচ্ছেন তাঁকে খুন করতে পারেন না? অবশ্যই পারেন। কিন্তু বীথিকাকে সরিয়ে দেবার উদ্দেশ্য যদি তার হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া হয়, তাহলে তাঁর কি উচিত ছিল না হত্যার চিহ্নগুলো সরিয়ে দিয়ে নিজের ওপর থেকে সব সন্দেহ উঠিয়ে নেওয়া? তা যদি তিনি না করেন, তাহলে বলতে হবে হয় তিনি ভয়ানক বোকা, নয়তো এমন সুপার চালু যে পুলিশ আমি যেভাবে চিন্তা করছি ঠিক সেইভাবে চিন্তা করবে এটা ধরে নিয়েছেন। ডাক্তার অরিজিৎ বোসের পক্ষে এই দু-রকমের কোনোটাই হয়তো ঠিক স্বাভাবিক নয়। এ ছাড়াও ধরে নিতে হয় যে তিনি ছিলেন সুপার অভিনেতা। অন্নদাবাবু আর তাঁর দুই ছেলে বীথিকার স্বভাবচরিত্র কেমন তা খুব ভালো করেই জানতেন। তাঁদের পক্ষে বীথিকার স্বামীর মনে তার প্রতি কোনো গভীর প্রেম থাকবে এটা আশা করা অসম্ভব। তাঁদের অরিজিৎকে একটু সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা স্বাভাবিক। তা সত্ত্বেও রাজমোহন আর রাজকুমারের তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রমাণ করে যে তারা অরিজিতের ভেতরে তাদের বোনের প্রতি কোনোরকম জিঘাংসায় কণামাত্র চিহ্নও দেখতে পায়নি কোনোদিন।

‘এটা আরও প্রমাণ করে যে বীথিকার ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নেওয়া টাকার প্রাপক তারা নয়। তাহলে অন্য এক ব্যক্তির উপস্থিতি প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ, শিবেনবাবুর যে সন্দেহ যে বীথিকার জীবনের অন্ধকারময় দিকটাই তার মৃত্যুর কারণ, সেটাই সঠিক।’

হেমন্ত বললেন, ‘এমন তো হতে পারে যে ওই টাকাগুলোর জন্যে দুই শালা আর ভগ্নীপতি মিলে এই কাণ্ডটা করেছে?’

‘না, তা হতে পারে না। কারণ, সেক্ষেত্রে খুনটা তাড়াতাড়ি সারতে হত। অনন্তকাল বসে থাকার মতো সময় দেওয়া যেত না। যদি বীথিকার অজান্তে টাকাটা ওঠানো হয়ে থাকত, তাহলে সেটা ধরা পড়ে যাওয়ার আগেই কাজটা সেরে ফেলা দরকার ছিল।

‘বেশ, এবার তাহলে আমরা আসছি ভোলানাথ, শম্ভুচন্দ্র আর নির্ঝরিণীর ব্যাপারটায়। এঁরা কীভাবে মারা গিয়েছেন সেটা আমরা সবাই জানি। এঁরা একসময় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে নীলকান্তপুরে চিকিৎসার জন্যে গিয়েছিলেন। সেই সময়ে দুটো অবসেশন বা স্থির বিশ্বাস এঁদের সুস্থ হয়ে আসা মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এক, এঁদের আত্মীয়রা এঁদের শত্রুপক্ষ এবং দুই, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা অ্যালোপ্যাথির চেয়ে ভালো। এ দুটোর কোনোটই খুব কঠিন কর্ম ছিল না। এঁদের নিকটাত্মীয়রা যে কী পদার্থ তা তো আমরা দেখেছি। আর মানসিক চিকিৎসায় কিছু ওষুধ বা শক থেরাপি জাতীয় কিছু ব্যবস্থা আছে যা রুগিদের মনে ভীতির সঞ্চার করে। অতঃপর এঁদের আত্মীয়দের দুর্বলতাগুলো দেখে নিয়ে সেটা কাজে লাগিয়ে এঁদের এক বিশেষ হোমিওপ্যাথের কাছে পাঠানোর বন্দোবস্ত করা হয়। এই হোমিওপ্যাথ তাঁদের কীভাবে উইল করতে হবে, কী কী ব্যবস্থা

নিতে হবে ইত্যাদি ভালো করে বুঝিয়ে দিয়ে তাঁদের হাতে হেপাটাইটিসের জীবাণুযুক্ত বিষের শিশি তুলে দেয়।

'এঁরা তিনজনে পরস্পরের পরিচিত ছিলেন না, তিনজন প্রজ্ঞাকে প্রচুর টাকা দান করে গেছেন— যেটা অনেকেই দিয়ে থাকেন, তিনজনই পরিণত বয়সে হেপাটাইটিসেই মারা গেছেন যেটা নিতান্ত একটা স্বাভাবিক ঘটনা। অথচ এই ঘটনাগুলোর মধ্যে যে একটা গোলমাল আছে এবং তাদের যোগসূত্র যে নীলকান্তপুর— পুলিশ এটা আবিষ্কার করাতেই এই নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্রটা ফাঁস করে দেওয়া সম্ভব হল।' বলে দময়ন্তী সপ্রশংস দৃষ্টিতে হেমন্ত সরকারের দিকে তাকাল। হেমন্ত একটা গ্রাম্ভারি হাসি হাসলেন বটে, কিন্তু কোনো কথা বললেন না।

দময়ন্তী বলে চলল, 'এখন প্রশ্ন দুটো। এক, কে এই রুগিদের মনে অবসেশন ঢুকিয়েছেন, বীথিকা না অরিজিৎ? দুই, কে এই রজার ওয়ালটন? বীথিকা, অরিজিৎ না সম্পূর্ণ অন্য কোনো লোক? প্রথমে এক নম্বর প্রশ্নটা দেখা যাক। অরিজিতের টাকার প্রতি প্রলোভনের কথা আমরা জানি। বরং, বীথিকার কথাই জানি না। সে বড়োলোকের মেয়ে, তার লোভ না থাকারই কথা। কাজেই, সন্দেহটা স্বভাবতই অরিজিতের ওপরেই পড়ে। এখন, এই ডোনেশন আর ডোনারের মৃত্যু— এ ব্যাপারটার শুরু গত বছরের আগের বছর জানুয়ারি মাসে। অর্থাৎ বছর আড়াই আগে। আমরা দেখলুম, ডাক্তার মিত্রদের বাড়ির একতলায় স্পেশাল ওয়ার্ড উঠে আসে বছর তিনেক আগে। অর্থাৎ, এই সময় থেকেই ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত। এই ওয়ার্ড ধনী রুগিদের জন্যে। খোঁজ নিলে দেখবেন, এই তিনজনই ওই ওয়ার্ডে ছিলেন। এটা কিন্তু একটা সম্ভাবনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করায়। তা হচ্ছে, স্পেশাল ওয়ার্ড বাড়ির নীচে উঠে আসার আগে পর্যন্ত, বীথিকার সঙ্গে রুগিদের দূরত্ব ছিল অনেক বেশি। সে পাগলের ডাক্তার ছিল না, সে চালাত ল্যাবরেটরি। মাঝে মাঝে ঘুরে দেখত হয়তো। অথচ অরিজিতের সঙ্গে রুগিদের আগেও যে সম্পর্ক ছিল, তখনও তাই রইল। উনি যদি রুগিদের মগজ ধোলাই করতে চাইতেন, সেটা অনেক আগেই করতে পারতেন। স্পেশাল ওয়ার্ড নিজের কোয়ার্টারের একতলায় উঠে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করার দরকার ছিল না। তাহলে, এই সম্ভাবনাটা জোরদার হয় যে মগজ ধোলাই-এর ব্যাপারটা বীথিকার কীর্তি, অরিজিতের নয়।

'এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন, কে এই রজার ওয়ালটন? এই প্রশ্নের জবাব আছে রহিম ওসমান লেনে। জনাকীর্ণ এই রাস্তা যেখানে অ্যাংলো ইন্ডিয়ানরা মোটেই অপরিচিত বা অপ্রতুল নয়। সেখানে অরিজিতের মতো গম্ভীর প্রকৃতির ব্যস্ত ডাক্তার মাথায় পরচুলো পরে আর চোখে কালো চশমা পরে আবদুল লতিফ নুরুদ্দিনের সঙ্গে একগাল হেসে কথা বলবেন আর তাঁর মনে কোনো সন্দেহ জাগবে না, এটা কখনো সম্ভব? অরিজিতের সমস্ত পরিচিতরাই, মানে যাঁরা তাঁকে ছোটোবেলা থেকে দেখছেন বা যাঁরা তাঁকে কর্মক্ষেত্রে দেখেছেন, তাঁরা সকলেই একটা কথা বলেছেন যে তিনি গম্ভীর প্রকৃতির, হাসি ঠাট্টার মধ্যে থাকেন না আর স্বপ্নার ভাষায় তিনি রীতিমতো রামগড়ুরের ছানা সদৃশ্য লোক— তাঁর পক্ষে এহেন অভিনয় কখনো সম্ভব হতে পারে না। আর লম্বা বীথিকা পরচুলো পরে নকল গোঁফ-দাড়ি লাগিয়ে বেঁটে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সাজতে পারে, কিন্তু তার পক্ষেও দিনের পর দিন নুরুদ্দিনকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হত কি? তার ওপর ববি রোজারিওকেও মনে রাখতে হবে। সে কিন্তু নীলকান্তপুর বা অন্নদাচরণ মিত্রের পরিবেশের সঙ্গে মেলে না। অতএব, প্রবলতম সম্ভাবনা হচ্ছে যে রজার ওয়ালটন রজার ওয়ালটনই। অর্থাৎ, একজন শতকরা এক-শো ভাগ অ্যাংলো ইন্ডিয়ান, যিনি কলকাতার আন্ডারওয়ার্ল্ড বা অপরাধ জগতের বাসিন্দা।

‘তাহলে বোঝা যাচ্ছে, রজার ওয়ালটনকে কেউ এই কাজে লাগিয়েছিল। বীথিকা একা লাগিয়ে থাকতে পারে বা সে তার প্রেমিকের সঙ্গে একসঙ্গে এই কাজ করে থাকতে পারে। বীথিকার নানারকমের লোকের সঙ্গে হৃদ্যতা ছিল, তাদের কেউ অপরাধ জগতের সঙ্গে পরিচিত থাকতে পারে। অর্থাৎ:, একটা ব্যাপারে সন্দেহ থাকে না যে এই ষড়যন্ত্রে যে বীথিকার সঙ্গী ছিল তার একটা ক্রিমিন্যাল রেকর্ড ছিল বা আছে। সে কে হতে পারে?

‘এইখানেই আমার সন্দেহ হল সোমনাথের ওপর। তার তিনটে কারণ আছে। প্রথম কারণ, আমি আপনাদের আগেই বলেছিলুম যে এই ষড়যন্ত্রটা একটা নিরেট শয়তানি। সাধারণ মস্তিষ্ক থেকে এহেন প্যাঁচালো অথচ ক্ষুরধার বুদ্ধি বেরোয় না। এ বুদ্ধি একজন স্বাভাবিক অপরাধীর। আমরা এই ঘটনাগুলোর সঙ্গে যুক্ত যত লোকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, তার মধ্যে এহেন ব্যক্তি আছেন দুজন, সোমনাথ আর শ্যামল। বাকিরা কেউ মাতাল, কেউ রেসুড়ে, কিন্তু ক্রিমিন্যাল নয়।

‘দ্বিতীয় কারণ, সোমনাথ আর শ্যামল, দুজনেই অসাধারণ সুদর্শন। শিবেনবাবু একেবারে প্রথম দিন আমাদের বলেছিলেন যে বীথিকা নিমফোমেনিয়্যাক ছিল তো বটেই, তার ওপর হ্যান্ডসাম পুরুষ দেখলে তাদের পেছনে লাগতে দেরি করত না। সে কথাটা আমার মনে ছিল।

‘তৃতীয় কারণ, সোমনাথ ওষুধের ব্যবসা করত এবং সেই সূত্রে তার নীলকান্তপুরে যাতায়াত ছিল, কেবল রুগির আত্মীয় হিসেবে নয়। সে যদি কেবল রুগির আত্মীয় হিসেবে ভিজিটিং আওয়ারে যেত, তাহলে তার বীথিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তো দূরের কথা, পরিচিত হবারই সম্ভাবনা অনেক কম থাকত। স্বপ্নার সঙ্গে কথা বলে আমার দৃঢ় ধারণা হয়েছিল যে ল্যাবরেটরির ওষুধের সাপ্লায়ার হিসেবে সোমনাথের সঙ্গে তার পরিচয় হয়, হয়তো ঘনিষ্ঠতাও হয় এবং সেই তাকে তার বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। আজ বোঝা গেছে যে আমার ধারণাটা ঠিকই ছিল।’

সমরেশ এইখানে বাধা দিল। বলল, ‘কিন্তু সোমনাথই কেন? এ তো বীথিকার অন্য যেকোনো প্রেমিক, আর অপরাধপ্রবণতা থাকা সম্ভব, এই ষড়যন্ত্র করতে পারত।’

‘তা যে পারত না, তা নয়। কিন্তু এই মৃত্যুর ঘটনাগুলো এতই ঘড়ির কাঁটার মতো অবধারিত ভাবে ঘটেছে যে এতে ভেতরের লোক যুক্ত নেই— এটা ভাবা অত্যন্ত কঠিন। তারা স্বেচ্ছায় থাকতে পারে অথবা তাদের কেউ ব্যবহার করেছে, তাও হতে পারে। এটা যদি মেনে নেওয়া যায়, তাহলে সোমনাথের ওপরেই সবচেয়ে বেশি সন্দেহ হয়।

‘এ ছাড়া, আরও দুটো বিষয় আছে। প্রথম, যাঁরা উইল করেছেন, তাঁরা কিন্তু তাঁদের আশ্রিতরা, যাদের ওপর তাঁদের প্রচণ্ড রাগ, তাদের সম্পূর্ণ বঞ্চিত করেননি। অস্থাবর সম্পত্তি হয়তো দান করেছেন, কিন্তু কাউকে ভিটেমাটি ছাড়া করেননি। এটা তাঁরা মগজ ধোলাইয়ের ফলেই করেছেন, আপন বুদ্ধিতে করলে ব্যাপারটা অন্যরকম হত। এতে প্রমাণ হচ্ছে যে যারা মগজ ধোলাই করেছে, হয় তারা এই রুগিদের আত্মীয়, নয়তো রুগির আত্মীয়রা গোলমাল করলে তাদের আসল পরিচয় ফাঁস হয়ে যাবার সম্ভাবনা এড়াতে সচেষ্ট। এ ব্যাপারে পরে বলছি।

‘দ্বিতীয়, প্রথমে মারা গেছেন নির্ঝরিণী, সেটা স্টেট কেস বলে ধরে নিতে পারি। তারপর গেছেন ভোলানাথ, এটাই মূল লক্ষ্য। অতঃপর শম্ভুচন্দ্র, এটা দুটো সাফল্যের পর তৃতীয় প্রচেষ্টা। এটা যদি ঠিক হয়, তাহলে সোমনাথ শ্যামল কম্বিনেশনকে কিছুতেই বাদ দেওয়া যায় না।

‘এইবার সম্মুখ যুদ্ধ। বিশ্বানন্দকে ডেকে এনে কড়কানো হল। তার পরদিনই ধরা হল পঙ্কজকে। অথচ, সোমনাথকে কিছু বলা হল না, কেবল ছবি চাওয়া হল। এটা ইচ্ছে করেই করেছিলুম যাতে সোমনাথের টনক নড়ে। তাই হল। পরদিন সোমনাথ, শ্যামল দুজনেই এসে হাজির হল। এসে এমন ভান করল যেন তাদের কেউ ভয় দেখিয়েছে। এই ভানটার প্রয়োজন ছিল। কারণ, তার পরেই ফোনে ভয় দেখানো হল মঞ্জুলাকে এবং বিশ্বানন্দকেও। এঁরা ফটো দেখে চিনে ফেলতে পারেন তাই এই সাবধানতা।’

শিবেন জিজ্ঞেস করল, ‘সোমনাথই কি কামতাপ্রসাদ?’

‘না। খুব সম্ভবত, শ্যামল। সে এখন স্বীকার করবে বলে আমার ধারণা। সে সিনেমায় অভিনয় করত, মেকআপ নিতে অভ্যস্ত ছিল। তা ছাড়া অনেকগুলো টাকা ক্যাশে হাতবদল হচ্ছে, সেটা একেবারে নিজের লোক ছাড়া অন্য কাউকে দিয়ে করানো যুক্তিযুক্ত নয়।’

‘তার মানে, আপনার ছবি চাইবার আসল উদ্দেশ্য ছিল সোমনাথকে জানিয়ে দেওয়া যে কামতাপ্রসাদের ব্যাপারটা ধরা পড়ে গেছে?’

‘হ্যাঁ, তাই। সে যখন মঞ্জুলা আর বিশ্বানন্দকে ফোন করে জানতে পারে যে আমরা অনেকদূর এগিয়ে গেছি এবং মামা-ভাগনের সঙ্গে সজোরে ধমকে কথা বলায় তার মনে কোনো সংশয় রইল না যে আমাদের সমস্ত সন্দেহ তারই ওপরে।

‘মঞ্জুলার সঙ্গে কথা বলে আমার মনে হল যে খুব তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা শেষ করে আনার সময় হয়েছে। বিশ্বানন্দ আর মঞ্জুলা ভীরু মেরুদণ্ডহীন। তারা ভয় পেলে মুখ খুলবে না। কিন্তু, আরও একজন আছে যে মুখ খুলতে পারে যদি সে জানতে পারে যে তার প্রাণের বন্ধুকে খুন করেছে সোমনাথ। সে— স্বপ্না চৌধুরি। তার ঘাড়ে গিয়ে পড়ে পিঠে বন্দুক না ঠেকালে তাকে ভয় দেখানো কঠিন।’

সমরেশ বলল, ‘বেশ, এ পর্যন্ত দিব্যি বোঝা গেল। কিন্তু আমার আসল প্রশ্নটার জবাব এখনও পেলুম না। বীথিকাকে মারার দরকারটা কী ছিল? বেশ তো চলছিল। দিব্যি বড়োলোক রুগিদের হাপিস করে দিয়ে তাদের টাকা ঘরে তোলা হচ্ছিল। এক হতে পারে, বীথিকা অরিজিৎকে ডিভোর্স করে সোমনাথের ঘাড়ে চড়ার তালে ছিল। তাহলে অবশ্য তাকেও হাপিস করে দেওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।’

দময়ন্তী মাথা নাড়ল। বলল, ‘না, ব্যাপারটা তা নয়। বীথিকার মৃত্যুর জন্যে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী হচ্ছেন তার ননদাই শ্রীবিকাশচন্দ্র ঘোষ।’

সবাই সমস্বরে বলল, ‘তার মানে?’

‘তার মানে বুঝতে হলে, আমাদের একটু পিছিয়ে যেতে হবে। এই ষড়যন্ত্রটা আদৌ শুরু হল কীভাবে, সেটা অনুমান করা দরকার। সোমনাথ ভোলানাথের আশ্রিত এবং তাঁর খিটখিটে মেজাজের জন্যে পদে পদে অপমানিত ছিল। ভোলানাথকে চিরতরে সরিয়ে দেবার ইচ্ছে নিশ্চয়ই তার অনেকদিনের। কিন্তু সে জানত যে ভোলানাথ ঘুঘু লোক, তাঁর উইলে যে কাকে কী দেওয়া আছে তা জানা দুঃসাধ্য। যখন বীথিকার সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্ক স্থাপিত হল, তখন দেখা গেল যে এরকম একটা ষড়যন্ত্র করা সম্ভব যাতে সে তিনটে উদ্দেশ্য সফল করতে পারে— এক, ভোলানাথের স্থাবর সম্পত্তি দখল করতে পারে; দুই, তার অস্থাবর সম্পত্তি বকলমে হস্তগত করতে পারে; তিন, ভোলানাথকে সরিয়ে দিতে পারে।’

সমরেশ বলল, 'এত ঝামেলা করার কি দরকার ছিল? মগজ ধোলাইয়ের ব্যাপার তো? ভোলানাথকে দিয়ে সব সম্পত্তি সোমনাথকে লিখিয়ে নিয়ে তাঁকে চন্দ্রবিন্দু করে দিলেই ঝামেলা মিটে যেত।'

'না, একেবারেই মিটত না। উকিল মহাদেব রায় আর ডাক্তার বিমল দাশগুপ্তের কথাগুলো ভেবে দেখ। তাঁদের মক্কেল যে উইল করেছেন, তাতে কিন্তু তাঁদের মনে কোনো সন্দেহই জাগেনি, তুমি যেরকম বলছ সেরকম হলে ব্যাপারটা অন্যরকম হত। আর যদি কোনো কারণে হেপাটাইটিসের বিষ কাজ না করত এবং রুগির মৃত্যু না হত, তাহলে এ ব্যাপারে একটা খোঁজখবর শুরু হতই। সোমনাথ সেই ঝুঁকি নিতে পারত না। উকিল আর ডাক্তারদের বাদ দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ যিনি একবার মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন, তাঁর স্বহস্তলিখিত উইল একমাত্র গ্রাহ্য হতে পারে যদি তাতে এই এঁদের সাক্ষী হিসেবে সই থাকে। তখন আর সেটাকে কোনো সন্দেহ করার প্রশ্ন ওঠে না বা সেটা চ্যালেঞ্জও করা যায় না।

'এখন, ষড়যন্ত্রটা যখন সফল হল, বীথিকা তার প্রেমিককে মোটা টাকা সরিয়ে দিতে লাগল এবং সোমনাথের ব্যবসা বেশ ফুলেফেঁপে উঠতে শুরু হল, তখন অরিজিৎ বিকাশ ঘোষকে নীলকান্তপুরে নিয়ে এলেন। বীথিকা যে টাকা সরাচ্ছে সেটা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। বীথিকাকে এ ব্যাপারে কিছু বলার ক্ষমতা বা প্রবৃত্তি কোনোটাই তাঁর ছিল না। অথচ রুগিদের ডোনেশনের টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে, সেটা ঠেকানো দরকার। অতএব বিকাশ ঘোষের ডাক পড়ল। বিকাশ অ্যাকাউন্ট্যান্ট এবং অরিজিতের প্রতি সহানুভূতিশীল। এই টাকা কোথায় যাচ্ছে সেটা খুঁজে বের করার জন্যে তাঁর চেয়ে উপযুক্ত লোক আর কে আছে বিশেষত যেখানে কাঞ্জিলালের কাছ থেকে এ ব্যাপারে সাহায্য পাওয়ার আশা বৃথা।

'বীথিকা কিন্তু ব্যাপারটা তৎক্ষণাৎ হৃদয়ঙ্গম করল। সে পত্রপাঠ বিকাশকে তাড়িয়ে দিল এবং সোমনাথের সঙ্গে পরামর্শ করতে বসল। সোমনাথের মাথায় তখন আকাশ ভেঙে পড়ল। যে টাকাটা তারা দুজনে সরিয়েছে, সেটা সাদা টাকা হিসেবেই ব্যাঙ্কে জমা পড়েছে। অতএব, যদি সেটা কোনো ভুয়ো কোম্পানির নামেও গিয়ে থাকে, তাহলেও পুলিশের পক্ষে ইনভেস্টিগেশন করে সোমনাথ পর্যন্ত এসে পৌঁছনো অসম্ভব নয়। আর তখন বৃহত্তর বিপদের সম্ভাবনা। সোমনাথ ভালো করেই জানে যে কোনো ষড়যন্ত্রই একেবারে নিশ্ছিদ্রভাবে সুরক্ষিত হতে পারে না। তার ওপর তার হাতে তিন তিনটে মৃত্যুর দায়।

'তখন সে কি করতে পারত? তারা যেখানে টাকাটা সরিয়েছিল, প্রথমে সেটার সমস্ত চিহ্ন বিলোপ করা। তার সহজতম রাস্তা ছিল ডাক্তার অরিজিৎ বোসকে খুন করা। আমার বিশ্বাস এই দ্বিতীয় কর্মটি করতে গিয়ে তারা ব্যর্থ হয়েছিল। কারণ, অরিজিতের সঙ্গে বীথিকার কোনো সম্পর্ক নেই। তিনি থাকেন আলাদা। কখন আসেন, কখন যান, কোনো হিসাব বীথিকার জানা নেই। অতএব, তাঁকে খুন করতে গেলে প্রত্যক্ষভাবে করতে হয়। সেটা ওই জায়গায় সম্ভব নয়।

'এ ছাড়া, আর একটা সম্ভাবনা আছে যেটা আমার ধারণা সবচেয়ে প্রবল। তা হচ্ছে, বীথিকার কাজ ছিল রুগিদের মগজ ধোলাই করে বোস-দম্পতিই যে তাদের একমাত্র শুভানুধ্যায়ী এবং হোমিওপ্যাথ যে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা, এই দুটি ধারণা তাদের মনে ঢোকানো। রুগিদের কীভাবে মৃত্যু হত, সেটা হয়তো সে জানত না। আর টাকার যখন বৃষ্টি হচ্ছে, তখন কেই-বা তার খবর রাখে? এইটাই যদি ঘটনা হয়, তাহলে অরিজিৎকে খুন করতে বীথিকার অস্বীকার করাই স্বাভাবিক।

‘অতএব, বীথিকার চিহ্নও বিলোপ করার ব্যবস্থা করা হল। সেই তো এই ষড়যন্ত্রের একমাত্র সাক্ষী। সোমনাথেরও কোনো তাড়া নেই। সে জানত যতদিন সে বীথিকার সঙ্গে ভালোবাসার খেলা চালাবে ততদিন কোনো ভয় নেই। বীথিকা মুখ খুলবে না। এমনকী বীথিকা যদি তাকে কখনো তাড়িয়েও দেয়, তাহলেও হয়তো সে এ ব্যাপারে কোনো কথা বলবে না, কারণ সেক্ষেত্রে তারও ফেঁসে যাবার সম্ভাবনা। কিন্তু তাই বলে তো তাকে আর বাঁচিয়ে রাখা যায় না। স্ত্রীয়াশ্চরিত্রং— কখন যে কী করে বসে?’

সমরেশ দুঃখিতভাবে মাথা নেড়ে বলল, ‘যা বলেছ। ডাক্তার অরিজিৎ বোস নিশ্চয়ই অনেক পাগলকে সুস্থ করে তুলেছেন, কেবল নিজের ঘরের পাগলটিকে চিকিৎসা করে উঠতে পারলেন না। বীথিকার নিমফোম্যানিয়া যদি সারাতে পারতেন, তাহলে হয়তো এতগুলো বিয়োগান্তক ঘটনা ঘটত না। তবে, কে জানে, হয়তো এ রোগের কোনো চিকিৎসাই নেই।’

ভগ্ন অংশ ভাগ

শিবেন প্রশ্ন করল, 'অশোকনাথ ঘোষালের নাম জানা আছে?'

দময়ন্তী বলল, 'না।'

সমরেশ বলল, 'হ্যাঁ, জানা আছে। যদি প্রোগ্রেসিভ ফার্মাসিউটিক্যালসের চেয়ারম্যান এ এন ঘোষালের নাম হয়।'

শিবেন মাথা নাড়ল। বলল, 'হ্যাঁ, ওই নামই বটে। এঁর সম্বন্ধে তুই কী জানিস?'

'তেমন কিছু নয়। অনেকগুলো কোম্পানির ডিরেক্টর, এককালে বোধ হয় বিখ্যাত ব্রিটিশ ফার্ম স্টুয়ার্ট অ্যান্ড লোম্যাক্সের চিফ ছিলেন, রায়বাহাদুর বা রায়সাহেব ধরনের খেতাব পেয়েছিলেন। ভালো লোক, কেবল ফার্মাসিউটিক্যালসই নয়, সব ইন্ডাস্ট্রির লোকেরাই এঁকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে থাকে। বয়সের গাছপাথর নেই, অথচ শুনেছি রোজ গলফ খেলেন।'

'বাঃ, তুই তো অনেক কিছুই জানিস দেখছি! ভদ্রলোকের বাড়ি কোথায় জানিস?'

'নাঃ। চেয়ারম্যানরা কোথায় থাকেন সে সম্পর্কে আমার কিছুমাত্র ধারণা নেই।'

'হাঁসপুকুর লেনের নাম শুনেছিস? জোড়াসাঁকোয়। তার তিন নম্বর বাড়িতে।'

'অত্যন্ত সুসংবাদ। তা, আমাদের কী করতে হবে? তিনি কি ওই হাঁসপুকুর না কি বললি সেখানে আমাদের নেমন্তন্ন করেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'অ্যাঁ? হ্যাঁ? হ্যাঁ মানে কী?' সমরেশ আর দময়ন্তী সমস্বরে প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ মানে হ্যাঁ। বড়োকর্তাকে অনুরোধ করেছেন যেন আগামী কাল সন্ধ্যেবেলা আমি তোদের নিয়ে ওঁর বাড়িতে যাই। বউদির সঙ্গে ওঁর কী সব পরামর্শ আছে। মিস্টার ঘোষালের নিজেরই এখানে আসার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু শরীরের অবস্থা বিবেচনা করে সে ইচ্ছে নিতান্ত অনিচ্ছায় কার্যে পরিণত করতে পারছেন না। যদি আপনি যেতে না পারেন, তাহলে কাল সকালের মধ্যে লালবাজারে বড়োকর্তাকে জানিয়ে দেবেন সেকথা। তবে, আপনি গেলে উনি খুব খুশি হবেন।'

দময়ন্তী ভয়ানক চিন্তিত হয়ে পড়ল। বলল, 'সে তো বুঝতে পারছি। কিন্তু মিস্টার ঘোষাল আমার নাম জানলেন কোত্থেকে?'

শিবেন সহাস্যে বলল, 'আপনার যে বেশ নাম ছড়িয়ে পড়েছে, তাতে কি কোনো সন্দেহ আছে? কাজেই, কোত্থেকে সে প্রশ্ন বাহুল্য মাত্র।'

'ইয়ার্কি করবেন না তো! এত বড়ো একজন মানুষ, আমার সঙ্গে তাঁর কী সম্পর্ক থাকতে পারে? আপনি কিছু জানেন?'

'একেবারেই না। কাল তো শনিবার, সন্ধ্যেবেলা ট্রাফিক বেশ বেশিই হবে। আমি সাড়ে পাঁচটা নাগাদ আসব, তাহলে ঠিক সন্ধ্যের মুখে জোড়াসাঁকোয় পৌঁছে যাওয়া হবে। তখনই সব ব্যাপারটা বোঝা যাবে।'

সমরেশ বলল, 'এইরকম এঁদো গলিতে তোর চেয়ারম্যান ঘোষালের বাড়ি?'

শিবেন অত্যন্ত সাবধানে ওর ফিয়াট গাড়িটা গলিতে ঢোকাতে ঢোকাতে বলল, 'দ্যাখ সমরেশ, প্রথমত, এই ঘোষাল আমার চেয়ারম্যান নন। দু-নম্বর, এটা গলি ঠিক, কিন্তু এঁদো নয়। দু-পাশের বাড়িগুলো দেখেছিস? এখানকার লোকেরা লাখ টাকার নীচে চেক লেখে না, বুঝলি? এইসব বাড়িগুলোর দলিলে ওয়ারেন হেস্টিংসের সই আছে। বন কেটে বসত।'

'তা তো বুঝতেই পারছি। পলাশি যুদ্ধের আমলের যত বাড়ি। ভেতরে নিশ্চয়ই ওয়ারেন হেস্টিংসের ভূতও আছে।'

'তা থাকা অসম্ভব নয়। এই যে, তিন নম্বর এসে গেছে। বাপরে, গেটের কী বাহার!'

কেবল গেট কেন, সমস্ত বাড়িটাই দেখবার মতো। অনেকটা সবুজ জমির মধ্যে ইংরেজি রূপকথার বইয়ে আঁকা দুর্গের মতো দেখতে বাড়িটা। দেখলে যেমন বিস্মিত হতে হয়, তেমনি কেমন ভয়ও করে। মনে হয় সত্যি সত্যি যেন এর অন্ধকার ছায়া ছায়া আনাচে কানাচে এ-বাড়ির পূর্বপুরুষদের জটলা চলেছে। যেন পুরোনো কলকাতা চলে যেতে যেতে এইখানে এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। আকাশে তখনও দিনের শেষ আলো, অন্ধকার নামতে কিছু দেরি আছে। সেজন্যে বাড়িটাতে তখনও আলো জ্বলেনি, কেবল গেটের দু-পাশে থামের মাথায় কারুকার্য করা রট-আয়রনের লণ্ঠনে আলো জ্বলছে। সেই আবছায়া আলোয় বাড়িটাকে রূপকথার দুর্গের মতোই অবাস্তব বলে মনে হচ্ছে।

শিবেনের গাড়ি গেটের সামনে দাঁড়াতে বাড়িটার মতোই এক অতি প্রাচীন দারোয়ান দরজা খুলে দিল। একমাত্র গেট খোলা ছাড়া এই দারোয়ানের আর কোনো কর্তব্য যে থাকতে পারে সেরকম মনে হল না। কিন্তু গাড়ি-বারান্দার নীচে যে অতিথিদের অভ্যর্থনা করার জন্যে দাঁড়িয়ে ছিল, সে অবশ্য অতটা প্রাচীন নয়। তার পরনে সাদা পাজামা, সাদা গলাবন্ধ হাঁটু পর্যন্ত লম্বা কোট, মাথায় সাদা গান্ধীটুপি। বিনয়ে আনত হয়ে সে অতিথিদের বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেল।

সাদা গান্ধীটুপি অতিথিদের যে স্বল্পালোকিত ঘরে ঢুকিয়ে বিনীতভাবে দরজায় দাঁড়িয়ে রইল, সেটা একটা লাইব্রেরি। একপাশের দেওয়ালে তিনটে রঙিন কাচ বসানো খিলেন করা লম্বাটে জানলা আর বাকি তিন পাশের দেওয়ালে মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত উঁচু বই-ভরতি অতিকায় আলমারির সার। একটা আলমারির সামনে দিকের ওপরের তাকগুলো থেকে বই পাড়ার জন্যে তলায় চাকা লাগানো একটা ঘড়াঞ্চি রাখা আছে। মেঝেয় পুরু কার্পেট। জানলাগুলোর সামনে একটা প্রকাণ্ড সেক্রেটারিয়েট টেবিল। তার সামনে গোটাচারেক কারুকার্য করা উঁচু ব্যাকরেস্টওলা চেয়ার। টেবিলের উলটোদিকে একটা রিভলভিং চেয়ারে একজন বসেছিলেন। অতিথিদের দেখে উঠে দাঁড়ালেন।

বলিরেখাচ্ছন্ন মুখ, শীর্ণকায়, পক্ককেশ গৌরবর্ণ বৃদ্ধ, চোখে মোটা কাচের মোটা ফ্রেমের চশমা, পরিষ্কার করে কামানো মুখ, পরনে চিকনের কাজ করা আদ্দির পাঞ্জাবি। একটু সামনে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছেন, সেটা দাঁড়াবার স্বাভাবিক ভঙ্গিও হতে পারে, বয়েসের ভারেও হতে পারে। মুখে স্মিত হাসি, কিন্তু চোখের দৃষ্টি সজাগ ও তীক্ষ্ন।

শিবেন এগিয়ে গিয়ে নিজের পরিচয় দিলে, তারপর বাকি দুজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। বৃদ্ধ হাত নেড়ে নেড়ে অতিথিদের বসতে বলে নিজেও বসলেন। কিছুক্ষণ দময়ন্তীকে দৃষ্টি দিয়ে যেন যাচাই করে নিয়ে বললেন, 'তোমার এত কম বয়েস আমি বুঝতে পারিনি। তুমি করেই বললুম, কিছু মনে করো না।' ভদ্রলোকের গলা অনুচ্চ এবং গম্ভীর।

দময়ন্তী মৃদু হেসে বলল, 'মনে করব কেন? আপনি তুমি করেই বলবেন।'

বৃদ্ধও হাসলেন। বললেন, 'ভালো কথা। তা, তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ, আমি তোমার খোঁজ পেলুম কোত্থেকে। পেয়েছি আমার এক নাতনির কাছে, সে তোমার ছাত্রী। বি এ পড়ছে।'

'কী নাম?'

'সেটা বলা বারণ আছে। দেখলুম প্রোফেসর ডি ডি জি-কে সে যেমন ভক্তি করে তেমনি ভয়ও পায়। তা থাক সে কথা। আমি তোমাকে যে কারণে ডেকেছি, আগে সে কথাটা সেরে নিই। তবে তার আগে বলো কে কী খাবে। সেনসাহেব, হুইস্কি চলবে তো?'

শিবেন অম্লানবদনে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

'আপনার? হুইস্কি?'

সমরেশও বিনা বাক্যব্যয়ে সম্মতি জানাল।

'আর তোমার? শেরি?'

দময়ন্তী মাথা নাড়ল। বলল, 'না। একটু কফি হলে ভালো হত।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। পান্নালাল, দুটো হুইস্কি, একটা কফি আর আমার জন্যে একটা ছোটো কনিয়াক নিয়ে এসো।'

দরজার কাছে চিত্রার্পিতবৎ গান্ধীটুপি হঠাৎ মাথাটা একবার সামনে ঝুঁকিয়ে দিয়ে বাড়ির ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অশোকনাথ ঘোষাল বললেন, 'আমরা তাহলে শুরু করতে পারি?'

দময়ন্তী এইবার মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

'যে সমস্যাটা নিয়ে আমি তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই, সেটা ঠিক আমার সমস্যা নয়, আমার ছেলের।'

দময়ন্তী প্রশ্ন করল, 'আপনার ছেলে কোথায়?'

'সে এ বাড়িতে থাকে না। যোধপুর পার্কে তার বাড়ি।'

'আপনার কি একই ছেলে?'

'হ্যাঁ। এক ছেলে, এক মেয়ে। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। সে থাকে মাদ্রাজে। আমার জামাই সেখানে ডাক্তারি করে।'

'আপনার স্ত্রী?'

'তিনি বহুদিন গত হয়েছেন। রাকার বয়েস তখন বছর বারো। আমার মেয়ের নাম রাকা।'

'তাঁর এখন বয়েস কত?'

অশোকনাথ মনে মনে হিসাব করে বললেন, 'ছাপ্পান্ন। আশ্চর্য নয়? সময় বহিয়া যায়, নদীর স্রোতের প্রায়।' বলতে বলতে একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। তারপর হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেয়ে বললেন, 'কিন্তু সমস্যাটা তো আমার মেয়ের নয়, আমার ছেলে— অলোকনাথের।'

'সমস্যাটা?'

'বলছি। হোয়াইট স্টার ইন্ডাস্ট্রিস লিমিটেডের নাম শুনেছ কি না জানি না। আমার ছেলে এই কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর। ক্যামাক স্ট্রিটে এদের হেড অফিস। দুটো ফ্যাক্টরি আছে, একটা জোকায়, অন্যটা বালিটিকুরিতে। এরা হোয়াইট স্টার ব্র্যান্ড নেম-এ নানারকম ইকুইপমেন্ট বানায়। এইখানে একটা গণ্ডগোল বেঁধেছে। তাই নিয়েই তোমার সঙ্গে পরামর্শ।'

'কী ধরনের গণ্ডগোল?'

'বলছি। তবে তার আগে একটা অনুরোধ করতে চাই— আপনাদের সকলের কাছে। তা হল, এখানে যা কথাবার্তা হবে তা নিয়ে যেন বেশি জলঘোলা না হয়। আমি চাই তদন্তটা যথাসম্ভব গোপনে লোক জানাজানি না করে যেন করা হয়।'

শিবেন বলল, 'তাই হবে। যথাসম্ভব গোপনেই করা হবে।'

'বেশ। এবার তাহলে গণ্ডগোলটা কী সেটা বলি। হোয়াইট স্টার ইন্ডাস্ট্রিস লিমিটেড, আদতে ছিল সাহেবি কোম্পানি। উনিশ-শো সাতচল্লিশের পরেও অনেক দিন পর্যন্ত বিলেত থেকেই এটা চালানো হত। আটান্ন থেকে বিলেতের প্রভাব কমতে থাকে এবং ম্যানেজমেন্টে ভারতীয়রা আসতে শুরু করে। সত্তর সালে এটা পুরোপুরি ভারতীয় কোম্পানি হয়ে যায়।'

সমরেশ জিজ্ঞেস করল, 'এখন ওর মালিক কে?'

'মালিক ঠিক কেউ নেই, এটা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি। তবে কোনো একজন ইন্ডাসট্রিয়ালিস্ট সম্প্রতি গোপনে এটা কিনে নেবার চেষ্টা করছিলেন।'

‘কে?’

‘সেটা সঠিক জানি না। তবে গুজব শুনেছি মহাকোশল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের যোগেশ্বর রাই নাকি এর পেছনে ছিল।’

‘আচ্ছা, এ ব্যাপারে আমরা পরে কথা বলব।’ বলল দময়ন্তী, ‘এখন বলুন গণ্ডগোলটা কী হচ্ছে?’

‘হ্যাঁ। গণ্ডগোলটা হচ্ছে সাবোটাজ। জোকা ফ্যাক্টরিতে দু-বার আগুন লাগে। তখন ভাবা হয়েছিল সে ব্যাপারটা অ্যাক্সিডেন্ট। কিন্তু বালিটিকুরিতে যা ঘটেছে, তারপর আর তা ভাবা যাচ্ছে না। তবে সে ঘটনার কথা বলবার আগে হোয়াইট স্টারের ইতিহাস একটু বলা দরকার।

‘সত্তর সালে সাহেবরা যখন চলে যায়, তখন এদের একমাত্র বালিটিকুরিতেই ফ্যাক্টরি ছিল। সেইসময় হোয়াইট স্টার খুব দুরবস্থায় পড়েছিল। বাজার মন্দা, লেবার ট্রাবল, অন্যান্য গোলমাল, সব মিলে কোম্পানির যায়-যায় অবস্থা। সেইসময় আমার ছেলে, সীতারামন আর প্রশান্ত ঘটক, এই তিনজনে শক্ত হাতে হাল ধরে। আমার ছেলে ছিল প্রোডাকশনে, সীতারামন ফাইনান্সে আর প্রশান্ত সেলসে। এদের তিনজনের মিলিত চেষ্টায় হোয়াইট স্টার আবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। এমনকী ছিয়াত্তর থেকে রীতিমতো প্রত্যেক বছর শেয়ারহোল্ডারদের ডিভিডেন্ড দিতে শুরু করে। জোকায় নতুন ফ্যাক্টরি খোলে।

‘এর পরের ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত। গত দেড় বছর থেকে হোয়াইট স্টারের অবস্থা হঠাৎ আবার খারাপ হতে থাকে। এর দুটো কারণ আছে। প্রথম, এক্সপোর্ট বাজারে মার খাওয়া। দ্বিতীয়, দেশে এদের ইকুইপমেন্টের চাহিদা কমে যাওয়া।’

‘চাহিদা কমে গেল কেন?’ দময়ন্তী জিজ্ঞেস করল।

‘কমে গেল তার কারণ সরকারি নীতির পরিবর্তন। এরা যে ধরনের যন্ত্রপাতি তৈরি করে, তার চেয়ে উন্নত ধরনের মাল বিদেশ থেকে আমদানি করার ঢালাও অনুমতি দেওয়ার ফলে এ ব্যাপারটা ঘটল। হোয়াইট স্টার তখন এই অবস্থার সঙ্গে মোকাবিলা করবার জন্যে তাদের সমস্ত প্রোডাক্ট নতুন করে ঢেলে সাজাবার এবং উৎপাদন বাড়াবার ব্যবস্থা করল। এতে স্বভাবতই লেবার ইউনিয়নের সঙ্গে মন কষাকষি শুরু হল। ফলে অশান্তি বাড়ল। তার ওপর এইসব নতুন ব্যবস্থার ফলে টাকার টানাটানিও শুরু হল। অবস্থা যখন রীতিমতো সঙ্গীন, হোয়াইট স্টার সিক ইন্ডাস্ট্রি হয়ে যাবে কি না এই যখন শেয়ার বাজারে জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ হয়েছে, তখন কোম্পানি মাস তিনেক আগে হঠাৎ দুটো প্রকাণ্ড অর্ডার পেল। একটা এক্সপোর্ট, একটা ডোমেস্টিক। এইবার, যখন সমস্ত ছবিটা পাল্টাবে এটাই সবাই ধরে নিয়েছে, ঠিক তখনই পর পর তিনটে দুর্ঘটনায় সবকিছু তছনছ হয়ে গেল।’

‘দুর্ঘটনা? অন্তর্ঘাত বা সাবোটাজ নয়?’

‘সাবোটাজ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। জোকা ফ্যাক্টরির আগুন যদিও-বা দুর্ঘটনা বলে ধরে নেওয়া যায়, বালিটিকুরির ব্যাপারটা সেরকম কখনোই হতে পারে না। বালিটিকুরির ফাউন্ড্রি শপে যে বিস্ফোরণটা হয়, সেটা টাইম বোমার। পুলিশ এ ব্যাপারে নিশ্চিত। আর, ওই ঘটনার পর থেকে দুজন ওয়ার্কার নিরুদ্দেশ। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এরা দুজনেই ছিল মদ্যপ, দুশ্চরিত্র এবং জুয়াড়ি। সব সময়েই এদের টাকার টানাটানি চলত।’

‘অর্থাৎ, কেউ চাইছে যেন হোয়াইট স্টার উঠে দাঁড়াতে না পারে।’

‘হ্যাঁ, ব্যাপারটা তাই বটে।’

‘লেবার ইউনিয়ন কী বলছে?’

‘তারা বলছে, এটা ম্যানেজমেন্টের ষড়যন্ত্র। ফ্যাক্টরির লক-আউট ঘোষণা করার বাহানা। যে দুজন ওয়ার্কার অদৃশ্য হয়েছে, তারা নাকি নিতান্ত নিরীহ ভালো লোক ছিল। কোম্পানি গুন্ডা লাগিয়ে তাদের খুন করেছে। এই নিয়ে অশান্তি চরমে উঠেছে। বালিটিকুরির ফ্যাক্টরি কার্যত বন্ধ। জোকায় লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার মার খেয়ে হাসপাতালে ভরতি হয়েছে।

‘আমরা যদি ধরে না নিই যে লেবার ইউনিয়ন যা বলে তা সবই মিথ্যে, তাহলে আপনার কি মনে হয় তাদের এই ধারণার পেছনে একেবারে কোনো সত্য নেই?’

অশোকনাথ মোটা কাচের চশমার ভেতর দিয়ে স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ দময়ন্তীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর থেমে থেমে বললেন, ‘লেবার ইউনিয়ন যা বলে তার সবই মিথ্যে, এ ধরনের কেনা প্রত্যয় আমার নেই। তবে, তাদের যে ধারণার কথা আমি তোমাদের বললুম, সেটাও যে একেবারেই ঠিক নয় সে বিষয়েও আমার কোনো সন্দেহ নেই।’

‘কেন?’

‘আমার ছেলে এই কোম্পানির ম্যানেজমেন্টের শীর্ষে আছে। কাজেই, ম্যানেজমেন্ট ষড়যন্ত্র করছে কি করছে না, সেটা আমার চেয়ে বেশি আর কে জানবে? আমার ধারণা, এই ঘটনাগুলোর পেছনে আছে ব্যক্তিগত ঈর্ষা এবং পরশ্রীকাতরতা। আমার ছেলের নেতৃত্বে এই কোম্পানি বড়ো হোক, এটা কোনো একজন লোকের কাম্য নয়। এতদিন সে সুযোগ খুঁজছিল, গত বছরের দুরবস্থা তাকে সেই সুযোগ এনে দিয়েছে। আর এই ব্যাপারটাই তোমাকে দেখতে হবে। নিজের অহংকার আর ঈর্ষার জন্যে যে কয়েক হাজার লোককে অনাহারের মুখে ঠেলে দিতে পারে, তার মুখোশ খুলে দিতে হবে।’

‘এই কাজ পুলিশ করতে পারে না?’

অশোকনাথ তির্যক দৃষ্টিতে শিবেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘না। তাহলে আমার বংশের কিছু গোপন কথা, কিছু লজ্জার কথা, সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হয়ে পড়বে। সেটা আমার পক্ষে সহ্য করা কঠিন হবে।’

‘কিন্তু কয়েক হাজার লোকের অনাহার কি আপনার বংশগৌরবের চেয়ে বড়ো নয়?’

অশোকনাথ আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, ‘বড়ো ঠিকই। তবুও, যতদিন এবং যতদূর সম্ভব, এসব কথা গোপন রাখা আমার কর্তব্য বলে আমি মনে করি। যদি দেখা যায়, গোপন করা আর কোনোমতেই সম্ভব নয়, তখন পুলিশের কাছে যেতে হলে যাব। শিবেনবাবু সেকথা জানেন। আমি তাঁর কাছে উপদেশ চেয়েছিলুম এবং তোমার নাম বলেছিলুম। তখন তিনি এই আলোচনার প্রস্তাব দেন। এমনকী এই আলোচনায় তিনি উপস্থিত থাকবেন না, একথাও বলেন। তবে, আমি জানি আমি ওঁকে বিশ্বাস করতে পারি। ওঁর অনুরোধ ছিল যে আমি যেন ওঁর ওপরওলার অনুমতি নিয়ে নিই। তাতে কোনো অসুবিধে হয়নি। ওঁর ওপরওলা আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন।’

এই কথার মধ্যে পান্নালাল ঘরে ঢুকল, তার সঙ্গে আর একটি গান্ধীটুপি। দুজনে একটা চাকা লাগানো রট-আয়রনের টেবিল ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এল। টেবিলের ওপর পানীয় এবং তিনটে প্লেটে নানারকম খাবার সাজানো।

দময়ন্তী জিজ্ঞেস করল, ‘একী, আপনার জন্যে কিছু নেই?’

বৃদ্ধ মৃদু হেসে বললেন, 'না। বাঁধা সময়ের বাইরে আমার কিছু খাওয়া বারণ। আমার বয়েস কত জানো? চুরাশি। এই বয়েসে খাওয়াটা সামলে রাখাই উচিত, তাই না?'

সমরেশ জিজ্ঞেস করল, 'আপনি নাকি এখনও রোজ গলফ খেলেন?'

ঘন ঘন মাথা নেড়ে অশোকনাথ বললেন, 'না, না। কে বললে তোমাদের সে কথা? এককালে খেলতুম ঠিকই, বছর দশেক হল ছেড়ে দিয়েছি। তবে ক্লাবে রোজ যাই। এতদিনের অভ্যেস!'

দময়ন্তী কফির কাপ নামিয়ে রেখে বলল, 'আপনার সন্দেহের কথা শোনবার আগে, আমার একটা সন্দেহের কথা জিজ্ঞেস করি?'

'যোগেশ্বর রাইয়ের কথা তো?' অশোকনাথ বললেন।

'হ্যাঁ। আমি অবশ্য ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপার ভালো বুঝতে পারি না। কিন্তু এটুকু বুঝতে পারছি যে হোয়াইট স্টারের যত দুরবস্থা হবে, ততই এটা কারুর পক্ষে কিনে নেওয়া সহজতর হবে।'

'ঠিকই বুঝেছ। কিন্তু যোগেশ্বর রাই যদি এইসব অন্তর্ঘাতগুলোর পেছনে থাকত, তাহলে সে এমন কোনো কাজ করত না যাতে কোম্পানির একটা পুরো প্রোডাকশন ইউনিটই ধ্বংস হয়ে যায়। সে কিনলে চালু ফ্যাক্টরি কিনবে, একটা ধ্বংসস্তূপ নয়। তা ছাড়া, হোয়াইট স্টারের আজ এমন অবস্থা যে তাকে আবার পুরোপুরি চালু করতে যত টাকার দরকার, যোগেশ্বরের অত টাকা নেই। বা থাকলেও সে ঘর থেকে অত টাকা বের করবে না। আমার কাছে খবর এসেছে যে সে এখন অন্য একটা কোম্পানির দিকে ঝুঁকেছে। হোয়াইট স্টার নেবার আর কোনো বাসনা তার নেই।'

'বেশ। এবার তাহলে আপনার সন্দেহের কথা বলুন।'

বৃদ্ধ তাঁর চশমাটা খুলে অনেকক্ষণ সেটার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর ফট করে টেবিলের ওপর রাখা একটা ল্যাম্প জ্বেলে দিলেন। ল্যাম্পের শেডটা এমন যে তার আলো পড়ে অতিথিদের মুখে, টেবিলের অপর প্রান্তে যিনি তাঁর মুখটা তখন আর ভালো করে দেখা যায় না। তারও কিছুক্ষণ পরে অশোকনাথ থেমে থেমে বলতে শুরু করলেন, 'কথাটা কীভাবে বলব বুঝতে পারছি না। আমার স্ত্রী যদি বেঁচে থাকতেন, তাহলে হয়তো এসব ঘটনা আজ আর ঘটত না। আসলে, তাঁর অবর্তমানে আমি আমার ছেলেকে ঠিকমতো মানুষ করতে পারিনি।'

সমরেশ ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল। দময়ন্তী টেবিলের নীচে হাত নেড়ে ওকে বাধা দিল।

'আমার স্ত্রী যখন মারা যান, অলোকের বয়স তখন চোদ্দো বছর। সে দার্জিলিংয়ে হোস্টেলে থেকে পড়াশুনো করত। আমি তাকে কলকাতায় নিয়ে আসি। সেটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড়ো ভুল। কিন্তু, ঠিক সেই সময় আমার যে মানসিক অবস্থা তাতে আমি চাইছিলুম যেন সবাই আমার কাছে থাকে, আমায় ঘিরে থাকে। তা ছাড়া, রাকা বড়ো নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিল। তারও একজন সঙ্গীর প্রয়োজন ছিল।

'আমি অবশ্য অলোককে কখনোই অতিরিক্ত স্নেহ দেখাইনি। তবু বলব, তার কতগুলো আচরণ আমি স্নেহ বশতই মেনে নিয়েছিলুম। কলেজে পড়ার সময়ে সে রাজনীতির মধ্যে বেশ ভালোভাবে জড়িয়ে পড়েছিল। আমি ভেবেছিলুম ওটা অল্প বয়সের উত্তেজনা, বয়েস

হলে কেটে যাবে। কিন্তু তা হল না। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করবার পর তাকে স্টুয়ার্ট অ্যান্ড লোম্যাক্সে ঢুকতে বললাম— সে আমার কথা শুনল না। বললুম, ঠিক আছে, আমার সঙ্গে এক জায়গায় চাকরি করতে না চাও তো সে ভালো কথা। মার্শাল অ্যান্ড ম্যাকেঞ্জির জেনারেল ম্যানেজার অ্যালান হোল্ডিং আমার বিশিষ্ট বন্ধু। তাকে লিখে দিচ্ছি, তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করো। তাও করল না। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করে ইন্টারভিউ দিয়ে চাকরি নিল হোয়াইট স্টারে। আনফরচুনেটলি, আমি তখন হোয়াইট স্টারে কাউকেই চিনি না। ফলে, ওকে একেবারে অ্যাপ্রেনটিসশিপ থেকে শুরু করতে হল।'

সমরেশ এবারে আর দময়ন্তীর বাধা মানল না। বলল, 'কিন্তু সেটাই তো ভালো, এরকমই তো হওয়া উচিত, তাই না?'

'হ্যাঁ, সেটা যে ঠিক নয় তা বলব না। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে সে সময়টা জীবনের একটা অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষার শুরু। সেই পরীক্ষার নাম কেরিয়ার। আমি জানি, অনেক তথাকথিত ভদ্রসন্তানের কাছে কেরিয়ার হচ্ছে একটি ফোর লেটার্ড ওয়ার্ড। কিন্তু আমার কাছে তা নয়। আমি মনে করি, মানুষের জীবনে কেরিয়ারই সব। তাকে একেবারে শুরুতে যদি একটা উপযুক্ত ধাক্কা দেওয়া না যায়, তাহলে সব খুইয়ে পেছিয়ে পড়ার সম্ভাবনাটাই প্রবল হয়।'

'আপনার ছেলে কিন্তু পিছিয়ে পড়েনি!'

'সেটা তার সৌভাগ্য। আমি বলব, অত্যন্ত সৌভাগ্য। আমি শুনেছি, হোয়াইট স্টারে কাজ শুরু করে সে ইউনিয়নবাজি শুরু করেছিল, লেবার লিডার হয়ে বসেছিল। এই কাজ যদি সে মার্শাল অ্যান্ড ম্যাকেঞ্জি বা আমার কোম্পানিতে করত, তাহলে ম্যানেজমেন্ট তাকে পত্রপাঠ বিল্বপত্র শুঁকিয়ে দিত। তাকে রাস্তায় দাঁড়াতে হত। কিন্তু তার অত্যন্ত সৌভাগ্য যে হোয়াইট স্টারের তখনকার ম্যানেজিং ডিরেক্টর টোনি ওয়াকার এইসব কার্যকলাপ সত্ত্বেও তাকে পছন্দ করতেন। টোনি অবশ্য পরে আমাকে বলেছিল যে তার কর্তব্যবোধ, কাজ শেখার ইচ্ছে এবং আগ্রহ দেখে সে মুগ্ধ না হয়ে পারেনি। ফলে, বেশ তাড়াতাড়িই সে ম্যানেজমেন্ট কেডারে উঠে আসে। এবং, তার ফলে একটা সুবিধে হয় এই যে, ইউনিয়নের সঙ্গে ভবিষ্যতে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ওর বিশেষ গোলমাল কখনো বাঁধেনি। একটা সদ্ভাব, একটা পারস্পরিক সম্প্রীতি এবং বিশ্বাস বজায় ছিল। কাজেই, আজ থেকে বছর আষ্টেক আগে সে সময়ের ম্যানেজিং ডিরেক্টর যমুনাদাস মিত্তাল যখন কোম্পানির চেয়ারম্যান হল, তখন প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে সে ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়ে গেল।'

দময়ন্তী জিজ্ঞেস করল, 'উনি তখন কোন পোস্টে ছিলেন?'

'প্রোডাকশন ডিরেক্টর।'

'আমি কিন্তু এখনও পর্যন্ত গোপন রাখা উচিত এরকম কোনো লজ্জাজনক ঘটনার সন্ধান পেলুম না আপনার ছেলের কথায়।'

'আমি এইবার সেই কথাটাই বলব। বুড়ো হয়েছি, সংক্ষেপে কোনো কথা বলার আর্টটা ভুলে গেছি। আমার নাতি-নাতনিরা হাসে, ইচ্ছে করলে তোমরাও হাসতে পারো।

'সে যাই হোক, আমার ছেলে যখন একদিকে চাকরি জীবনে উন্নতি করছে, অন্যদিকে সে একটা বিশ্রি ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে। সে আর তার একজন সহকর্মী একসঙ্গে একই মেয়ের প্রেমে পড়ে। কী দেখে যে দুজনেই মজেছিল, তা আমি আজও জানি না। মেয়েটি রীতিমতো কুৎসিত, প্রায় নিরক্ষর, বস্তিতে বড়ো হয়ে ওঠা একটা কদর্য ব্যাপার। অথচ এই নিয়েই দুজনের প্রতিযোগিতা, মন কষাকষি, আরও কত কী! শেষপর্যন্ত, দুর্ভাগ্য

আমার যে, অলোকেরই জিত হল। সে তাকে বিয়ে করল। আমি অবশ্য তাদের এ বাড়িতে ঢুকতে দিইনি। তারা তখন কোথায় এক বস্তিতে গিয়ে ঘর ভাড়া নিয়েছিল।

'কিন্তু, তার বন্ধুটি এই হেরে যাওয়াটা স্পোর্টিং স্পিরিটে কখনোই নিতে পারেনি। পদে পদে অলোকের উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। এতদিনে তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার সময় এসেছে। ক্ষতি যা করবার, তা তো সে করেছেই। কিন্তু, তাকে তো এতবড়ো একটা অপরাধের পর এমনি এমনি ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে না। শাস্তি তাকে পেতেই হবে। আর সেটা কীভাবে করা যায়, তার ব্যবস্থা তোমাকে করতে হবে।'

দময়ন্তী হাসল। বলল, 'বেশ, চেষ্টা করে দেখা যাবে। তবে তার আগে কয়েকটা প্রশ্নের জবাব পেলে ভালো হত।'

'কী প্রশ্ন, বলো? জবাব জানা থাকলে, পাবে।'

'আপনার ছেলেকে কি আপনি ত্যজ্যপুত্র করেছেন?'

'না। তবে আমি তার মুখ দেখি না, সেও আমার মুখ দেখে না।'

'আপনি কি আপনার পুত্রবধূকে কখনো দেখেছেন?'

'দেখেছি কয়েকটা পার্টিতে। দূর থেকে।'

'আপনার ছেলের যখন বিয়ে হয়, তখন তার বয়স কত ছিল?'

'আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে। মানে তখন তার বয়েস তেত্রিশ।'

'এর আগে কি তার অন্য কোনো মেয়ের প্রতি কোনো টান ছিল?'

'আমার জানা নেই।'

'আপনি বোধ হয় তার বন্ধুর নাম বলতেও ইচ্ছুক নন?'

'না, ইচ্ছুক নই। তাকে খুঁজে বের করার দায়িত্ব তোমার।'

'আপনার ছেলের সন্তানাদি কী? তাদের সম্পর্কে কিছু বলবেন?'

'আমার ছেলের সন্তান দুটি। একটি ছেলে, একটি মেয়ে। ছেলের বয়স বাইশ বছর। গত বছর বি কম পাশ করে হোয়াইট স্টারে ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি হয়ে ঢুকেছে। অত্যন্ত ইনটেলিজেন্ট ছেলে, যেমন চেহারা তেমনি চালচলন। জীবনে সে উন্নতি করবে, অবশ্য যদি সে তার বাপের বাধা কাটিয়ে উঠতে পারে।'

'তার নাম কী?'

'তার নাম অতীন্দ্রনাথ ঘোষাল। আমি ডাকি তিনু বলে। কখনো কখনো তিনকড়িও বলি!' বলে বৃদ্ধ একটা সস্নেহ হাসি হাসলেন।

'এবার আপনার নাতনির কথা বলুন।'

'হ্যাঁ, সে এ বছর বি এ দেবে। তোমারই ছাত্রী। নাম বলা বারণ। এক নম্বরের বিচ্ছু। সক্কলের পেছনে লাগতে ওস্তাদ। লেখাপড়ার নাম নেই, কেবল গান আর গান।'

এবার দময়ন্তীর সস্নেহ হাসির পালা। বলল, 'বুঝেছি। অনু, অনিন্দিতা।'

'কে জানে? বলেছি তো, আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ— নাম বলা বারণ।'

‘আপনি বললেন যে অতীন্দ্রনাথের জীবনের উন্নতির পথে বাধা হচ্ছেন তাঁর বাবা। এ কথাটার মানে কী?’

‘মানে? কীভাবে বোঝাব জানি না। তিনু যে হোয়াইট স্টারে ঢুকেছে, তাতে তার ওপরে তার বাপের একেবারে জাতক্রোধ। বাপের ফার্মে ছেলে কাজ করছে, তাতে যেন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে। অথচ, বাপের জোরে তিনু কিন্তু ওখানে ঢোকেনি। যাতে কোনোরকম পক্ষপাতিত্ব না দেখানো হয় সেজন্যে হোয়াইট স্টার ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি সিলেকশনের ভার দিয়েছিল একজন বিজনেস কন্সালট্যান্টকে। তিনি কোম্পানির নাম না দিয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। তিনু তাই দেখে কাগজে অ্যাপ্লাই করেছিল, ইন্টারভিউ দিয়ে সিলেকটেড হয়েছিল। এতে যে কী অন্যায়টা হয়েছিল তা আমার জানা নেই। আমার পুত্র সেই থেকে ক্রমাগত তিনুকে চাকরি ছাড়ার হুমকি দিয়ে যাচ্ছে। তার বক্তব্য, তিনু যদি জীবনে উন্নতি করে, তাহলে সবাই বলবে যে সে তার বাপের জোরে করেছে, নিজের ক্ষমতায় নয়। সেটা নাকি ভয়ানক লজ্জার কথা। অদ্ভুত! বাপের জোরে ছেলে উন্নতি করবে, সেটা লজ্জার কথা? অথচ, আমার ছেলে জানে না যে...’ বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলেন অশোকনাথ।

‘যে তার উন্নতির পেছনে আপনার অনেক অবদান আছে। তাই না?’

‘হ্যাঁ দময়ন্তী, তাই। তবে আমার অনুরোধ, একথা তাকে কখনো বলো না। ভীষণ ক্ষেপে যাবে। ভয়ানক জেদি আর একরোখা ছেলে। তবে, আমার খারাপ লাগছে কি জানো? তুই তোর ছেলেকে ব্যাক করলিনে, না করলি, কিন্তু তাই বলে চান্স পেলেই তারই একজন সহকর্মীর সঙ্গে তুলনা করে তাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে তার মনটা ভেঙে দিবি, এটা কী? বিশেষত, সেই সহকর্মীটি যেখানে তারই মামাতো ভাই, একসঙ্গে বড়ো হয়েছে দুজনে। হতে পারে এই মামাতো ভাই তিনুর চেয়ে লেখাপড়ায় ভালো, কিন্তু সেটাই কি সব? জীবনে খেলাধুলোর কোনো দাম নেই। তিনু যে ইউনিভার্সিটি ব্লু, সেটা কোনো বড়ো কথা নয়?’

বুড়ো ঠাকুরদার এই ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারল না দময়ন্তী। একটু চুপ করে থেকে প্রশ্ন করল, ‘আচ্ছা, গত পঁচিশ বছর তো আপনি আপনার ছেলের বউয়ের মুখ দেখেননি, অথচ তার ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে...’

দময়ন্তী কথাটা শেষ করতে পারল না। অশোকনাথ ফোঁস করে উঠলেন, ‘তার ছেলে-মেয়ে মানে? ওরা আমার ছেলের ছেলে-মেয়ে। ওরা তো আমার কাছে আসবেই। এটাই তো ওদের বাড়ি।’

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা তো বটেই! আচ্ছা, এবার শেষ প্রশ্ন। আপনার নাতি তার বাবার ইচ্ছের বিরুদ্ধে হোয়াইট স্টারে চাকরি করছে কেন?’

‘কেন করবে না? সে তার বাপের ইচ্ছেয় ঢোকেনি যে তার ইচ্ছেয় ছাড়বে। আমিই বারণ করেছি। ছেলেটাকে আমেরিকায় পাঠাল না, বলল বিদেশে গেলে নাকি দেশের ঘুঘু রাজহংস হয় না। নিজেও অবশ্য যায়নি, একই যুক্তিতে। ঠিক আছে, তাই বলে ছেলেটাকে একটা ভালো চাকরিও করতে দেবে না? এত শত্রুতা!’

সমরেশ সোফার ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, ‘চমৎকার কেস! খাসা কেস! বালিটিকুরি না গুষ্টির পিণ্ডি কোথায় বোমা ফাটল, এখন প্রমাণ করতে হবে যে এক ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পঁচিশ বছর আগেকার রাইভাল সেটি ছুড়েছেন। এই পঁচিশ

বছর তিনি বোমাটি বগলদাবা করে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, সুযোগ পেলেন অ্যাদ্দিন বাদে। যত্ত সব! বুড়োর ভীমরতি ধরেছে না তোর ধরেছে?'

শিবেন বলল, 'তুই থামবি? যা বুঝিস না তাই নিয়ে বকবক করবি না। রাইভাল টাইভাল কোনো কথা নয়। বোমাটা কে ফাটিয়েছে এবং কেন, সেটা বের করাই আসল কথা। আরে, এটাই তো প্রথম এরকম ব্যাপার নয়। কাগজ পড়িস না? এই ধরনের সাবোটাজ আজকাল মাঝে মাঝেই হচ্ছে, সে খবর রাখিস?'

'এই টাইম বোমা?'

'হ্যাঁ। নইলে আমরা চট করে ধরলুম কী করে যে ব্যাপারটা কী? এই পদ্ধতির সঙ্গে আমরা পরিচিত।'

দময়ন্তী জিজ্ঞেস করল, 'এরকম প্রায়ই হচ্ছে নাকি?'

'প্রায়ই মানে ওই যে বললুম মাঝে মাঝেই হচ্ছে।'

সমরেশ বলল, 'তার মানে ওই রাইভাল ব্যাটা রীতিমতো হাত মক্সো করেছিল, অ্যাঁ?'

শিবেন চোখ পাকিয়ে বলল, 'ফের? তুই যা না, রাস্তায় একটু পায়চারি টায়চারি করে আয় না!'

দময়ন্তী বলল, 'এই ঘটনাগুলো সম্পর্কে একটু বলবেন?'

শিবেন বলল, 'তাহলে আর এক রাউন্ড চা।'

শিবেন বলল, 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাবোটাজ বা শিল্পে অন্তর্ঘাত একটা নতুন ব্যাপার নয়। ইন্ডাস্ট্রির গোড়া থেকেই আছে। কথাটা এসেছে সাবোট থেকে যার মানে কাঠের জুতো। সে যুগে ইউরোপের শ্রমিকরা ওইরকম জুতো পরত আর মালিককে শিক্ষা দিতে চাইলে একটা জুতো পা থেকে খুলে মেশিনের মধ্যে ফেলে দিত। অমনি মেশিনের দাঁতটাত ভেঙে কলের চাকা বনধ। অর্থাৎ, এ ব্যাপারটা অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। কিন্তু এর মধ্যে যদি একটা প্যাটার্ন থাকে, একই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে থাকে, তাহলে সন্দেহ হয় যে এরকম ঘটনাগুলোর পেছনে মালিক-শ্রমিকের বিরোধ নয়, কোনো ক্রিমিনাল ষড়যন্ত্র কাজ করছে। বালিটিকুরিতে যা ঘটেছে, সেটা এই ধরনেরই ব্যাপার। গত এক বছরে এটা চতুর্থ ঘটনা।

'আগেই বলেছি, পদ্ধতিটা এক। কারখানার মধ্যে প্রোডাকশন লাইনে বিস্ফোরণ, প্রত্যেকটাই টিফিনের সময়, প্রত্যেকবারই একই ধরনের বোমা। বোমাটা বানানো সহজ, সস্তায় হয়ে যায়, খুব একটা ভয়ঙ্কর রকমের শক্তিশালী নয়, কিন্তু বেশ কিছুদিনের জন্যে কারখানা বন্ধ করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।'

'কেউ মারা গেছে?' দময়ন্তী প্রশ্ন করল।

'না। তবে দু-একজন আহত হয়েছে।'

'এই ঘটনাগুলোর মধ্যে কোনো যোগসূত্র আছে?'

'আছে অবশ্যই। সেটাই এবার আমরা খুঁজে দেখছি। এতদিন এগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা এই হিসেবে তদন্ত চলছিল। তবে প্রথম দর্শনে কোনো যোগসূত্র কিন্তু খুঁজে পাওয়া যায় না। যে চার জায়গায় এগুলো ঘটেছে, সেগুলো হচ্ছে ডায়মন্ডহারবারের কাছে ডায়মন্ড গ্লাস

ওয়ার্কস লিমিটেড, রানিগঞ্জে সুপ্রিম সেরামিক্স লিমিটেড, আসানসোলে গ্লোব ইনসুলেটারস লিমিটেড আর এই হাওড়ার হোয়াইট স্টার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। এদের মধ্যে একমাত্র মিল হচ্ছে এরা লিমিটেড কোম্পানি আর এককালে বিদেশি মালিকানা ছিল। এ ছাড়া আর কোথাও কোনো মিল নেই।'

সমরেশ বলল, 'আমারও তাই মনে হয়। আমি এদের সম্পর্কে জানি। হোয়াইট স্টার ছাড়া বাকি তিনটেই আমাদের কোম্পানির ক্লায়েন্ট। তবে, এদের সাবোটাজ করে কার যে কী লাভ হতে পারে তা তো বুঝতে পারছি না। যদ্দুর শুনেছি, এদের প্রত্যেকেরই অবস্থা বেশ খারাপ। ঠিক সময়ে পয়সাকড়ি দিতে পারে না, লোকজন ছাঁটাই করছে, বাজারে এদের শেয়ারের দাম পড়ে যাচ্ছে হু হু করে। এমনিতেই এই অবস্থা, তার ওপরে সাবোটাজ করা মানে কোম্পানি তুলে দেবার ধান্দা। কিন্তু কেন? ধরো, ডায়মন্ডের ম্যানেজমেন্ট এখন গুজরাতিদের হাতে, সুপ্রিম সেরামিক্স সুজত নন্দীদের, গ্লোবের অবশ্য মেজর শেয়ারহোল্ডার কেউ নেই, তবু মোটামুটি ওমপ্রকাশ সালধানাই চালাচ্ছে। তা, এখানেও তো কোনো মিল খুঁজে পাচ্ছি না।'

দময়ন্তী বলল, 'এমন তো হতে পারে যে কেউ এদের অবস্থা একেবারে খারাপ করে দিয়ে সস্তায় কিনে নেবার চেষ্টা করছে?'

'তা হতে পারে। তবে, চারটে কোম্পানিকে একসঙ্গে আক্রমণ করার কী দরকার? একটা একটা করে করলেই সেটা স্বাভাবিক হত, তাই না?'

শিবেন বলল, 'দেখুন, সমরেশের কথাটা কিন্তু একেবারে উড়িয়ে দেবার মতো নাও হতে পারে। সত্যি সত্যি হয়তো প্রথম তিনটে হাত-মক্সোর ব্যাপার। আসল লক্ষ্য হোয়াইট স্টার।'

দময়ন্তী জিজ্ঞেস করল, 'হোয়াইট স্টারই কেন?'

'অশোকনাথের কথা শুনে একটা ব্যাপারে সন্দেহ থাকে না যে তাঁর ছেলেটি একটি একগুঁয়ে উগ্র স্বভাবের লোক। নারীঘটিত কোনো ব্যাপার থাক বা না থাক, তার উন্নতিতে বাধা দেবার লোকের বোধ হয় অভাব নেই। আর, হোয়াইট স্টার উঠে যাওয়া মানে অলোকনাথেরও বারোটা বাজানো।'

'কিন্তু গত বছরেই অলোকনাথের বিরোধী পক্ষের জিঘাংসা বেড়ে উঠল কেন? এর আগে তো এরকম কোনো ব্যাপার ঘটেনি। অথচ, হোয়াইট স্টার বহুবার পতন-উত্থানের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে।'

'সেটাই খোঁজ নেওয়া দরকার। গত এক বছরে কী ঘটে থাকতে পারে? অলোকনাথ কাকে ঘাঁটিয়ে থাকতে পারেন? কোনো পুরোনো শত্রু নতুন করে মাথা চাড়া দিল, না সত্যি সত্যি কোনো নারীঘটিত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লেন?'

সমরেশ বলল, 'গত এক বছরে একটা ঘটনা ঘটেছে সেটা তো চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। অতীন্দ্রনাথ হোয়াইট স্টারে ঢুকেছে।'

'এবং অশোকনাথ তার মাথায় ঢুকিয়েছেন যে তার পিতৃদেবই তার সবচেয়ে বড়ো শত্রু।'

দময়ন্তী অন্যমনস্কভাবে বলল, 'আচ্ছা, তুমি যে মাঝে মাঝে তোমাদের কোম্পানির ব্যালান্স শিট বলে কী একটা বই নিয়ে এসে মন দিয়ে পড়ো, সেটা কী?'

সমরেশ বলল, 'ব্যালান্স শিট হচ্ছে একটা কোম্পানির এক বছরের কৃতকর্মের ইতিহাস। তার যাবতীয় আয়-ব্যয়, লাভ-লোকসান, উন্নতি-অবনতি ইত্যাদি ইত্যাদি এই ব্যালান্স শিটে লেখা থাকে।'

'তার মানে, এই চারটে কোম্পানিরও এই ধরনের ব্যালান্স শিট আছে?'

'নিশ্চয়ই আছে।'

'সেগুলো পাওয়া যায়? মানে, গোপনীয় কিছু নয় তো?'

'না, না। এরা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি, এদের ব্যালান্স শিট একেবারেই গোপনীয় নয়।'

'আচ্ছা, বেশ। তাহলে শিবেনবাবু, আপনি এই চারটে কোম্পানির গত কয়েক বছরের ব্যালান্স শিট আমাকে জোগাড় করে এনে দিতে পারেন?'

শিবেন বলল, 'পারি। কিন্তু আপনি পড়ান ইতিহাস, ব্যালান্স শিট পড়ে কি কিছু বুঝতে পারবেন? সমরেশ ইঞ্জিনিয়ার, চাকরি করে। ওই কিচ্ছু বোঝে কি না আমার সন্দেহ আছে।'

সমরেশ বলল, 'যা যা, না বোঝার কি আছে রে? আমি কি তোর মতো পুলিশ যে ব্যালান্স শিট দেখলে ভয় পাব?'

দময়ন্তী এই ব্যাক্যালাপে বাধা দিয়ে বলল, 'আমার বোঝার দরকার নেই। আপনি আমাকে ওগুলো এনে দিন, তারপর ওদের কোম্পানির চিফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট বিমলবাবুকে দেখিয়ে তাঁর কাছ থেকে উপদেশ নেব।'

'সেটা মন্দ কথা নয়—' বলল সমরেশ, 'বিমলদা তোমাকে এইরকম ব্যাপারে সাহায্য করতে পারলে যে কী খুশি হবেন তা আর বলার নয়। কেবল, তোমাকে আবার তেল-কই রাঁধতে হবে।'

দময়ন্তী সহাস্যে বলল, 'তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই।'

বিমলচন্দ্র শিকদারের বয়েস ষাটের কাছাকাছি। মাথার সব চুল পাকা, গোঁফ ভুরু পাকা, এমনকী চোখের পাতা পর্যন্ত পেকে গেছে। কিন্তু স্বাস্থ্য একেবারে অটুট। রোজ দু-বেলা চার মাইল হাঁটেন, সকালে ছ-টা আর রাত্রে আটটা রুটি খান। আর নেমন্তন্ন করে খাওয়ালে নিয়মকানুন বড়ো-একটা মানতে পারেন না, খাওয়াটা একটু বেশিই হয়ে যায়। তবে হ্যাঁ, যেখানে-সেখানে যার-তার নেমন্তন্নে তিনি যান না। বেছে বেছে মাত্র কয়েক জনের নিমন্ত্রণই গ্রহণ করে থাকেন। বলা বাহুল্য, দময়ন্তী এইমাত্র কয়েক জনের একজন।

বিমলবাবু পরিতৃপ্ত মুখে একটা সিগারেট ধরিয়ে সোফায় বসে বললেন, 'তোমার রান্নার প্রশংসা আর করব না দময়ন্তী, আমার খাওয়ার বহর দেখেই নিশ্চয়ই আমার মতামত বুঝতে পেরেছ। এবার তাহলে কাজের কথায় আসি। সমরেশের দেওয়া ব্যালান্স শিটগুলো আমি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখেছি। তুমি জানতে চেয়েছ যে এই চারটে কোম্পানির মধ্যে কোথায় কোথায় মিল আছে। আমি বলে যাচ্ছি, তুমি শুনে যাও।'

'এক নম্বর, চারটে কোম্পানিই এককালে ব্রিটিশ মালিকানার প্রতিষ্ঠান ছিল, আজ পুরোপুরি ভারতীয়।

'দু-নম্বর, এদের সকলেরই রেজিস্টার্ড হেড অফিস কলকাতায়।

‘তিন নম্বর, এদের প্রত্যেকেরই অতীতের রমরমা আর নেই, বরং অবস্থা বেশ খারাপই বলা চলে। ফলে, এদের সকলেরই শেয়ারের দাম ক্রমাগত পড়ে যাচ্ছে।

‘চার নম্বর, এদের সকলেরই কয়েক জন কমন ডিরেক্টর আছেন। যথা, রাজা বিনয়কৃষ্ণ সিংহরায়, শেঠ মূলচাঁদ আগরওয়াল, ব্যারিস্টার লালমোহন দে, মিস্টার এ এন ঘোষাল, আর মিস্টার ডি পি খান্না।

‘পাঁচ নম্বর, এ ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত। এইসব কটা কোম্পানির গত বছরের চেয়ারম্যানের বক্তৃতায় দেখতে পাচ্ছি তাঁরা আশা প্রকাশ করেছেন যে, এই বছরে তাঁরা বিরাট অর্ডার পাবেন যাতে করে কোম্পানির প্রবল উন্নতি হবে। ব্যাপারটা কাকতালীয় হতে পারে, কিন্তু এটা যে একটা মিল আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।’

বিমলবাবু চুপ করলেন। দময়ন্তীও কোনো কথা বলল না। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করল, ‘হোয়াইট স্টারে কি দুজন এ এন ঘোষাল ডিরেক্টর?’

বিমলবাবু মাথা নেড়ে বললেন, ‘না, একজন।’

‘ডিরেক্টরদের ঠিকানা দেওয়া আছে?’

‘আছে!’

‘ঘোষালদের ঠিকানাটা একটু দেবেন?’

বিমলবাবু চারটে ব্যালান্স শিটের বইয়ের পাতা উলটে বললেন, ‘ভেরি সরি। আমারই ভুল। ঠিকানাটা চেক করে দেখা উচিত ছিল। হোয়াইট স্টারের ঘোষাল থাকেন যোধপুর পার্কে। বাকি কটা কোম্পানির ঘোষাল থাকেন হাঁসপুকুর লেনে। এঁরা দুজনে ভিন্ন ব্যক্তি।’ বলে আশ্চর্য বিস্ময়ে দময়ন্তীর দিকে চেয়ে রইলেন।

দময়ন্তী হাসল। বলল, ‘এতে অবাক হবার কিছু নেই, আমি এই ঘোষালদের সম্পর্কে শুনেছি।’ বলে কিছুক্ষণ ভেবে বলল, ‘আচ্ছা বিমলদা, ডিরেক্টর কারা হন?’

বিমলবাবু হাত নেড়ে বললেন, ‘যাঁদের ডিরেকশন দেবার ক্ষমতা আছে, তাঁরাই ডিরেক্টর হন। ব্যবসাবুদ্ধিতে যাঁরা ঝানু বা টেকনিক্যালি যাঁরা খুব পাকাপোক্ত বা যাঁদের এমন মহলে যাতায়াত আছে যেখান থেকে ব্যবসা জোগাড় করা যায়, তাঁরাই ডিরেক্টর হন। যেমন ধরো, কোনো ওষুধ তৈরির কোম্পানিতে একজন ডাক্তার ডিরেক্টর হতে পারেন, আবার একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিলও হতে পারেন।’

‘তার মানে এঁদের কোনো কমন কোয়ালিফিকেশন থাকার দরকার নেই?’

‘না। কেবল এঁদের প্রত্যেককে তাঁরা যে কোম্পানির ডিরেক্টর তার শেয়ারহোল্ডার হতে হয়। সেটাই স্বাভাবিক। যে কোম্পানিতে আমার শেয়ার নেই, সে কোম্পানির ভালোমন্দে আমার কি উৎসাহ থাকতে পারে?’

‘আর একটু বুঝিয়ে বলুন।’

‘এঁঃ, তুমি দেখছি এসব ব্যাপারে একেবারেই বোঝো না। তবে শোনো। যেকোনো প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা করতে গেলে টাকার দরকার হয়। যাকে বলে মূলধন। এই মূলধন আসে কোথা থেকে? এক, কেউ তার পকেট থেকে দিতে পারে। দুই, কেউ জনসাধারণের কাছে শেয়ার বিক্রি করে সেই টাকা ওঠাতে পারে। শেয়ার মানে অংশ, সেক্ষেত্রে যারা শেয়ার কেনে তারা সেই প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হয়। এই দ্বিতীয় শ্রেণির প্রতিষ্ঠানগুলোকে বলা হয় পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি। এদের ডিরেক্টর বোর্ড তখন জনসাধারণের টাকায়

ব্যবসা করে এবং যে লাভ হয় তার অংশ শেয়ারহোল্ডার বা অংশীদারদের মধ্যে ভাগ করে দেয়। একে বলে ডিভিডেন্ড। এখন তুমি যদি কোনো কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার না হও, অর্থাৎ তোমার টাকা যদি সেই কোম্পানিতে না খাটে, তাহলে তার উন্নতি-অবনতি নিয়ে তোমার মাথা ঘামানোর কী দরকার?'

'কোম্পানির উন্নতি হলে আমার কী লাভ?'

'বাঃ! লাভ নেই? উন্নতি হলে কোম্পানি তোমাকে বেশি করে লভ্যাংশ দেবে। তোমার টাকা ঘরে বেশি টাকা আনবে। তা ছাড়া, তোমার শেয়ারের দাম বাজারে বেড়ে যাবে। ধরো, তুমি কোনো কোম্পানির দশ টাকার শেয়ার একশোটা কিনলে। হাজার টাকা খরচা হল। কাল সেই কোম্পানি প্রচুর উন্নতি করল, প্রচুর লভ্যাংশ ঘোষণা করল, তখন বাজারে তার শেয়ারের দাম বেড়ে দাঁড়াল ত্রিশ টাকা। সঙ্গে সঙ্গে তোমার শেয়ারের দাম হয়ে গেল তিন হাজার টাকা। তখন যদি তুমি সেই শেয়ার বিক্রি করে দাও, তাহলে হাজার টাকায় দু-হাজার টাকা লাভ।'

'আর যদি অবনতি হয়?'

'তাহলে তুমি লভ্যাংশ কম পাবে বা পাবেই না। বাজারে তোমার শেয়ারের দাম কমে যাবে।'

'কত কমবে? আমি যে দামে কিনেছি তার নীচে তো আর যাবে না?'

'নিশ্চয়ই যাবে। দশ টাকার শেয়ারের দাম আট আনা, চার আনা, এমনকী শূন্যও হতে পারে।'

'শেয়ারগুলো কীরকম দেখতে?'

'বড়ো বড়ো মোটা কাগজের দলিল। তাতে কোম্পানির নামধাম আর যে কিনল তার নামধাম লেখা থাকে।'

'তার মানে দাঁড়াল এই যে আমি যদি কোনো কোম্পানির অংশীদার হই, তাহলে কখনোই চাইব না যে সেই কোম্পানির অবনতি হোক বা কোনোরকম ক্ষতি হোক। তাই তো?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

'আচ্ছা, এই শেয়ার কেনা-বেচা হয় কোথায়? দামই বা কীভাবে ঠিক হয়?'

'শেয়ার কেনা-বেচা হয় স্টক মার্কেটে বা শেয়ার বাজারে। আর দাম ঠিক হয় কোম্পানির কাজকর্ম দেখে, ভূত ভবিষ্যৎ দেখে। দামটা ঠিক করে স্টক এক্সচেঞ্জ। তারা অনেক কিছু বিচার করে দাম ধরে। যেমন ধরো, কোনো প্রতিষ্ঠান খুব ভালো ব্যবসা করছে— তার শেয়ারের দাম বাড়বে। হঠাৎ খবর পাওয়া গেল যে তাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টর, যিনি ঝানু ব্যবসাদার, প্রায় নিজের হাতে কোম্পানিটা চালাচ্ছিলেন, ডিরেক্টর বোর্ডের সঙ্গে ঝগড়া করে চাকরি ছেড়ে দিচ্ছেন, অমনি তার শেয়ারের দাম কমতে শুরু করবে।'

'তার মানে, আপনি যে বললেন আমাদের এই চারটে প্রতিষ্ঠানের ব্যালান্স শিটে দেখানো ছিল যে তারা এ বছর মস্ত অর্ডার পেতে যাচ্ছে, তার ফলে তাদের কম দামের শেয়ারের দাম বেড়ে যেতে পারত?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। বেড়ে যেতে পারত নয়, বাড়ছিল।'

‘এ বছরের অন্তর্ঘাতের ফলে উলটে তাদের দাম তাহলে আরও কমে গেল?’

‘হ্যাঁ। যাচ্ছেতাই ভাবে কমে গেল।’

‘এই দুষ্কর্ম কি তাহলে কোনো শেয়ারহোল্ডারের পক্ষে করা সম্ভব?’

‘সম্ভব, তবে উচিত নয়। যদি কোনো শেয়ারহোল্ডার এই অন্তর্ঘাতগুলোর পেছনে থাকে, তাহলে বলতে হবে সে পাগল, নয়তো তার আত্মহত্যা করার প্রবল ইচ্ছে রয়েছে।’

শিবেন এসে রোববার সন্ধ্যেবেলা বলল, ‘বিমল শিকদারের সঙ্গে কথা বলে কিছু লাভ হল?’

দময়ন্তী মৃদু হেসে মাথা নাড়ল। বলল, ‘হয়েছে বই কী! শেয়ার, স্টক মার্কেট, লিমিটেড কোম্পানি ইত্যাদি ব্যাপারে অনেক জ্ঞান লাভ হল।’

‘আর এই অন্তর্ঘাতগুলো? সে ব্যাপারে কিছু বুঝলেন?’

‘কিছু বুঝেছি, সবটা নয়। ঘটনাগুলো বিচ্ছিন্ন নয় বলে মনে হচ্ছে। একটা যোগসূত্র আছে।’

সমরেশ বলল, ‘দ্যাখ, আমার মাথায় একটা থিয়োরি এসেছে। এমন তো হতে পারে যে চারজন লোক চারটে কোম্পানি কিনতে চাইছে। তারা প্রত্যেকে আলাদা আলাদাভাবে একই লোকের কাছে গেছে যে সাবোটাজ করায় এক্সপার্ট। সেক্ষেত্রে ব্যালান্স শিট দেখে সেই যোগসূত্র তুমি খুঁজে পাবে না। কারণ, চারজন খরিদ্দার আর সাবোটাজ করনেওলা বদমাইশটা সকলেই বাইরের লোক।’

শিবেন বলল, ‘দ্যাখ, তোর থিয়োরিটা একদম বাজে। এরকম সাবোটাজ এক্সপার্ট যদি কেউ থাকত যার বাজারে এত নাম যে একইসঙ্গে চার চারজন মক্কেল তার পেছনে ঘুরঘুর করছে, তাহলে সে খবরটি আমাদের কানে আসত।’

সমরেশ বলল, ‘হ্যাঁ, সে কথা ঠিক। আর একটা কথা বলি। আমি এর আগের দিন বলেছিলুম যে একজন লোক একসঙ্গে একাধিক কোম্পানি আক্রমণ করে না। সেটা অবশ্য পরে ভেবে দেখেছি, ঠিক নয়। করতে পারে, তবে যদি তেমন তেমন কোম্পানি হয়। আর সে লোকও যদি তেমন তেমন মালদার পার্টি হয়। কিন্তু এসব যা কোম্পানি, এদের কিনতে কোনো সত্যিকারের মালদার লোক এগিয়ে আসবে তা মনে হয় না। সেইজন্যেই ভাবছিলুম, হয়তো চারটে আলাদা লোক হতে পারে। তারা যে একই বছরে অ্যাকশনে নেমেছে সেটা নিতান্তই সমাপতন!’

‘না, সেটা অসম্ভব। সমাপতনেরও একটা সীমা আছে। চার চারটে লোক একই বছরে একই ঠিকাদারকে দিয়ে চারটে কারখানায় একই ধরনের বোমা ফাটিয়ে তাদের কেনবার চেষ্টা করছে, এটা হতে পারে না। অতএব, তোর থিয়োরি এবার বন্ধ কর। বউদি কি বলেন, এবার শুনি।’

দময়ন্তী বলল, ‘দেখুন, আগেই বলেছি যে আমার মনে হচ্ছে যে এই ঘটনাগুলোর মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে এবং সেই যোগসূত্রের খবর রাখেন শ্রীঅশোকনাথ ঘোষাল। নইলে, আমাদের ডেকে, তাঁর ছেলের বউয়ের পঁচিশ বছর আগেকার প্রেমিক প্রতিহিংসা নেবার জন্যে এই কাজ করছে, এই ধরনের আষাঢ়ে গল্প শোনাতেন না। বুড়ো রামঘুঘু— আমাকে একটা লীড দিচ্ছেন বুঝতে পারছি, কিন্তু ঠিক ধরতে পারছি না।’

‘তার মানে, এই মক্কো করার ব্যাপারটা আপনি বিশেষ আমল দিচ্ছেন না, এই তো?’

‘আমি বিমলবাবুর সঙ্গে কথা যেটুকু বলেছি, তাতে বুঝেছি যে এই কারখানাগুলোর আর্থিক অবস্থা বিশেষ ভালো না হলেও তারা এখনও চলছে। তার মানে, তাদের সিকিউরিটি আছে, লোকজন ঘোরাঘুরি করছে। এর মধ্যে খামোকা রিস্ক নিয়ে, লাঞ্চ আওয়ার হলেও, কার দায় পড়েছে বলুন তো হাত-মক্কো করার? তা ছাড়া, এদের ইতিহাসও বলছে যে এদের যেমন-তেমন ভাবে পছন্দ করা হয়নি। সেখানেও একটা প্যাটার্ন আছে।’

সমরেশ বলল, ‘স্বয়ং অশোকনাথই তো এই যোগসূত্র হতে পারেন?’

‘তা পারেন। কিন্তু তিনি তো এইসব কটা কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার। তাহলে বিমলবাবুর কথায় বলতে হয় যে তিনি পাগল বা আত্মহত্যা করার চেষ্টা করছেন। তা ছাড়া, তিনি এর মধ্যে থাকলে আমাকে ডেকে পাঠাবেনই বা কেন?’

শিবেন বলল, ‘একদম ঠিক কথা। আপনি এখন তাহলে কী করতে চান?’

‘আমি কয়েক জনের সঙ্গে কথা বলতে চাই।’

‘প্রথমেই প্রশান্ত ঘটকের সঙ্গে, তাই না?’

দময়ন্তী হেসে উঠল। বলল, ‘হ্যাঁ, ধরেছেন ঠিক।’

গাড়িতে যেতে যেতে দময়ন্তী প্রশ্ন করল, ‘প্রশান্ত ঘটক সম্পর্কে কী কী খবর পেলেন, বলুন।’

শিবেন বলল, ‘প্রশান্ত ঘটকের বাবা স্বর্গীয় অনুতোষ ঘটক ছিলেন কলকাতার একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল। তাঁর তিন ছেলে, দুই মেয়ে। প্রশান্ত মেজো। অত্যন্ত মেধাবী ছেলে, লেখাপড়ায় আগাগোড়া প্রথমে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকনমিক্সের স্নাতক, তারপর হার্ভার্ড। অতঃপর চাকরি। প্রথমে কিছুদিন ছিলেন একটা ছোটো ফার্মে, তারপরে হোয়াইট স্টার। এখন সেলস ডিরেক্টর। এ ছাড়া নানারকম জনহিতকর প্রতিষ্ঠান, যাদের বলা হয় সোশ্যাল সার্ভিস অরগানাইজেশন, তাদের সঙ্গে জড়িত আছেন। বিয়ে করেননি। থাকেন উডবার্ন গার্ডেন্সে, মালকোষ অ্যাপার্টমেন্টে। সেখানেই আপাতত আমরা যাচ্ছি।’

‘আমাদের যাবার কথা শুনে আশ্চর্য হননি?’

‘হয়েছিলেন হয়তো। গলা শুনে বুঝতে পারিনি। টেলিফোনের ওই তো দোষ। অবশ্য বালিটিকুরির বিস্ফোরণের ব্যাপারে কথা বলতে চাই শুনে খুশি হলেন বলে মনে হল। তবে, আমার সঙ্গে একজন ভদ্রমহিলা আর তাঁর হাজব্যান্ড থাকবেন, কারণ সেই ভদ্রমহিলাও আমাদের তদন্তের সঙ্গে যুক্ত আছেন শুনে কিছুক্ষণ চুপ করেছিলেন। একটু অবাক হয়েছেন, সন্দেহ নেই। অফিসে যেতে বললেন প্রথমে। তারপর কী ভেবে বললেন বাড়িতে আসতে। সন্ধেবেলা।’

মালকোষ অ্যাপার্টমেন্ট দশতলা বাড়ি, তার সাততলায় প্রশান্ত ঘটকের ফ্ল্যাট। পালিশ করা দরজার ওপর চকচকে পেতলের নেমপ্লেটে ঘটক সাহেবের নাম লেখা। কলিং বেল বাজাতে নীল ফুলপ্যান্ট আর সাদা বুশশার্ট-পরা একটি লোক এসে দরজা খুলে দিয়ে নিঃশব্দে একপাশে সরে দাঁড়াল। তার পেছনে একটি প্রায়ান্ধকার ঘর, সিঁড়ির উজ্জ্বল

আলো থেকে ভেতরে ঢুকলে প্রথমটা কিছুই ঠাহর হয় না। একটু বাদে বোঝা যায় যে ঘরটা মস্ত বড়ো, যতটা লম্বা ততটা চওড়া নয়। একদিকের লম্বা দেওয়াল জুড়ে থিয়েটার স্টেজের স্ক্রিনের মতো মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত ধূসর রঙের পর্দা ঝোলানো। তার পেছনে যে টানা জানলা আছে, সেটা পর্দার ওপর চলমান আলো দেখলে বোঝা যায়। লম্বা দেওয়ালের একদিকে একটা গ্রিলে ঢাকা বারান্দা, অন্যদিকে বোধ হয় বেডরুমে যাবার দরজা। সিঁড়ি থেকে ঘরে ঢোকার দরজাটা অন্য লম্বা দেওয়ালটার মাঝখানে। তারও দু-পাশে দুটো দরজা, কীসের কে জানে! সবাই ভেতরে ঢুকলে নীল ফুলপ্যান্ট একটা বড়ো আলো জ্বেলে দিল।

ঘরটির আসবাবপত্র মহার্ঘ না হলেও সুরুচিপূর্ণ। পুরোনো আর হালফ্যাশনের একটা সুন্দর সমন্বয়। দেওয়ালে একদিকে যামিনী রায় অন্যদিকে গণেশ কর্মকার। বইয়ের আলমারিতে রবীন্দ্রনাথ আর য়াসুনারি কাওয়াবাতার সহজ সহাবস্থান।

প্রশান্ত ঘটক সাদা ট্রাউজার্স আর হলুদ রঙের স্পোর্টস গেঞ্জি পরে একটা সোফার ওপর বসেছিলেন। অতিথিদের দেখে উঠে দাঁড়ালেন। মিউজিক সিস্টেমে মৃদু স্বরে স্বরোদ বাজছিল। সেটা বন্ধ করে দিলেন। তারপর এগিয়ে এলেন সবাইকে স্বাগত জানাতে। অত্যন্ত সুপুরুষ লম্বা রোগাটে গড়নের প্রৌঢ় ভদ্রলোক, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, মুখে তদ্রুপ ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, স্টিল ফ্রেমের চশমার পেছনে একজোড়া চঞ্চল, হাস্যোজ্জ্বল চোখ।

শিবেন সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার পর, নীল ফুলপ্যান্টকে চা আনবার আদেশ দিয়ে দময়ন্তীকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে প্রশান্ত প্রশ্ন করলেন, 'আপনি ডিটেকটিভ? আপনাকে কিন্তু দেখলে শিক্ষাজগতের লোক বলে মনে হয়।'

দময়ন্তী মৃদু হেসে বলল, 'মূলত আমি কিন্তু শিক্ষাজগতেরই লোক। ভুবনেশ্বরী দেবী গার্লস কলেজে ইতিহাস পড়িয়ে থাকি। রহস্য খুঁজে বেড়ানোটা আমার নেশা, পেশা নয়।'

'সে ভালো কথা। কিন্তু আপনাকে তো কেউ এই কাজে নিযুক্ত করেছে? তিনি কে? না কি আপনি পুলিশ বিভাগেই আছেন?'

'আমি পুলিশকে সাহায্য করে থাকি ঠিকই, যদি ওঁরা চান। তবে এক্ষেত্রে আমাকে নিযুক্ত করেছেন আপনাদের প্রতিষ্ঠানের একজন শেয়ারহোল্ডার।'

'শেয়ারহোল্ডার? লেবার ইউনিয়ন নয়?'

'না। আপনাদের বড়ো শেয়ারহোল্ডারদের একজন। তবে তাঁর নাম বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'না, না, তার দরকার নেই।' বলে প্রশান্ত ঘটক যেন একটু স্বচ্ছন্দ হলেন। আরাম করে হেলান দিয়ে বসে বললেন, 'আশ্চর্য! ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলুম না। তার মানে আমাদের কোনো কোনো শেয়ারহোল্ডার ভাবছেন যে আমরা পুলিশকে দিয়ে যে তদন্ত করাচ্ছি, তার মধ্যে কোনো ফাঁক থেকে যাচ্ছে। অর্থাৎ, আমরা পুলিশকে যতটা সাহায্য করা দরকার, ততটা করছি না। ব্যাপারটা কি তাই?'

'ব্যাপারটা অনেকটা তাই বটে। কিন্তু আপনি যে অর্থে বললেন, ঠিক সেইভাবে নয়।'

'কীভাবে সেটা যদি একটু খুলে বলেন।'

'বলব, কিন্তু তার আগে আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। ইচ্ছে হলে উত্তর দেবেন, না হলে দেবেন না।'

‘তা তো বটেই। আমার সাংবিধানিক অধিকার আমার ভালোই জানা আছে। কিন্তু, এ কথাটা আপনি বললেন কেন? আপনার কি ধারণা যে এই ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন আমার এড়িয়ে যাবার দরকার হতে পারে?’

‘হ্যাঁ, পারে। কারণ, প্রশ্নগুলো ব্যক্তিগত।’

‘ব্যক্তিগত?’ প্রশান্ত আবার সোফার ওপরে খাড়া হয়ে বললেন, ‘বলেন কি? আপনি কি তদন্ত করে এই সাবোটাজগুলোর ব্যাপারে আমাকেই দোষী সাব্যস্ত করলেন নাকি?’

‘এখনও করিনি। তবে সন্দেহভাজনদের মধ্যে যে আপনি একজন, সে কথাটা ঠিক।’

‘ঠিক? কী সর্বনাশ! আপনি বোধ হয় হোয়াইট স্টারের ইতিহাস জানেন না।’

‘খুব ভালো করে জানি। এর উন্নতির পেছনে আপনার অবদানের কথাও আমাদের অজানা নয়।’

‘অজানা নয়? তবু আপনার সন্দেহভাজনদের মধ্যে আমি একজন? ভালো কথা। তাহলে শুরু করুন আপনার প্রশ্ন।’ বলে প্রশান্ত আবার পেছনে হেলান দিয়ে বসলেন। মুখের মৃদু হাসি দেখে মনে হল, বেশ মজা পাচ্ছেন, মোটেই উদবিগ্ন নন।

দময়ন্তী জিজ্ঞেস করল, ‘এই ফ্ল্যাটটা আপনার?’

‘হ্যাঁ। বছর ছয়েক আগে কিনেছি।’

‘এখানে আসার আগে কোথায় ছিলেন?’

‘ম্যাকমোহন স্ট্রিটে, যার বর্তমান নাম বিপ্লবী উমেশ দত্ত সরণী। বাগবাজারে। আমার পৈতৃক বাড়ি সেখানেই।’

‘সে বাড়ি ছেড়ে দিলেন কেন?’

‘আমার বাবা মারা যাওয়ার পর যখন সম্পত্তি ভাগ হয়, তখন আমি বাড়ির অংশ না নিয়ে টাকা নিয়েছিলুম। যদি জিজ্ঞেস করেন কেন, তাহলে তার উত্তর হচ্ছে যে একটা দোতলা বাড়ি তিন ভাইয়ের মধ্যে ভাগ না হয়ে দু-ভাইয়ের মধ্যে ভাগ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যেহেতু আমি একা, অতএব আমার সরে আসাই স্বাভাবিক।’

‘সে কথা ঠিক। শুনেছি, আপনারা তিন ভাই, দুই বোন। তাঁরা কে কী করেন?’

‘আমার বড়দা বাবার মতোই, অ্যাডভোকেট। ছোটো ভাই চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। মুখার্জি অ্যান্ড ঘটকের সিনিয়ার পার্টনার। এরপর ছোটো দুই বোন। দুজনেরই বিয়ে হয়ে গেছে। একজনের শ্বশুরবাড়ি কলকাতায়, অন্যজনের কানপুরে।’

‘আপনার দুই ভাইয়ের বিয়ে হয়েছে?’

‘হয়েছে। তাদের ছেলে-মেয়ে আছে।’

‘আপনি বিয়ে করেননি কেন?’

প্রশান্ত ঘটক চোখ বুজে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর মৃদু হেসে বললেন, ‘এটা একটা স্বাভাবিক ব্যক্তিগত প্রশ্ন বটে। ভালো কথা। এর সঠিক উত্তর দেওয়া যাবে। আপনার প্রশ্নের উত্তর বলতে পারেন, ব্যর্থ প্রেম।’

‘অর্থাৎ আপনি একটি মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু...’

প্রশান্ত আবার খাড়া হয়ে বসলেন। দময়ন্তীকে বাধা দিয়ে হাত জোড় করে বললেন, 'না, না, একটি মেয়েকে কেন? অনেক মেয়েকেই। যাকেই বলি, "তুমি আমাকে বিয়ে করবে?" অমনি সে দৌড়ে গিয়ে আর একজনকে বিয়ে করে বসে। এমন করলে কখনো করুর বিয়ে হয়?'

প্রশান্তর কথার ভঙ্গিতে সবাই হেসে উঠল। দময়ন্তী হাসতে হাসতে বলল, 'আমার প্রশ্নের জবাবটা কিন্তু আপনি এড়িয়েই যাচ্ছেন, মিস্টার ঘটক।'

প্রশান্তর হাসিটা হঠাৎ থেমে গেল। ঈষৎ রুষ্ট গলায় প্রশ্ন করলেন, 'আমার এড়িয়ে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন আছে কি, বিশেষত এমন একটা ব্যাপারে যার সঙ্গে আমাদের কারখানার বিস্ফোরণের কোনোরকম সম্পর্ক থাকার কোনো সম্ভাবনাই থাকতে পারে না?'

দময়ন্তী স্মিত মুখে বলল, 'সম্পর্ক যে থাকতে পারে না, সে কথা কি জোর করে বলা যায়, মিস্টার ঘটক?'

'বলা যায় না?' বলে প্রশান্ত দু-হাত জোড় করে বললেন, 'একটু খোলসা করে বলবেন কি, আপনার সন্দেহ? দয়া করে আমাকে একটু তমসা হইতে জ্যোতিতে লইয়া যাইবেন?'

'আমার এখনও সঠিক কোনো সন্দেহ দানা বাঁধতে পারেনি। তবে আমাদের কাছে অভিযোগ এসেছে যে আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে আপনি কোনো একটি মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন। যাঁর কাছে হেরে গিয়েছিলেন, আজ তাঁর ওপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্যে আপনি এই দুর্ঘটনাগুলো ঘটাচ্ছেন।'

স্থির, স্তম্ভিত, নিষ্পলক চোখে প্রশান্ত দময়ন্তীর কথাগুলো শুনলেন। তাঁর ফর্সা মুখটা আস্তে অস্তে লাল হয়ে উঠল। তারপর হঠাৎ মাথাটা পেছনে হেলিয়ে একটা প্রচণ্ড অট্টহাস্যে ফেটে পড়লেন। বেশ কিছুক্ষণ বাদে হাসিটা কোনোরকমে সামলে রুদ্ধ কণ্ঠে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'কে বলেছে আপনাকে এরকম কথা? আমাদের একজন শেয়ারহোল্ডার? উঃ, কী ভয়ানক ব্যাপার! মানুষের কি আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই? এতদিন আগেকার ঘটনা! বাপরে বাপ!'

দময়ন্তী অবিচলিত গলায় প্রশ্ন করল, 'ঘটনাটা কি সত্যি নয়?'

হাত নেড়ে প্রশান্ত বললেন, 'না, না, সত্যি এক-শো বার সত্যি। কিন্তু ব্যাপারটা কীরকম জানেন? ধরুন আমি যদি বলি, ঔরঙ্গজেবের কুশাসনের ফলেই আজকের ভারতবর্ষের এই দুরবস্থা, তাহলে আপনি হাসবেন, কিন্তু ঔরঙ্গজেবের কুশাসনটা কি মিথ্যে? সেইরকম আমি একদা একটি মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছিলুম, কিন্তু পারিনি— সেটা সত্যি হলেও তার জন্যে আজ আমি আমাদের কারখানায় বোমা মেরে আর আগুন লাগিয়ে বেড়াচ্ছি, সে কথাটা কিন্তু হাস্যকরই হয়ে পড়ে।'

'ঘটনাটা কী ঘটেছিল, একটু বলবেন?'

'দেখুন, ব্যর্থ প্রেমের ঘটনাটা লোকে লুকিয়ে রাখে, গেয়ে বেড়ায় না। তবু বলছি, কেন বলছি, বুঝতেই পারবেন। উঃ, সে কোন কালের ব্যাপার! আমি এবং আমার এক সহকর্মী একই মেয়ের প্রেমে পড়েছিলুম। মেয়েটির দাদা আমাদের বন্ধু ছিল, আমাদের সঙ্গে একসঙ্গে কফি হাউসে আড্ডা দিত। তার মাধ্যমেই আলাপ, পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা। মেয়েটি আমাকে বিয়ে করল না, করল আমার সহকর্মীকে। সেটাই অবশ্য স্বাভাবিক এবং অবশ্যম্ভাবী ছিল, কারণ তারা দুজনেই একই রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিল আর আমি

কোনো রাজনীতির মধ্যে ছিলুম না। তাদের বিয়ের পর আমি যে কিছুদিন দুঃখু-দুঃখু মুখ করে বিমনা হয়ে বেড়াইনি, এমন কথা বলতে পারব না। তবে তখন বয়েস অল্প, ভাঙা হৃদয় এবং বন্ধুত্ব জোড়া লাগতে বিশেষ সময় লাগল না। আজ আমরা তিনজনেই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। প্রেম যেটা ছিল, সেটা ঠিকই আছে, কেবল তার চরিত্রটা পালটে গেছে।'

'আপনার এই বন্ধুর নাম-ঠিকানা বলতে আপনার কোনো আপত্তি আছে?'

'আছে। মনে রাখবেন তারা একটি সুখী সন্তুষ্ট পরিবার। তাদের এই সন্দেহ আর অবিশ্বাসের নোংরামির ভেতর কেন টেনে আনতে যাব?' তারপর একটু থেমে প্রশান্ত মৃদু হেসে বললেন, 'তা ছাড়া, আপনার সেই শেয়ারহোল্ডারটি তো আছেনই। তিনি এত খবর রাখেন আর এই খবরটা রাখেন না?'

'তা হয়তো রাখেন। সেটা পরে দেখা যাবে'খন। আমরা এখন তাহলে চলি। আপনার অনেকটা সময় নষ্ট করলুম!'

'না, না, কী যে বলেন! তবে এবার আমি একটা প্রশ্ন করব?'

'করুন।'

'আমার ওপরে কি এখনও আপনার সন্দেহ আছে?'

দময়ন্তী হাসল। বলল, 'হ্যাঁ, আছে।' বলে উঠে দাঁড়াল।

প্রশান্তও উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'এইবার বুঝলুম পুলিশকে পুরো সাহায্য না করার অর্থ কী।'

শিবেন প্রশ্ন করল, 'এবার কার সঙ্গে দেখা করবেন? অলোকনাথের সঙ্গে কি?'

দময়ন্তী বলল, 'না। বালিটিকুরির ফ্যাক্টরির সিকিউরিটির যিনি প্রধান, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব।'

'ফ্রেডারিক ডিসিলভা। আগে ক্যালকাটা পুলিশেই ছিলেন। খুব ভালো করেই চিনি। রয়েড স্ট্রিটে বাড়ি। ওঁকে এখানেই নিয়ে আসি?'

'তাহলে খুবই ভালোই হয়।'

'দাঁড়ান, তাহলে একটা ফোন করি।'

'এই এখন? রাত হয়ে গেল যে!'

'রাত? পুটেদার কাছে এখন তো সন্ধ্যেই হয়নি।'

'পুটেদা?'

'হ্যাঁ। ফ্রেডারিক থেকে ফ্রেডিদা পুলিশ মহলে কবে যেন পুটেদা হয়ে গেছে।' বলে শিবেন ফোন করতে উঠল। খানিকক্ষণ কথা বলে ফোন নামিয়ে রেখে বলল, 'পুটেদা এখনই আসবেন। এতটা উৎসাহের কারণ বিস্ফোরণ-রহস্য না আপনি সেটা ঠিক বুঝতে পারলুম না। তা সে যাকগে। এবার বলুন, প্রশান্ত ঘটকের সঙ্গে কথা বলে কী মনে হল?'

'অত্যন্ত মসৃণ ব্যক্তিত্ব। এতই মসৃণ যে প্রায় পেছল বলা চলে।'

'এই ঘটনার পেছনে ওঁর হাত থাকা সম্ভব?'

'সম্ভব।'

‘আর পঁচিশ বছর আগেকার ব্যর্থ প্রেমের প্রতিহিংসা?’

‘সেটাও অসম্ভব নয়!’

এরপর আর বিশেষ কথা হল না। শিবেন আর সমরেশ বসল দাবা নিয়ে, দময়ন্তী রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল।

ফ্রেডারিক ডিসিলভা এলেন আধ ঘণ্টা বাদে। নাম শুনলে যেমন পোর্তুগিজ জলদস্যু মার্কা অতিকায় চেহারার কোনো লোক বলে মনে হয়, আসলে মোটেই সেরকম নন। বরং পুটেদা নামটাই বেশি সংগত বলে মনে হল। ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ, মাথায় একরাশ পাকাচুল, শীর্ণ মুখে পাকানো পাকা গোঁফ, অনতিদীর্ঘ রোগাটে শরীর, পরনে একটা নীল হাওয়াই শার্ট আর কালো ট্রাউজার্স, পায়ে কোলাপুরি চটি। পরিষ্কার বাংলায় বললেন, ‘খুব হতাশ হলেন তো? ভেবেছিলেন একটা লালমুখো সায়েব গটমট করতে করতে আসবে। এল কিনা একটা ভেতো বাঙালি।’

সমরেশ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘আপনি বাঙালি নাকি?’

প্রবল বেগে মাথা নেড়ে ডিসিলভা বললেন, ‘আলবত বাঙালি। ক্রিশ্চান বটি, কিন্তু নিবাস মিদনাপুর জেলার গেঁওখালির কাছে, গ্রামের নাম কুলহাটি।’

দময়ন্তী জিজ্ঞেস করল, ‘হোয়াইট স্টারে কতদিন আছেন?’

‘বেশি নয়, বছর তিনেক। পুলিশের চাকরি থেকে রিটায়ার করে পর্যন্ত এইখানেই আছি।’

‘এই বালিটিকুরিতেই?’

‘হ্যাঁ।’

‘আচ্ছা, এই কারখানায় যে বিস্ফোরণটা হয়েছিল, সে ব্যাপারে একটু বলবেন?’

‘দেখুন, বলবার তেমন কিছু নেই। সেদিন ছিল বুধবার, দুপুরবেলা পৌনে দুটো নাগাদ বিস্ফোরণ ঘটে। আমি তখন গেট অফিসে লাঞ্চ সেরে আরও তিনজন অফিসারের সঙ্গে তাস খেলছিলুম। হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দ! আমি তাড়াতাড়ি গেট অফিস বন্ধ করে কাউকে ঢুকতে বা বেরুতে বারণ করে দিয়ে আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট তরুণ চাকিকে সঙ্গে করে বেরিয়ে এলুম। দেখি, সব্বাই ফাউন্ড্রির দিকে দৌড়ুচ্ছে। আমিও দৌড়োলুম। সেখানে পৌঁছে দেখি ভয়াবহ ব্যাপার। ফাউন্ড্রি শপ একেবারে তছনছ হয়ে গেছে। দুটো কিউপোলা ভেঙে দুমড়ে পড়ে আছে, বড়ো বড়ো প্যাটার্নগুলো ছত্রাকার, ছাদের অ্যাসবেসটস অনেক জায়গায় ফেটে চৌচির, মেঝে বালিতে ভরতি। প্রথমেই লোকজন সামলে ভেতরে ঢুকলুম। আমার মনে একটাই চিন্তা, কেউ মরেনি তো? না, কেউ মরেনি! কেবল প্যাটার্ন রাখার গোডাউনের ভেতর একজন ওয়ার্কার টিফিন করছিল। সে আহত হয়েছে আর অজ্ঞান হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি তাকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করলুম।’

‘পুলিশ এল ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই। লালবাজার থেকে এক্সপার্টরা এলেন ঘণ্টা তিনেক বাদে। বোঝাই গেল, ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে টাইম বোমা। পরে শিবেনবাবুর কাছে জানতে পারি যে এরকম ঘটনা আগেও ঘটেছে— অন্য ফ্যাক্টরিতে।

‘সেদিন পুলিশ ফাউন্ড্রি, শপের দু-চারজনকে জেরা করল। কিছুই বোঝা গেল না। ফাউন্ড্রি শপে অনেক লোকের আনাগোনা, অফিসার থেকে সুইপার। তাদের সবাই সন্দেহভাজন আবার কেউই নয়। তবে, তার পরদিন থেকে দুজন ওয়ার্কার বেপাত্তা হয়ে

গেল। একজন মহাবীরপ্রসাদ, চোর, মাতাল, জুয়াড়ি, দু-তিনবার হাজতবাস করে এসেছে। অন্যজন প্রভুদয়াল, এক নম্বরের চোর, বলতে পারেন ক্লেপ্টোম্যানিয়াক, চুরি না করে থাকতে পারে না, তার ওপর চরিত্রদোষও আছে। এদের দুজনের মিল হচ্ছে যে এরা সবসময় পয়সার অভাবে থাকে। ধারের ওপর ধার। আর একটা মিল, এরা কেউই ফাউন্ড্রিতে কাজ করে না।'

দময়ন্তী জিজ্ঞেস করল, 'এরা সেদিন ফাউন্ড্রি শপে গিয়েছিল?'

'গিয়ে থাকতে পারে। অসম্ভব নয়। তবে, কেউ তাদের লক্ষ করেনি।'

'আচ্ছা, এরকম তো হতে পারে যে এই দুই নামকাটা সেপাই এত বড়ো গণ্ডগোল দেখেই গা-ঢাকা দিয়েছে? কারণ, তারা জানে পুলিশ তাদের হেনস্থা করতে পারে। হয়তো গোলমাল মিটলেই তারা ফিরে আসবে।'

'হ্যাঁ, এটা যে অসম্ভব তা বলব না। বরং বলব ভীষণভাবে সম্ভব।'

'আচ্ছা, সেদিন আপনাদের ফ্যাক্টরিতে যাঁরা যাঁরা গিয়েছিলেন, মানে বাইরে থেকে, তার কোনো রেকর্ড আছে কি?'

'আছে। সেদিন যে কজন ভিজিটার এসেছিলেন তাদের প্রত্যেকের নাম, ঠিকানা এবং ঢোকা আর বেরুনোর সময় লেখা আছে।'

'তাদের কেউ ফাউন্ড্রিতে গিয়েছিলেন?'

'না। মানে, কাগজে কলমে না। ধরুন, কেউ গিয়েছেন মেশিন শপে। ফেরার সময় ফাউন্ড্রি ঘুরে গেলেন। সেটা ধরবার উপায় নেই।'

সমরেশ বলল, 'আচ্ছা, আপনাদের হেড অফিস বা ব্রাঞ্চ অফিস থেকে যদি কেউ এসে থাকেন, তাদের নামও কি আপনারা রেকর্ড করেন?'

ডিসিলভা মাথা নেড়ে বললেন, 'না, তাদের নাম রেকর্ড করা হয় না। তবে, হেড অফিস বা ব্রাঞ্চ অফিস থেকে সাধারণত অফিসাররাই আসেন। তাঁরা তো আর এ কাজ করতে যাবেন না।'

দময়ন্তী মৃদু হেসে বলল, 'তাই নাকি? এ ব্যাপারে আপনার কোনো সন্দেহ নেই?'

'না, কোনো সন্দেহ নেই।'

'ভালো। তবে সেদিন কোনো অফিসার এসেছিলেন কিনা আপনার মনে পড়ে।'

'না। তা ছাড়া, তাঁরা গাড়ি করে আসেন। কোম্পানির গাড়ি দারোয়ানরা চেনে। দেখলে গেট খুলে দেয়। গাড়ির ভেতরে কারা বসে আছেন সেটা আর লক্ষ করে না।'

'তার মানে কোনো অফিসার যদি সঙ্গে করে এমন কোনো লোক গাড়িতে বসিয়ে নিয়ে আসেন, যে হয়তো সেই অফিসারের অজান্তেই কারখানার ক্ষতি হয় এমন কোনো কাজ করল, তাকে ধরবার কোনো উপায় নেই?'

ডিসিলভা একটু ভেবে বললেন, 'না, নেই। তবে এমন ঘটনা ঘটা কি সম্ভব? কোনো অফিসার কি কারখানার ক্ষতি করতে পারেন? তাহলে তো তাঁরই ক্ষতি। আর, এটা নিশ্চয়ই আশা করা যায় যে কোনো অফিসার ঘুস খেয়ে এরকম কাজ করবেন না।'

দময়ন্তী আবার হাসল। বলল, 'হ্যাঁ, তা আশা করা যায় বটে।'

ডিসিলভা চলে গেলে দময়ন্তী বলল, 'পুলিশ হিসেবে আপনার পুটেদা কিন্তু বেশ নাইভ — সরলচিত্ত লোক।'

শিবেন বলল, 'তা যা বলেছেন। সেইজন্যেই ওঁর বড়ো একটা উন্নতি হয়নি। সবাইকে অপক্ষপাতে বিশ্বাস করতেন। বললে বিশ্বাস করবেন না, পুলিশে এমন লোক কিন্তু বিরল নয়। আগেও ছিল, এখনও আছে। কিন্তু তা নাহয় হল, পুটেদার কাছ থেকে কিছু জানতে পারলেন?'

'পারলুম বই কী! যেমন ধরুন, বালিটিকুরির কারখানার ক্ষতি যদি কেউ সত্যি সত্যি করতে চায়, তাহলে তাকে খুব একটা কাঠখড় পোড়াতে হবে না। মানে, ওখানকার সিকিউরিটি একেবারে নিশ্ছিদ্র নয়।'

সমরেশ জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, অন্য যে কারখানাগুলোতে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে, সেখানেও কি সিকিউরিটির এইরকম অবস্থা?'

শিবেন বলল, 'হ্যাঁ, অল্পবিস্তর এরকমই। তা ছাড়া, সিকিউরিটি ব্যাপারটা একেবারে নিশ্ছিদ্র হতেও পারে না। চুরিচামারি হয়তো বেশ কিছুটা আটকাতে পারে, কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে যদি কেউ কারখানার ক্ষতি করতে চায়, তাহলে তাকে শেষপর্যন্ত ঠেকাতে পারে না।'

দময়ন্তী বলল, 'বুঝতে পেরেছি।' বলে চুপ করে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। খানিক বাদে যেন সম্বিত ফিরে পেয়ে বলল, 'অলোকনাথ আর অতীন্দ্রনাথ সম্পর্কে গোপনে যা যা খবরাখবর সংগ্রহ করা সম্ভব, সেটা করা যাবে কি?'

শিবেন বলল, 'যাবে। কত দিন সময় নেবেন?'

'সাত দিন।'

'ঠিক আছে।'

'আর একটা কথা। অতীন্দ্রনাথের কোনো গার্লফ্রেন্ড আছে কিনা সে সম্পর্কে বিশেষভাবে খোঁজ নেওয়া দরকার। থাকলে, তার সম্পর্কেও যাবতীয় সংবাদ সংগ্রহ করতে হবে।'

'অতীন্দ্রনাথের যে বিবরণ তার ঠাকুরদা দিয়েছেন, তাতে তার একাধিক গার্লফ্রেন্ড থাকাই সম্ভব বলে মনে হয়।'

'তা যদি থাকে, তাহলে তাদের সকলের সম্পর্কেই খোঁজখবর নেওয়া দরকার।'

শিবেন এল সাত দিন বাদে, সন্ধ্যেবেলা। হাতে একটা পেটমোটা ফাইল। সোফায় বসে সেই ফাইল খুলতে খুলতে বলল, 'খবর অনেক কিছুই পাওয়া গেল বউদি, কিন্তু কোনোটাই তেমন জোরদার বলে মনে হচ্ছে না।'

দময়ন্তী বলল, 'খবরগুলো শোনা তো যাক, তারপর দেখা যাবে তারা জোরদার কি জোরদার নয়।'

শিবেন বলল, 'বেশ, তাহলে শুরু করি? প্রথম, অলোকনাথ ঘোষাল। এঁর ছাত্রজীবনের কথা আমরা অশোকনাথের মুখেই শুনেছি। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে হোয়াইট স্টারে কর্মজীবন শুরু করেন। এককালে ঘোর বামপন্থী ছিলেন, লেবার ইউনিয়নের অফিস বেয়ারাও ছিলেন। কিন্তু কাজের দিক দিয়ে কখনো ফাঁকি ছিল না। ফলে, কর্মজীবনে ক্রমাগত উন্নতি হয়ে গিয়েছে। হোয়াইট স্টারের লেবার ইউনিয়নের সঙ্গে সম্প্রতি ওঁর

সম্পর্কের অবনতি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু কয়েকজন শ্রমিক এবং শ্রমিক নেতার সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, অলোকনাথকে মনে মনে এখনও অনেকেই অশ্রদ্ধা বা অবিশ্বাস না করারই পক্ষপাতি।'

সমরেশ জিজ্ঞেস করল, 'ভদ্রলোক কি এখনও রাজনীতি করেন নাকি?'

'না। প্রত্যক্ষ রাজনীতি করার তো প্রশ্নই ওঠে না। তবে, শুনলুম, এখনও নাকি বেশ বামঘেঁষা। তা সে যাই হোক, ভদ্রলোক বিয়ে করেছিলেন তাঁর বাবার অমতে আজ থেকে বছর ছাব্বিশ আগে। স্ত্রী ছিলেন রাজনৈতিক কর্মী, ছাত্রজীবনে দু-বার জেলও খেটে এসেছেন। আপনি হয়তো তাঁর প্রাকবিবাহ নাম শুনেও থাকতে পারেন। তিনি তপতী গোস্বামী।'

দময়ন্তী বলল, 'না, তপতী গোস্বামীর নাম শুনেছি বলে মনে হচ্ছে না। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর আগে রাজনীতি করতেন যাঁরা, খুব বিখ্যাত না হলে তাঁদের নাম শুনে থাকলেও মনে রাখা সম্ভব নয়।'

'তা যা বলেছেন। তপতী গোস্বামী কোনোদিনই একেবারে সামনের সারির নেতা ছিলেন না। তবে, রাজনৈতিক কাজকর্ম করতেন। ওঁর বাবা কিন্তু এককালে খুব নামকরা লোক ছিলেন। মন্মনাথ গোস্বামীর নাম শুনেছেন?'

'কোন মন্মথনাথ গোস্বামী? সংগীতাচার্য?'

'হ্যাঁ, উনিই। ওঁর দুই মেয়ে। তপতী আর প্রণতি। প্রণতি আজ বিয়ের পর প্রণতি উকিল হয়েছেন। উনিও গান করেন। টপ্পা আর ঠুংরিতে প্রণতি উকিলের নাম বড়ো কম নয়। রেকর্ড যদিও বেশি নেই।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, প্রণতি উকিলের নাম আমরা সবাই জানি।' বলল সমরেশ, 'গত বছর পূর্ব কলকাতা সংগীত সম্মেলনে হোরি আর কাজরী গেয়ে আসর মাত করে দিয়েছিলেন। তার পরেই ছিল ওস্তাদ দাউদ জৌনপুরির সরোদ। তিনি তো রেগে কাঁই।'

শিবেন হাত নেড়ে বলল, 'ব্যস! ওই পর্যন্ত।'

দময়ন্তী বলল, 'অনুও খুব ভালো গায়। আমাদের কলেজের সব ফাংশনে ওর গান থাকবেই। বুঝতে পারছি, গান ব্যাপারটা ওর রক্তে আছে। কিন্তু, অশোকনাথ যে বলেছিলেন যে তাঁর পুত্রবধূ নিরক্ষর, কদাকার, বস্তিতে বড়ো হয়ে ওঠা, ওঁর বাড়িতে ঢোকার অনুপযুক্ত, সেটা কী ব্যাপার?'

'নিরক্ষর মানে আই এ পাশ। রাজনীতি করতে গিয়ে বি এ-টা পাশ করে ওঠা হয়নি। তার ওপর তপতী পড়াশুনো করেছেন শ্যামবাজারের এক গার্লস হাই স্কুলে, কোনো কনভেন্টে নয়। কিন্তু, ম্যাট্রিকে মেয়েদের মধ্যে তৃতীয় হয়েছিলেন। অতএব অশোকনাথের কাছে যে ইনি নিরক্ষর হবেন, তাতে আর আশ্চর্য কী? কদাকার? চেহারা দেখিনি, বলতে পারব না। বস্তিতে মানুষ? সেটা মিথ্যে নয়, অন্তত অশোকনাথের স্ট্যান্ডার্ডে। সংগীতাচার্য মন্মথনাথ সারা জীবন গানের মধ্যে ডুবে থেকেছেন। টাকা রোজগার করাটাই জীবনের চরম এবং পরম লক্ষ্য— এই ধারণাটাই তাঁর ছিল না। তা ছাড়া, সে যুগে স্রেফ সংগীতসাধনা করে একটা ভয়ঙ্কর ধরনের অর্থোপার্জন করার কোনো সম্ভাবনাও ছিল না। তবু বলব, খুব একটা দারিদ্র্যের মধ্যেও বোধ হয় ছিলেন না। বাড়ি ছিল বাগবাজারের অনুকূল বড়াল লেনে। পাড়াটা মধ্যবিত্ত ভদ্র এলাকা। আর একটা কথা। এই অনুকূল বড়াল লেন বেরিয়েছে বিপ্লবী উমেশ দত্ত সরণী থেকে।

দময়ন্তী মৃদু হাসল। বলল, 'বুঝেছি। তারপর বলুন।'

'এরপর আসছে অতীন্দ্রনাথ। অশোকনাথের কাছে সে অত্যন্ত ইন্টেলিজেন্ট হতে পারে, কিন্তু লেখাপড়ায় কখনোই খুব একটা ভালো রেজাল্ট করেনি। বরং, কোনোরকমে টেনেটুনে পাশ করেছে। স্কুলে তো এক বছর ফেলই করেছিল। কিন্তু, খেলাধুলায় এক্সপার্ট। সে টেনিসে ইউনিভার্সিটি ব্লু, এ বছর স্টেট রেপ্রেসেন্ট করতে পারে। তা ছাড়া, রোয়িং-এ খুব ভালো। ফার্স্ট ডিভিশনে ক্রিকেট খেলে। কন্দর্পকান্তি চেহারা। কেবল একটা দোষ আছে। ভয়ানক মাথাগরম ছেলে— অ্যাংরি ইয়ংম্যান বলতে যা বোঝায়। ভুরু দুটো কুঁচকেই আছে, কটা বাজে জিজ্ঞেস করতেও ভয় হয়। একটা সাড়ে তিন হর্স পাওয়ারের মোটর সাইকেল আছে, সেইটে নিয়ে বেপরোয়াভাবে ঘুরে বেড়ায়। কেবল, একটা সময় ছাড়া।'

'কোন সময়? যখন ওর সঙ্গে ওর গার্লফ্রেন্ড থাকে?'

'হ্যাঁ, একদম ঠিক ধরেছেন। ছেলেটার মুখের রেখাগুলো তখন নরম হয়ে আসে, মুখে হাসি ফোটে। পার্ক স্ট্রিটের একটা রেস্টুরেন্টে ছোকরাকে একদিন দেখেছি, সঙ্গে মেয়েটি ছিল। রীতিমতো হা হা করে হাসছিল।'

'একজনই গার্লফ্রেন্ড, না একাধিক?'

'ছেলেটির চরিত্র সেদিক দিয়ে ভালো। কো-:এডুকেশন কলেজে পড়েছে, কাজেই অনেক বান্ধবী থাকাই সম্ভব। কিন্তু যাকে দেখলে ছোকরা খুশি হয়ে ওঠে, সে একজনই।'

'এই একজন সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছেন?'

'নিয়েছি। কিন্তু, আপনার কি সত্যি মনে হয় যে এ মেয়েটি এই ঘটনার সঙ্গে কোনোভাবে জড়িত থাকতে পারে? নাকি বিশুদ্ধ সার সে লা ফ্যম থিয়োরি চালাচ্ছেন।'

'পরে বলব। আগে মেয়েটির বিষয়ে বলুন।'

শিবেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'মেয়েটির নাম বৈদেহী চ্যাটার্জি। বাবা নামকরা ডেন্টিস্ট, ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি! বাড়ি জাস্টিস শশিশেখর মিত্র রোডে। আপাতত বি এ পড়ছে, সেন্ট লুসিয়া কলেজে, অঙ্কে অনার্স।'

'দেখতে কেমন?'

‘তেমন আহা মরি কিছু নয়, তবে মোটের ওপর ভালো দেখতে। রোগাপটকা, চোখে চশমা— যেমন হয় আর কী।’

‘এই বৈদেহীর সঙ্গে অতীন্দ্রনাথের পরিচয় হল কী করে?’

‘জানা যায়নি।’

অতীন্দ্রনাথের মামাতো ভাইয়ের খবর নিয়েছেন? যাঁর কথা অশোকনাথ বলেছিলেন?’

‘নিয়েছি। সে তার পিসেমশাইয়ের বাড়িতেই থাকে। জুয়েল ছেলে। লেখাপড়ায় ব্রিলিয়ান্ট, চাকরিতেও শুনেছি উন্নতি করছে। নাম পবিত্র চক্রবর্তী। মিসেস ঘোষালের মাসতুতো ভাইয়ের ছেলে। সেই ভাই অনেকদিন মারা গেছেন। ভাইয়ের স্ত্রী কোথায় আছেন জানি না, খুব সম্ভবত তিনিও বেঁচে নেই। ছেলেটির মেরিট দেখে অলোকনাথ তাকে ছেলেবেলা থেকেই নিজের ছেলের মতো করে মানুষ করেছেন এবং অশোকনাথের কথা যদি ঠিক হয়, তাহলে বলতে হবে, নিজের ছেলের চেয়ে একেই উনি বেশি ভালোবাসেন। আর সেটা খুব অস্বাভাবিক নয়। চালচলনে কথাবার্তায় এর পাশে অতীন্দ্রনাথকে বখাটে বলেই মনে হয়। পবিত্র চক্রবর্তী সার্থকনামা ছেলে।’

সমরেশ বলল, ‘একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?’

‘একটু যে যাচ্ছে না, তা নয়। কিন্তু, ছেলেটিকে দেখলে আর তার সঙ্গে কথা বললে, তোরও বাড়াবাড়ি করতে ইচ্ছে করবে!’

দময়ন্তী বলল, ‘অশোকনাথ বলেছিলেন যে এরা দুই ভাই সহকর্মী...’

‘হ্যাঁ, এরা দুজনেই হোয়াইট স্টারে আছে। ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি। অতীন্দ্রনাথ পার্সোনেলে আর পবিত্র কোয়ালিটি কন্ট্রোলে।’

সমরেশ বলল, ‘কোয়ালিটি কন্ট্রোলে? তার মানে পবিত্র ইঞ্জিনিয়ার?’

‘হ্যাঁ। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। তার পিসেমশাইয়ের মতো।’

দময়ন্তী জিজ্ঞেস করল, ‘পার্সোনেলে কী করতে হয়?’

‘পার্সোনেলে, মানে হোয়াইট স্টারে যারা চাকরি করেন, তাদের সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য জানতে হয়, তাদের দেখভাল করতে হয়, তাদের বদলি, উন্নতি বা অবনতি, শাস্তি বা পুরস্কার, ছুটিছাটা, ছাঁটাই বা নতুন লোক ঢোকানো ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হয়।’

‘আর কোয়ালিটি কন্ট্রোলে?’

সমরেশ বলল, ‘আমি বলছি। কোয়ালিটি কন্ট্রোলে কোয়ালিটি কন্ট্রোল করতে হয়। অর্থাৎ, যে মাল বাজারে বেরুচ্ছে সেটা সঠিক মানের হল কিনা সেটা দেখতে হয়, মাল নীচু মানের হলে সেটা বাদ দিতে হয়।’

‘কোন কাজটা বেশি কঠিন?’

‘দুটোই সমান কঠিন।’

‘কোন কাজে ফ্যাক্টরির ভেতরে ঘুরে বেড়াতে হয়?’

‘দুটোতেই হয়।’

দময়ন্তী হঠাৎ খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল। বলল, ‘দুটোতেই হয়, না?’ বলে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর জিজ্ঞেস করল, ম্যানেজমেন্টে ট্রেনিরা কি ফ্যাক্টরিতে থাকে, না হেড অফিসে বসে?’

শিবেন বলল, ‘হেড অফিসে। প্রয়োজনে ফ্যাক্টরিতে যায়।’

‘বৈদেহী চ্যাটার্জির সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার। যত শিগগির সম্ভব।’

‘দেখছি। পরশু একটা ছুটির দিন আছে। সেদিন চেষ্টা করা যাবে। ডাক্তার চ্যাটার্জিকে কিছু বলব? না, তাঁকে না জানিয়ে ব্যবস্থা করব?’

‘আপাতত না জানিয়ে ব্যবস্থা করুন।’

‘বেশ, তাই করা যাবে।’

‘আর একটা কথা। বৈদেহীর সঙ্গে যেদিন দেখা হবে, তার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ক্যামাক স্ট্রিটে হোয়াইট স্টারের হেড অফিসে অলোকনাথের সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করতে হবে। পারবেন?’

‘চেষ্টা করে দেখব।’

বৈদেহী এল বিকেলের দিকে। শিবেন আর রমলা আগে থেকেই এসে বসেছিল। দেখা গেল, মেয়েটি বেশ সাদাসিধে, যেমনটি শিবেন বলেছিল। ফ্যাশনের মধ্যে চোখে একজোড়া মস্ত স্টিলফ্রেমের চশমা। তবে, মেয়েটির বড়ো বড়ো চোখ আর শান্ত নির্বিরোধ মুখে এমন একটা কিছু আছে যা মনকে খুশি করে তোলে।

দময়ন্তী হাসি মুখে তাকে অভ্যর্থনা করল, সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। বলল, ‘বাড়ি খুঁজে পেতে কোনো অসুবিধে হয়নি তো?’

বৈদেহী মাথা নেড়ে বলল, ‘না, না, কোনো অসুবিধে হয়নি। শিবেনবাবু এমন সুন্দর ডিরেকশন দিয়ে দিয়েছিলেন যে বাড়ি ভুল করার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না।’

‘শিবেনবাবু তোমার এখানে আসাটা গোপন রাখতে বলেছিলেন?’

‘হ্যাঁ, আমি কাউকে বলিনি। বাড়িতে বলে এসেছি, বন্ধুর বাড়িতে যাচ্ছি। বলে হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছি। আমাদের বাড়ি থেকে এ বাড়ি তো খুব দূর নয়।’

‘না, তা নয়। আচ্ছা, তুমি তো জানো যে শিবেনবাবু পুলিশের লোক। আমি কে জানো?’

বৈদেহী ঘাড় কাত করে বলল, ‘হ্যাঁ, জানি। অনিন্দিতা আমাকে বলেছে।’

‘আমি তোমাকে কেন ডেকেছি, জানো?’

এইবার বৈদেহীর মুখে একটা কালো ছায়া নামল। বলল, ‘ঠিক জানি না। তবে, অনুমান করতে পারি।’

‘কেন বলো তো?’

‘অতীনের সম্পর্কে আমার সঙ্গে কথা বলতে চান তো? আমাকে বলবেন যে সে একজন ক্রিমিন্যাল, একজন ভয়ানক খারাপ লোক। আমার উচিত তার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করা, তার মুখ না দেখা। অতীনের বাবা যা পারেননি, আপনি সেটাই করবেন। আপনি ভাবছেন যে যেহেতু আপনি ডিটেকটিভ, ক্রিমিন্যালদের নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেন, অতএব আপনি যা বলবেন আমি তা বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নেব। আমি অনুর কাছে শুনেছি আপনার সম্পর্কে অনেক কথা। আমি বিশ্বাস করি আপনি টাকা নিয়ে এত বড়ো মিথ্যেটা আমার সামনে সত্যি বলে প্রমাণ করবার চেষ্টা করবেন না। কিন্তু, আপনাকে অতীনের বাবা কী বলেছেন আমি জানি না, তবে আপনি যদি সেগুলো বিশ্বাস করে থাকেন, তাহলে সেটা মস্ত ভুল। সে কথাগুলো সব মিথ্যে, বিশ্বাস করুন, সব মিথ্যে কথা। উনি আমার বাবাকে বলে আমাকে অতীনের জীবন থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু, আমার বাবা আমাকে বিশ্বাস করেছেন। আপনাকেও করতে হবে।’ বলতে বলতে বৈদেহীর গলা আটকে গেল। কান্না আটকানোর আপ্রাণ চেষ্টায় মুখে রুমাল গুঁজে বসে রইল ঠিকই, কিন্তু দু-চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ে যেতে থাকল।

মেয়েটির মুখে কথা শুনে ঘরের বাকি চারজন স্তম্ভিত বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে বসে রইল। বেশ কিছুক্ষণ বাদে দময়ন্তী বিষণ্ণ গলায় বলল, ‘তোমার ধারণা ভুল, বৈদেহী। আমার বিশ্বাস অতীনের পরিবারের সামনে ভয়ঙ্কর বিপদ। তোমাকে ডেকেছি, কীভাবে সেই বিপদ থেকে তাদের উদ্ধার করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ করবার জন্যে।’

দময়ন্তীর কথায় বৈদেহীর বিশেষ কোনো ভাবান্তর হল না। নতনেত্রে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলল, ‘আমি আপনাকে কি পরামর্শ দেব? আপনি ঠাট্টা করছেন আমাকে? আপনি ওর বাবাকে বলুন, ওর মাকে বলুন।’

‘তুমি বিশ্বাস কর বৈদেহী, আমি ওর বাবাকেও চিনি না, মাকেও চিনি না। তাঁদের সঙ্গে আমার কখনো কোনোরকমভাবে যোগাযোগ হয়নি। আচ্ছা, তোমার কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে যে অতীনের সঙ্গে তার বাবার সম্পর্ক ভালো নয়, কেন?’

‘তা, আমিও ঠিক জানি না। উনি অতীনকে দু-চক্ষে দেখতে পারেন না। খালি বলেন, আমার ছেলেটা খারাপ, নষ্ট হয়ে গেছে, ক্রিমিন্যাল হয়ে গেছে। অথচ, কী খারাপ কাজ যে অতীন করেছে, তা আমি আজও জানতে পারিনি। তবে হ্যাঁ, উনি যেরকম চেয়েছিলেন, অতীন সেরকম হয়নি। উনি চেয়েছিলেন অতীন হবে আদর্শবাদী, দেশপ্রেমিক, প্লেন লিভিং অ্যান্ড হাই থিঙ্কিং ইত্যাদি। তার বদলে, সে হয়েছে বহির্মুখী,

ফুর্তিবাজ। সবসময় গোমড়া মুখে ঘরের কোণায় বসে অনবরত সমস্যা নিয়ে চিন্তা না করে, সে জীবনকে উপভোগ করতে চায়— এই বোধ হয় তার অপরাধ।'

'অতীনের মারও কি এইরকমই মনোভাব?'

'না। উনি আছেন বলেই অতীন বেঁচে আছে। উনি যদি ওকে সবসময়ে আগলে না রাখতেন, তাহলে ওকে বোধ হয় এতদিনে রাস্তায় দাঁড়াতে হত।'

'তুমি যে বললে, অতীন ফুর্তি করতে ভালোবাসে, জীবনকে উপভোগ করতে চায়, তাতে তো অনেক টাকা লাগে। অতীন কি সে টাকা রোজগার করে?'

'না, তা করে না। তবে, ও কখনো টাকা ওড়ায় না। যদি টাকায় কিছু কম পড়ে, তাহলে ওর মা লুকিয়ে টাকা দেন। ওর ঠাকুরদাও দেন। জানেন, ওর টেনিস র‍্যাকেট কিনে দিয়েছেন ওর ঠাকুরদা, রোয়িং ক্লাবের চাঁদার টাকা দেন ওর মা। ওর বাবা হলে এক পয়সাও দিতেন না। অথচ, আগামী বছর ও যাচ্ছে টেনিসে স্টেট রেপ্রেজেন্ট করতে। ওর বাবা ওর খেলাধুলো করাটাও পছন্দ করেন না। কিছুই পছন্দ করেন না।'

'ওঁর আদর্শ বোধ হয় অতীনের মামাতো ভাই পবিত্র, তাই না?'

বৈদেহী বিস্ফারিত চোখে বলল, 'ঠিক বলেছেন। উঃ, ওটাকে আমি সহ্য করতে পারি না। সারা বিশ্বের সমস্ত দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে কেবল জাবর কাটতে পারেন। অথচ জিজ্ঞেস করুন বিয়ন বর্গ কে অথবা এ বছর মোহনবাগানের ক্যাপ্টেনের নাম কী— হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে। এসব ওঁর কাছে তুচ্ছ ব্যাপার।'

'মোহনবাগান তুচ্ছ ব্যাপার?' সমরেশ হাঁইমাই করে লাফিয়ে উঠল, 'এ লোকটা তো মানুষ খুন করতে পারে দেখছি।'

এতক্ষণে বৈদেহীর মুখে হাসি ফুটল। 'তা যা বলেছেন।'

দময়ন্তী একটু ভেবে প্রশ্ন করল, 'তুমি এই পরিবারের সবাইকে কতটা চেন? খুব ঘনিষ্ঠভাবে চেন কি?'

বৈদেহী মাথা নাড়ল। বলল, 'খুব যে একটা ঘনিষ্ঠভাবে চিনি তা নয়, তবে ওদের বাড়িতে ছোটোবেলা থেকেই যাই আর কী! আসলে আমার মা আর অতীনের মা বন্ধু, মাঝে মাঝে পরস্পরের বাড়িতে যাতায়াত হয়। অতীনের বাবাকে ছেলেবেলা থেকেই এড়িয়ে চলি। বাকি সকলের সঙ্গে সম্পর্ক ভালোই।'

দময়ন্তী মৃদু হাসল। বলল, 'তা তো বুঝতেই পারছি। আচ্ছা, আর একটা প্রশ্ন। অতীনের বাবার স্বাস্থ্য কেমন?'

'ভালো নয়। গত বছর একটা হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে। এখন খুব সাবধানে থাকেন। উত্তেজনা ওঁর পক্ষে এখন খুব ক্ষতিকারক।'

রমলা বলল, 'মেয়েটি ভারি মিষ্টি। কিন্তু, অতীন ছেলেটি খুব সুবিধের বলে মনে হল না। যার বাবা তাকে উন্মার্গগামী বলে মনে করে, তার সঙ্গে তোর মেলামেশা করার দরকারটা কি?'

শিবেন বলল, 'এঃ, উন্মার্গগামী! ভালো ভালো বাংলা বলা হচ্ছে! নিজের কথা ভুলে গেলে? তোমার বাবা তো আমাকে উন্মার্গগামী তো কম কথা, একেবারে নরকের কীট বলে ভাবতেন। পুলিশ, তার মানে নিশ্চয়ই ঘুস খায়, নিশ্চয়ই দুশ্চরিত্র। কিন্তু, তাতে কি

আমার সঙ্গে মেলামেশা সব বন্ধ করেছিলে তুমি? এসব হচ্ছে ভালোবাসার ব্যাপার, বুঝেছো?'

সমরেশ হাত নেড়ে বলল, 'ধুত্তোর ভালোবাসা! রমলা তো ঠিকই বলেছে। অতীনকে খারাপ ছেলে বলে সার্টিফিকেট দিচ্ছেন তার বাবা, তোকে তো আর তোর বাবা নরকের কীট বলেননি। বাপ নিজের ছেলেকে চিনতে ভুল করবেন না, অন্যের ছেলেকে করতে পারেন।'

শিবেন বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আর লেকচার দিতে হবে না। আপনি বলুন তো বউদি, কতদূর কী বুঝলেন?'

দময়ন্তী বলল, 'সবটা বুঝেছি তা নয়। তবে একটা ছবি ফুটে উঠছে। কেবল একটা বিষয়ে জানা দরকার, তাহলেই সব সন্দেহের নিরসন হয়।'

'কী বিষয়ে?'

'যে চারটে কোম্পানিতে বিস্ফোরণ ঘটেছে, তাদের পরস্পরের মধ্যে কোনো ব্যবসায়িক সম্পর্ক আছে কিনা। অর্থাৎ, সুপ্রিম সেরামিক্স, ডায়মন্ড গ্লাস, গ্লোব ইনসুলেটারস আর হোয়াইট স্টার— এরা পরস্পরকে মাল সাপ্লাই করে কিনা। করলে, তার কোনো বিশেষ পদ্ধতি আছে কিনা।'

'বেশ, এ খবরটা কাল পাবেন। কাল মিস্টার সুজিত নন্দীর সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে— অন্য ব্যাপারে— তখনই ব্যাপারটা জেনে নেওয়া যাবে। তা ছাড়া, কাল বিকেল চারটের সময় আমরা হোয়াইট স্টারের হেড অফিসে যাচ্ছি। সমরেশ অফিস থেকে এক ঘণ্টার ছুটি নিয়ে রাখিস, আমি বউদিকে কলেজ থেকে তুলে নিয়ে তোর অফিসে চলে যাব। তারপর সেখান থেকে ক্যামাক স্ট্রিট তো কয়েক মিনিটের রাস্তা।'

সমরেশ গাড়িতে উঠে বলল, 'মনে হচ্ছে, রহস্যের সমাধান হয়ে গেছে।'

শিবেন বলল, 'কী করে বুঝলি?'

'কাল রাত দেড়টার সময় একবার ঘুম ভাঙল। দেখি দময়ন্তী প্যাট প্যাট করে ছাদের দিকে তাকিয়ে শুয়ে আছে। ঘণ্টাখানেক বাদে আবার ঘুম ভাঙল। দেখি তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। অর্থাৎ, দেড়টা থেকে আড়াইটের মধ্যে...'

'সমাধান পাওয়া গেছে— সত্যি নাকি বউদি? বোমাবাজকে ধরে ফেলেছেন?'

দময়ন্তী সজোরে মাথা নেড়ে বলল, 'না, না, বোমাবাজকে ধরতে পারিনি। তবে ব্যাপারটা কী ঘটছে এবং কেন ঘটছে, সেটা বোধ হয় বুঝতে পেরেছি।'

'তবে তো বোমাবাজকে ধরে ফেলার আর বেশি দেরি থাকা উচিত নয়। অতীনকে কিন্তু আমার বিশেষ সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না। বাপের সঙ্গে যার এত শত্রুতা, তার পক্ষে এভাবে প্রতিহিংসা নেওয়াটা অসম্ভব নয়।'

'তা হয়তো নয়। তবে, আমার ধারণা অন্যরকম। বললুম তো, বোমাবাজটি যে কে তা এখনও পুরোটা বুঝে উঠতে পারিনি। কিন্তু, আমি যে একটি খবর চেয়েছিলুম, তার কি হল?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেটাই তো আপনাকে বলা হয়নি। যে চারটে কোম্পানির কথা আপনি বললেন, তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়িক সম্পর্ক আছে। সুপ্রিম সেরামিক্স, গ্লোব

ইনসুলেটারস আর ডায়মন্ড গ্লাস, প্রত্যেকেই হোয়াইট স্টারকে মাল সাপ্লাই করে থাকে। এদের সকলেরই পুরোনো বাঁধা খদ্দের হল হোয়াইট স্টার।'

দময়ন্তী বলল, 'আমি ঠিক এটাই আশা করছিলুম।' বলে স্থির দৃষ্টিতে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। শিবেনের গাড়ি ক্যামাক স্ট্রিটে ঢুকল।

অলোকনাথ ঘোষালের সঙ্গে তাঁর বাবা অশোকনাথের প্রবল সাদৃশ্য। একই ধরনের রোগাটে চেহারা, ফর্সা গায়ের রং, পাতলা ঠোঁট, তীক্ষ্ন নাক, ছোটো ছোটো করে ছাঁটা কাঁচা-পাকা চুল, সজাগ তীক্ষ্ন চোখ। মস্ত টেবিলের ওপাশে ভদ্রলোকের শরীরের অধিকাংশই অদৃশ্য, কেবল সাদা শার্টের খানিকটা আর একটা নীল সাদার ডোরাকাটা টাই দৃশ্যমান।

অনেকে আছেন, যাঁদের ঘরে ঢুকলে অতিথিরা তাঁদের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েন। সেরকম শঙ্কা-জাগানো ব্যক্তিত্ব অলোকনাথের নয়। প্রথমত, ঘরে ঢুকে তাঁকে তো রীতিমতো যেন খুঁজে নিতে হয়। দ্বিতীয়ত, ঘরের দেওয়ালে একগাদা গ্রাফ, চার্ট আর বড়ো বড়ো ফ্যাক্টরির বাঁধানো ছবির বদলে একটা হাল্কা নীল রঙের নিরাভরণ শূন্যতা প্রীতিপদ বলেই মনে হয়। তৃতীয়ত, ভদ্রালোকের শান্ত, মার্জিত এবং অনুচ্চ কণ্ঠস্বর শ্রোতাকে শশব্যস্ত করে তোলে না। তবে, সেইসঙ্গে তার কথা বলার ভঙ্গি এতই শীতল এবং ধারালো যে যত তাড়াতাড়ি তাঁর সামনে থেকে সরে যাওয়া যায়, ততই শ্রেয় বলে মনে হয়। আর, আর একটা কথা বলে রাখা ভালো যে অলোকনাথকে কেউ কোনোদিন হাসতে দেখেনি এবং তাঁকে হাসানোর প্রচণ্ড দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা দু-একজন অতীতে করে থাকলেও কখনোই তা সফল হয়নি। তার ফলে, এমনিতেই এয়ারকন্ডিশনড তাঁর ঘরে ঢুকে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে একেবারে উত্তর মেরুর মধ্যিখানে এসে উপস্থিত হয়েছি।

প্রাথমিক ভদ্রতা বিনিময়ের পর অলোকনাথ চোখের সামনে একটা লাল কালোয় ডোরাকাটা পেন্সিল ধরে প্রশ্ন করলেন, 'আমি আপনাদের কীভাবে সাহায্য করতে পারি?'

দময়ন্তী বলল, 'আমি কেন এসেছি, আপনি তা জানেন নিশ্চয়ই?'

'জানি। শুনেছি আপনি বালিটিকুরির ডিসিলভাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। এখন আমার কাছে কী জানতে চান, বলুন?'

'আপনি কি জানেন যে বালিটিকুরির ফ্যাক্টরিত যে বিস্ফোরণ ঘটে, সেরকম ব্যাপার এর আগে অন্য কয়েকটা ফ্যাক্টরিতেও হয়েছে?'

'হয়ে থাকতে পারে। এরকম ব্যাপার একেবারেই বিরল নয়। কিন্তু, অন্য কোনো ফ্যাক্টরিতে যদি এইরকম ঘটনা ঘটেও থাকে, তাহলে তার সঙ্গে আমাদের ঘটনাটার সম্পর্ক কোথায়? এবং, এ ব্যাপারে আমার কিছু জানা বা না জানায় আপনাদের তদন্তের কী এসে যায়?' অলোকনাথের দৃষ্টি তখনও পেন্সিলে।

'এসে যায়, মিস্টার ঘোষাল। গত এক বছরে আপনার ফ্যাক্টরি ছাড়াও আরও তিন জায়গায় এই একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। এই চারটে ঘটনার মধ্যে সাদৃশ্য এতই বেশি যে সেটাকে ঠিক কাকতালীয় বলে ধরে নিতে অসুবিধে হচ্ছে। আপনারা ছাড়া অন্য তিনটে সংস্থা হচ্ছে ডায়মন্ড গ্লাস ওয়ার্কস লিমিটেড, গ্লোব ইনসুলেটরস লিমিটেড এবং

সুপ্রিম সেরামিক্স লিমিটেড।' বলে দময়ন্তী চুপ করল, যেন কোনো প্রশ্ন করে না থাকলেও অলোকনাথের কাছ থেকে কোনো মন্তব্য আশা করছিল।

অলোকনাথের দৃষ্টি পেন্সিল থেকে উঠে দময়ন্তীর মুখের ওপর পড়ল। প্রায় অশ্রুত কণ্ঠে বললেন, 'এসব জায়গায় বোমাবাজি হয়েছে বলে জানি, কিন্তু এটা আমার জানা ছিল না যে চারটে ঘটনাই একেবারে একরকম।'

দময়ন্তী বলল, 'হ্যাঁ। এ ছাড়া সাদৃশ্য আরও আছে। চারটে সংস্থাই অতীতে বিদেশি মালিকানায় ছিল, চারটেরই আর্থিক অবস্থা আজ বেশ খারাপ, চারজনই পরস্পর পরস্পরকে তাদের মাল সরবরাহ করে থাকে, চারটে কোম্পানিরই ডিরেক্টর বোর্ডে একজন করে মিস্টার এ এন ঘোষাল আছেন।' বলে দময়ন্তী আবার চুপ করে গেল।

অলোকনাথ কিছুক্ষণ নিষ্পলক চোখে দময়ন্তীর দিকে তাকিয়ে থেকে অতি সামান্য উঁচুগলায় বললেন, 'এই এ এন ঘোষালরা একই লোক নন।'

'আমি জানি। এবং এও জানি যে তাঁরা একই পরিবারভুক্ত। তা ছাড়া মিস্টার ঘোষাল, সাদৃশ্য আরও আছে। এই চারটে কোম্পানিরই শেয়ার বাজারে শেয়ারের দাম ক্রমাগত পড়ে যাচ্ছে এবং গত আর্থিক বছরের শেষে চারজনেই ঘোষণা করেছিল যে পৃথক পৃথকভাবে তারা বড়ো অর্ডার পেয়েছে যাতে তাদের অবস্থার উন্নতি হতে পারে। এর মধ্যে আপনি কি কোনো পদ্ধতি দেখতে পাচ্ছেন?'

অলোকনাথের দৃষ্টি আবার পেন্সিলে ফিরে গেল। বললেন, 'এখনও নয়। আপনি যে কী বলতে চাইছেন, আমি এখনও বুঝতে পারছি না।'

দময়ন্তী মৃদু হাসল। বলল, 'মিস্টার ঘোষাল, আপনার কি মনে হয় না যে এই সাবোটাজগুলির উদ্দেশ্য একটাই— যেন এই কোম্পানিগুলোর উন্নতি না হতে পারে?'

অলোকনাথ হিমশীতল গলায় বললেন, 'তা তো বটেই। কারুর উন্নতি করার জন্যে কেউ তো তার কারখানায় বোমা মারে না। আর কোম্পানিগুলোর সাদৃশ্যের মধ্যে আপনি এ এন ঘোষালদের কথা বললেন। আপনার কি ধারণা যে এই কারখানাগুলোর ক্ষতি করার জন্যে তাঁরা কেবল বোমা মেরে বেড়াচ্ছেন? তাতে কার লাভ?'

'আমার ধারণার কথা আমি পরে বলব, মিস্টার ঘোষাল। তার আগে আমি জানতে চাই, আপনি কি এই চারটে সংস্থারই শেয়ারহোল্ডার বা অংশীদার?'

হঠাৎ অলোকনাথের মুখে একটা অস্বস্তির ছায়া পড়ল। বললেন, 'এখন আর নয়, আগে ছিলুম।'

'শেয়ারগুলো কি বিক্রি করে দিয়েছেন?'

'না, আমার স্ত্রী আর মেয়ের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছি অনেক দিন আগে। নিজের কাছে হোয়াইট স্টারের সামান্য কয়েকটা আছে।'

'চারটে কোম্পানির শেয়ারই এইভাবে দিয়ে দিয়েছেন?'

'কেবল চারটে কেন? আরও অনেক কোম্পানির শেয়ার ছিল, সেগুলোও দিয়ে দিয়েছি।'

'ছেলেকে দেননি?'

'না। এবং দয়া করে কেন দিইনি সেকথা জিজ্ঞেস করবেন না।'

‘না, তা করব না। আচ্ছা, মিস্টার অশোকনাথ ঘোষালের এই চারটে কোম্পানির শেয়ার আছে কিনা আপনি জানেন?’

‘জানি। উনি এদের সকলেরই অংশীদার ছিলেন।’

‘ইনিও ছিলেন? এখন আর নেই?’

‘না। আমি আমার স্ত্রী আর মেয়েকে আমার শেয়ারগুলো দিয়ে দেবার পর উনি জিদ করে এবং আমার প্রতি ওঁর রাগের বশে ওঁর শেয়ারগুলো আমার ছেলেকে দান করে দেন।’

‘আপনি তো আপনার শেয়ার দান করেছেন সম্পত্তি কর বাঁচানোর জন্যে, অশোকনাথ দান করতে গেলেন কেন? স্রেফ আপনার প্রতি রাগের বশে?’

অলোকনাথের মুখে হঠাৎ এক ঝলক রক্ত উঠে এল। তবে সেটা এক লহমার জন্যে। তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, ‘হ্যাঁ, এবং আমার ছেলের প্রতি অযৌক্তিক অন্ধ স্নেহের বশে।’

‘বেশ। তার মানে আজকে কোনো এ এন ঘোষালই এই কোম্পানিগুলোর অংশীদার নন?’

‘না।’ এইবার অলোকনাথের গলাটা সামান্য উঠল, ‘অংশ নেই ঠিকই, কিন্তু এই চারটে কোম্পানির পেছনেই এদের দুজনেরই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অবদান আছে। কাজেই এদের কোনোটারই ক্ষতি করা এদের পক্ষে সম্ভব নয়।’

‘সেটা আমরা পরে বিচার করব মিস্টার ঘোষাল। কিন্তু, এখন এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ আছে কি যে, যে সাবোটাজ করছে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে যেন এই কোম্পানিগুলোর আর্থিক অবস্থার কোনো উন্নতি না হয় এবং শেয়ার বাজারে তাদের শেয়ারের দাম ক্রমাগত পড়েই যেতে থাকে?’

‘সন্দেহের অবকাশ অবশ্যই আছে, তবে এটা একটা সম্ভাবনা সেটা মানতেই হবে। তবে, তাতে কার কী লাভ?’

‘ধরুন, আপনার কাছে কোনো কোম্পানির অনেক শেয়ার আছে, কিন্তু সেই কোম্পানিগুলোর প্রতি আপনার বিশেষ কোনো দরদ নেই, সেটা যেকোনো কারণেই হোক। সেক্ষেত্রে সেই কোম্পানির শেয়ার বাজারে দর যদি ক্রমাগত পড়ে যেতে থাকে, তাহলে তার থেকে আপনি কী লাভ করতে পারেন না? অনেক টাকার লাভ?’

অলোকনাথের দৃষ্টি ধীরে ধীরে আবার পেন্সিল থেকে দময়ন্তীর মুখে উঠে এল। তাঁর ফর্সা মুখটা ফ্যাকাশে বলে মনে হল। ফিসফিস করে বললেন, ‘হ্যাঁ করতে পারি বটে।’

‘সেক্ষেত্রে সেই কোম্পানির যদি উন্নতি হয় এবং শেয়ার বাজারে তার দর উঠতে থাকে, তাহলে সেই কোম্পানির উৎপাদন আটকানোর জন্যে বোমাবাজি করা অস্বাভাবিক নয়, তাই না?’

‘না, তা নয়।’ যন্ত্রচালিতের মতো মাথা নাড়লেন অলোকনাথ। তারপর বললেন, ‘আপনি কি বলতে চাইছেন, আমি বুঝেছি। কিন্তু আপনার অনুমান ঠিক নয়। এই চারটে কোম্পানির শেয়ার আমার পরিবারের যাদের কাছে আছে, তাদের এই প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি দরদ হয়তো নেই, কিন্তু আপনি যা ভাবছেন তা এদের পক্ষে করা সম্ভব নয়। আমি

তা প্রমাণ করে দেব।' বলে টেলিফোন তুলে বললেন, 'মিসেস সাহা, আমার বাড়িতে আমার স্ত্রীকে একটু দেবেন।'

শিবেন প্রশ্ন করল, 'কীভাবে প্রমাণ করবেন?'

অলোকনাথ বললেন, 'উনি কি ভাবছেন, আপনি তা নিশ্চয়ই জানেন?'

শিবেন মাথা নাড়ল। বলল, 'না।'

অলোকনাথ একটু যেন আশ্চর্য হলেন। বললেন, 'জানেন না? উনি যা বলতে চাইছেন সেটা শেয়ার বাজারে একেবারে অপরিচিত খেলা নয়। এটা কোনো কোনো অসৎ ব্যবসায়ী করে থাকে। হয় কি, যখন কোনো কোম্পানির শেয়ার পড়ে যাচ্ছে, ধরুন দশ টাকার শেয়ার আট টাকা হয়েছে, তখন আপনি আপনার শেয়ার বিক্রি করে দিলেন। আপনি আট টাকা পেলেন। পরদিন শেয়ারের দাম ছ-টাকা হয়ে গেল। তখন আবার আপনি সেই শেয়ারগুলো কিনে নিলেন। এবার আপনার ঘর থেকে বেরুল ছ টাকা। দু-টাকা আপনার ঘরে রয়ে গেল। এই লেনদেনটা যদি কয়েক হাজার শেয়ারে হয়, তাহলে লাভের পরিমাণটা কম হয় না।'

শিবেন মাথা চুলকে বলল, 'কিন্তু লাভটা যে কোথায় হচ্ছে, সেটাই তো বুঝলুম না। শেয়ারগুলো বেচে দিয়ে দশ টাকায় আপনি অন্তত আটটা টাকা পেয়েছিলেন। সেটা যখন আবার কিনে নিলেন, তখন দুটো টাকা ঘরে রইল বটে, কিন্তু দশ টাকার শেয়ারটা তো তখন ছ-টাকা হয়ে গেছে, এরপর পাঁচ টাকা কী চার টাকায় দাঁড়াবে। তখন সেটা বেচলেও তো আপনি ঘরের দু-টাকা ধরেও আট টাকা পাবেন না।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন। তবে, বললুম তো, এটা করে অসৎ ব্যবসায়ীরা। তারা জোর করে বা ষড়যন্ত্র করে কোনো বিশেষ শেয়ারের দাম কমায়, তারপর কেনা-বেচাটা হয়ে গেলে আবার তার দাম বেড়ে যেতে দেয় যাতে করে সেটা আবার তাদের কেনা দামে উঠে আসে। তখন, তাদের আসল দামটাও ঠিক রইল, মাঝ থেকে বেশ কিছু টাকা ঘরে এসে গেল।'

শিবেন মাথা নেড়ে বলল, 'খেলাটা বুঝেছি, কিন্তু আপনাদের ক্ষেত্রে এ থিয়োরিটা দাঁড়াচ্ছে কী? যিনি বোমা মেরে শেয়ারের দামের ঊর্ধ্বগতি বন্ধ করলেন, তিনি কি আশা করছেন যে অদূর ভবিষ্যতে আপনাদের কোম্পানি আবার বিরাট উন্নতি করবে? আপনাদের যা ক্ষতি হয়েছে, এখন তার থেকে বেরিয়ে আসতে তো অনেক সময় লাগবে।'

'খুব সত্যি কথা। আর সে কথাই তো আমি বলতে চাইছি।'

দময়ন্তী বলল, 'শেয়ারগুলো যদি বিনে পয়সায় পাওয়া হয়, তাহলে এইরকম কাণ্ড করে যা পাওয়া যায়, সেটাই তো লাভ, তাই না? আমার তো কেনা দাম বলে কিছু নেই। কেবল শেয়ারগুলো আছে।'

শিবেন মাথা নেড়ে বলল, 'সেক্ষেত্রে শেয়ারগুলো কি সোজাসুজি বিক্রি করে দেওয়াটাই যুক্তিযুক্ত নয়? এত ঝামেলা করে যে টাকা পাওয়া গেল, তার থেকে তাতে বেশি বই কম পাওয়ার তো কোনো সম্ভাবনা নেই। অবশ্য, শেয়ারগুলো বিক্রি করার যদি কোনো বাধা বা অবরোধ থাকে, তাহলে স্বতন্ত্র কথা।'

অলোকনাথ অত্যন্ত ঠান্ডা গলায় বললেন, 'আমার আত্মীয়দের যে শেয়ার আমি দিয়েছি তাতে কোনো বাধা নেই। তারা সেই শেয়ারগুলো বিক্রি করুক, ফেলে দিক, দান করুক,

যা খুশি করুক, আমার তাতে কিচ্ছু যায় আসে না। যাই হোক, বেশি কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। যদি দেখা যায় যে সেই শেয়ারগুলো সম্প্রতি অল্প কদিনের মধ্যে কেনা-বেচা হয়নি, তাহলেই বোঝা যাবে যে আপনাদের অনুমান ভুল। শেয়ার কেনা-বেচা হলে, শেয়ার কাগজের পেছনে তার রেকর্ড বা খতিয়ান থাকে, তা আপনাদের নিশ্চয়ই জানা আছে?'

বলতে বলতেই টেলিফোন বাজল। অলোকনাথ তাড়াতাড়ি ফোন তুলে বললেন, 'আচ্ছা, ঠিক আছে। হ্যালো তপতী? শোনো, তোমাকে এখনই একটা কাজ করতে হবে। মন দিয়ে শোনো, আমি তোমাকে আর অনুকে যত শেয়ার লিখে দিয়েছি, সেগুলো নিয়ে এখনই একটা ট্যাক্সি নিয়ে এখানে চলে এসো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। কী বললে? হ্যাঁ, সবগুলোই চাই। কয়েকটা হলে চলবে না কি? খুঁজে দেখতে হবে? তার মানে? সেগুলো যত্ন করে রাখা নেই? কী? তোমার গুলো তিনুকে রাখতে দিয়েছ? তিনুকে? কে তোমাকে সেগুলো তিনুকে দিতে বলেছে? আমি তোমাকে ওগুলো দিয়েছিলুম তিনুকে দেবার জন্যে নয়। না, সেই শেয়ারগুলোতে আমার কোনো অধিকার ছিল না ঠিকই। কিন্তু তাই বলে... কী বললে? তিনুকে লিখে দিয়েছ? উফ!' বলে দড়াম করে ফোনটা নামিয়ে রাখলেন। তারপর দু-হাতে মাথা টিপে ধরে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়লেন।

শিবেন দময়ন্তীর দিকে 'এবার কী করা যায়?' দৃষ্টিতে তাকাল। দময়ন্তী বাঁ-হাতে টেবিলের নীচে একটা বরাভয় মুদ্রা দেখাল, অর্থাৎ, 'চুপ করে বসে থাকুন। কিচ্ছু করার দরকার নেই।'

প্রায় দু-মিনিট একভাবে বসে রইলেন অলোকনাথ। তারপর হঠাৎ যেন সম্বিত ফিরে পেয়ে সোজা হয়ে বসলেন। টেবিলের তলায় হাত চালিয়ে বোধ হয় কলিং বেল বাজালেন, কারণ পাশের ঘরে গাঁক করে বেল বাজার শব্দ হল। তৎক্ষণাৎ একটি সুসজ্জিতা মহিলা নোট নেবার খাতা আর কলম হাতে ঘরে ঢুকলেন। অলোকনাথ ক্লান্ত কণ্ঠে বললেন, 'মিসেস মজুমদার, আমার ছেলেকে একটু খুঁজে বের করতে পারেন? নিজের ডিপার্টমেন্টে যে সে নেই তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সে অন্য যেখানেই আড্ডা দিক না কেন, তাকে এখনই একবার এখানে আসতে বলবেন?'

'এখানে স্যার? এই আপিসে?' মিসেস মজুমদারের গলায় অকপট বিস্ময়।

'হ্যাঁ। এখানে। এই অফিসে।' বললেন অলোকনাথ, 'আর একটা কথা। এঁদের জন্যে কফি তৈরি রাখতে বলেছিলুম। দেখুন সেটা কতদূর হল।'

'আচ্ছা, স্যার।' বলে মিসেস মজুমদার বেরিয়ে গেলেন।

কফিটা এল কয়েক মিনিটের মধ্যেই। কিন্তু, অতিথিরা সেটা মুখে তোলবার আগেই হঠাৎ দরজা খুলে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়লেন প্রশান্ত ঘটক। আজকে তাঁর পরনে অফিসের পোশাক— গাঢ় ধূসর রঙের সুট, সাদা শার্ট আর গাঢ় নীল আর মেরুনে ডোরাকাটা টাই।

ঘরে ঢুকেই অতিথিদের দিকে দৃকপাত না করে অলোকনাথকে সম্বোধন করে বললেন, 'এই যে সাহেব, তোমার জন্যে একটু আগে কয়েক মিনিটের মধ্যে দু-দুজন মহিলার টেলিফোন পেলুম। কী হয়েছে, কী?'

সাহেব বললেন, 'তুমি মহিলাদের টেলিফোন পাবে, এতে আশ্চর্য হবার কী আছে? তার জন্যে আমাকে দায়ী করা কেন?'

‘আলবত তোমাকে দায়ী করব। তোমার গিন্নি, তোমার সেক্রেটারি এই অবেলায় আমাকে টেলিফোন করে কেন? আমার কি কাজকর্ম কিছু নেই?’

‘তপতী তোমাকে ফোন করেছিল, বটে? কী বলল সে? তবে হ্যাঁ, আগে এসো, এঁদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দি।’

প্রশান্ত ঘটক অতিথিদের দিকে একঝলক তাকিয়ে বললেন, ‘দরকার নেই। পরিচয় হয়ে গেছে। এঁরা আমার বাড়ি গিয়েছিলেন এবং এই ভদ্রমহিলা বলে এসেছেন যে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে আমিই আমাদের কারখানায় সাবোটাজ করছি। সেদিনই যে আমাকে গ্রেপ্তার করেননি, সেই আমার পূর্বপুরুষের ভাগ্যি।’

‘তুমি সাবোটাজ করছ বলে সন্দেহ করেছেন? কেন!’

‘সেটা পরে বলব। তা ওঁরা এখানে কী মনে করে? তোমার কাছে আমার গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নিয়ে এসেছেন?’

‘না, আমার গ্রেপ্তারি পরোয়ানা। উনি বলছেন যে আমি নাকি বোমা মেরে কোম্পানিকে ডুবিয়ে তার শেয়ার নিয়ে শর্ট সেলিং করছি।’

হঠাৎ প্রশান্ত ভয়ানক গম্ভীর হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দময়ন্তীর দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘কিন্তু অলোকই কেন? এ কাজ তো যেকোনো শেয়ারহোল্ডারই করতে পারে? আমিও করতে পারি।’

দময়ন্তী মাথা নাড়ল। বলল, ‘না, যেকোনো শেয়ারহোল্ডার পারেন না। পারেন তিনি যিনি বোমা বানাতে বা বোমা নাড়াচাড়া করতে পারেন, যেসব কারখানাগুলোর কথা বললুম সেখানে অবলীলাক্রমে ঢুকতে-বেরুতে পারেন, সেইসব জায়গার প্রোডাকশন ইউনিট বা উৎপাদনকেন্দ্রগুলোতে যেতে পারেন কারুর নজরে না পড়ে, কোনো এক কোণায় বোমাটা রেখে আবার কারুর নজরে না পড়ে বেরিয়ে আসতে পারেন। এটা যেকোনো শেয়ারহোল্ডারের পক্ষে করা সম্ভব নয়। আপনার পক্ষেও সম্ভব নয়, কারণ আপনি সেলসের লোক। অন্য কোনো সংস্থার উৎপাদন কেন্দ্রে সবার অলক্ষ্যে আপনার পক্ষে ঢোকা বা বেরুনো অসম্ভব। তা ছাড়া, বোমা বানানো বা তা হাতে করে ঘুরে বেড়ানোও আপনার বা কোনো অংশীদারের পক্ষে সম্ভব নয়।’

‘আমি তো কোনো পেশাদার লোক লাগিয়ে থাকতে পারি?’

‘তা পারেন, কিন্তু সেরকম কোনো সুপার এক্সপার্ট পেশাদার যদি কেউ কলকাতার অপরাধ জগতে থাকত, তাহলে তাকে ধরতে পারুক না পারুক, পুলিশ ঠিক তার সন্ধান রাখত। কিন্তু সেরকম কেউ নেই।’

‘তবে আপনি আমার বাড়িতে গিয়ে একটা অবাস্তব গল্প ফেঁদে বসেছিলেন কেন?’

দময়ন্তী ক্ষীণ হাসল। বলল, ‘গল্পটা অবাস্তব কিনা সেইটে যাচাই করার জন্যে।’

দময়ন্তীর কথার মধ্যেই আবার ঘরের দরজাটা খুলে গেল। মিসেস মজুমদার সশঙ্ক মুখ বাড়িয়ে বললেন, ‘অতীন এসেছে স্যার।’

অলোকনাথ বললেন, ‘এখানে পাঠিয়ে দিন।’

কিন্তু মিসেস মজুমদার দরজার পেছনে অদৃশ্য হবার আগেই প্রশান্ত হাত তুলে বললেন, ‘দাঁড়াও, লীনা, এখনই পাঠিও না। একটু অপেক্ষা করতে বলো। আমি গিয়ে ডেকে আনব।’

মিসেস মজুমদার একটা ম্লান কৃতজ্ঞ হাসি হেসে বললেন, 'আচ্ছা স্যার।' বলে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

তৎক্ষণাৎ অলোকনাথের দিকে ঘুরে বসলেন প্রশান্ত। বললেন, 'ব্যাপারটা কী! হঠাৎ তিনুকে ডেকে পাঠিয়েছ যে! এই এত বছরে, কখনো তো দেখিনি। লীনার তো ধারণা যে আজই তিনুর শেষ দিন।'

অলোকনাথ বললেন, 'ও, তাই মিসেস মজুমদার তোমাকে ফোন করেছিলেন?'

'হ্যাঁ। অন্যায় কিছু করেনি।'

'নাঃ, অন্যায় আর বলি কী করে! ডু য়ু থিঙ্ক, শি ইজ দি লেটেস্ট ভিকটিম অফ দ্যাট স্টাড?'

'হাউ ক্যান য়ু বি সো মিন, অলোক? তুমি তিনুর চরিত্র জানো না? আফটার অল, হি ইজ এ স্পোর্টসম্যান। এসব ব্যাপারে ও কখনোই নেই। লীনা ওকে স্নেহ করে।'

'হ্যাঁ, যেমন তুমি করো, তপতী করে, মিস্টার অশোকনাথ ঘোষাল করেন। আর তাই আজ তোমার লীনা আর তপতী তোমাকে ফোন করে তিনুকে সাহায্য করতে বলেছে, নয়? মিস্টার অশোকনাথ ঘোষাল ফোন করেননি?'

প্রশান্ত বিকৃত মুখে চুপ করে রইলেন। বোঝা গেল এইসব প্রশ্নের জবাব দেবার কোনো প্রবৃত্তি তাঁর নেই। অলোকনাথ বলে চললেন, 'কিন্তু প্রশান্ত, আজ যে প্রমাণ হবে যে আমার মানুষ চিনতে ভুল হয় না! আমি অনেক দিন আগে যখন বলেছিলুম যে তোমাদের তিনু এই বংশের মুখে চুনকালি দেবে, তখন তোমরা আমাকে গঞ্জনা দিয়েছিলে। আজ বোধ হয় তোমাদের ভুল শোধরাবার সময় এসেছে। যাও, ওকে ডেকে নিয়ে এসো।'

প্রশান্ত বিস্ফারিত চোখে বললেন, 'তুমি প্রমাণ করতে চাইছ যে তিনু শেয়ার নিয়ে খেলছে আর সাবোটাজ করছে? তাই তুমি তপতীকে কাগজগুলো আনতে বলেছ? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে?'

'আমি কিছুই প্রমাণ করতে চাইছি না। প্রমাণ যা-কিছু করার করবে ওই কাগজগুলো। যা অবশ্যম্ভাবী, সেটা ঘটতে দেওয়া মাথা খারাপের লক্ষণ হতে পারে না, পারে কি?'

'সত্যি তুমি উন্মাদ হয়ে গেছ। জানি না তিনু সত্যি সত্যি এই কাজ করেছে কিনা। যদি করেও থাকে, সেটা কিন্তু অবশ্যম্ভাবী ছিল না। তোমার ক্রমাগত দুর্ব্যবহারের জন্যেই করেছে। তুমি তোমার ছেলের সঙ্গে যা করেছ, তাতে যদি সে আজ অসামাজিক অপরাধীতে পর্যবসিত হয়, তাহলে আমি তাকে দোষ দিতে পারি না। দোষ তোমার। তুমি আজ পর্যন্ত যে কথাটা বুঝে উঠতে পারলে না তা হচ্ছে কোনো কিছুরই বাড়াবাড়ি ভালো নয়। নীতিবোধেরও না। সর্বমত্যন্তম গর্হিতম কথাটা তোমার নিশ্চয়ই শোনা আছে।' তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রশান্ত বললেন, 'যাকগে, আমার কী? তোমার ছেলে মরল কী বাঁচল তাতে আমার কি এসে যায়? তবে মনে রেখ, তিনু যদি শাস্তি পায়, তাহলে সে শাস্তিটা তোমারও প্রাপ্য।'

'শাস্তি আমি সারাজীবনই পেয়ে আসছি প্রশান্ত। যাও, তিনুকে ডেকে নিয়ে এসো। সময় নষ্ট করো না।'

অতীন্দ্রনাথ ঘোষাল সত্যিই অত্যন্ত সুদর্শন। যেমন অসাধারণ স্বাস্থ্য তেমনি সুন্দর মুখাবয়ব। গায়ের রং তার বাবারই মতো। তার চলা বা দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে কিন্তু তার বাবার শীতলতা একেবারেই অনুপস্থিত। বরং কিছু অতিরিক্ত উষ্ণতাই প্রকট। ঘরে ঢুকে সকলকে অগ্রাহ্য করে গটগট করে হেঁটে গিয়ে অলোকনাথের টেবিলের উলটোদিকে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াল।

অলোকনাথ বললেন, 'তোমার মা তোমাকে কিছু শেয়ার দিয়েছেন। সেই কাগজগুলো কোথায়?'

অতীন্দ্রনাথ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, 'আছে কোথাও, বাড়িতেই।'

'কোথায় আছে মনে করতে পারছ না?'

ভুরু কুঁচকে অতীন্দ্রনাথ বলল, 'অনেকদিন আগেকার ব্যাপার ঠিক মনে নেই। পবিত্র বলতে পারবে।'

'পবিত্র? সে বলতে পারবে কেন?'

'আমার যদ্দূর মনে পড়ে মার দেওয়া শেয়ারের কাগজগুলো ও-ই কোথায় যেন যত্ন করে তুলে রেখেছিল। কোম্পানির কাগজ নিয়ে কী সব লেকচারও দিয়েছিল। বলেছিল, যেখানে-সেখানে ফেলে রাখা উচিত নয়, ইত্যাদি।'

'চমৎকার! যাও, এখনই বাড়ি থেকে কাগজগুলো নিয়ে এসো। এই মুহূর্তে বেরিয়ে পড়ো।'

'ঠিক আছে।' বলে অতীন্দ্রনাথ অ্যাবাউট টার্ন করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে ঢুকলেন এক মহিলা। ইনি মিসেস মজুমদার নন। লম্বা-চওড়া শরীর, গায়ের রং কালো নয়, কিন্তু ফর্সাও বলা চলে না। মাথার চুল কাঁধ পর্যন্ত ছোটো করে ছাঁটা, ধারালো নাক-মুখ, চোখে সরু কালো ফ্রেমের ফ্যাশনেবল চশমা। পরনে হাল্কা সবুজ রঙের সিল্কের শাড়ি, গায়ে কাশ্মিরী সুতোর কাজ করা সাদা স্টোল। কাঁধে লম্বা চামড়ার স্ট্র্যাপওলা সোয়েডের ব্যাগ।

ভদ্রমহিলা ঘরে ঢোকা মাত্র প্রশান্ত উঠে দাঁড়িয়ে 'এসো তপতী, আমরা তোমারই অপেক্ষা করছিলুম।' বলে আপ্যায়ন করে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। বোঝা গেল, ইনিই মিসেস ঘোষাল। এঁকে যে কী করে অশোকনাথ কুৎসিত বললেন, তা তিনিই জানেন। তবে শীর্ণকায় অলোকনাথের ছেলে যে তার মায়ের কাছ থেকেই লম্বা-চওড়া ফিগারটি পেয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না।

প্রশান্ত সকলের কাছে তপতীর পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি সহাস্যে সকলকে নমস্কার করলেন বটে, কিন্তু তাঁর দুই চোখে একটা প্রচ্ছন্ন আশঙ্কা গোপন করতে পারলেন না। অভিবাদন এবং প্রত্যভিবাদনের পালা শেষ হলে ভদ্রমহিলা তাঁর স্বামীর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'তিনুকে দেখলুম এক ছুটে বেরিয়ে গেল। কোথায় গেল?'

প্রশান্ত যেন একটু আশ্চর্য হয়েই জিজ্ঞেস করলেন, 'ছুটে বেরিয়ে যেতে দেখলে?'

তপতী বললেন, 'হ্যাঁ। আমাকে তো দেখতেই পেল না। কোথায় গেল?'

'আমি ওকে বাড়িতে পাঠিয়েছি ওর শেয়ারের কাগজগুলো আনবার জন্যে।' বললেন অলোকনাথ।

‘আমি অনুর শেয়ারগুলো এনেছি। এতে হবে?’ বলে তপতী তাঁর কাঁধের ব্যাগ থেকে একটা বড়ো মোটা খাম বের করলেন।

অলোকনাথ তার ভেতর থেকে কতকগুলো বড়ো বড়ো সার্টিফিকেটের মতো দেখতে ছাপানো কাগজ বের করে সেগুলো উলটেপালটে দেখে আবার খামের ভেতর ঢুকিয়ে রাখলেন।

তপতী আবার জিজ্ঞেস করলেন, ‘এতে হবে?’

মাথা নাড়লেন অলোকনাথ। বললেন, ‘নাঃ। তোমার ছেলের কাগজগুলো চাই।’

‘কেন? কী আছে ওই কাগজগুলোর ভেতরে? আমি তো তোমার অফিসের শ্রীধরনকে দিয়ে ট্রান্সফার করিয়েছি। সে তো বলেছিল কোথাও কোনো গোলমাল নেই।’

‘তা হয়তো নেই। গোলমাল অন্যত্র।’

‘কীসের গোলমাল? কী করেছে তিনু? আমায় একটু বুঝিয়ে বলবে?’

‘আমি বলছি, মিসেস ঘোষাল।’ বলল দময়ন্তী, ‘ব্যাপারটা আপনারও জানা দরকার। আঘাতটা যখন আপনাকেও পেতে হবে...’

‘আঘাত? কীসের আঘাত? আর কত সহ্য করতে হবে আমাকে?’

দময়ন্তী একটা দীর্ঘনিশ্বাস টেনে বলল, ‘তাহলে শুনুন।’

দময়ন্তী বলছিল, ‘আপনি সাবোটাজগুলোর কথা তো শুনলেন। এখন প্রশ্ন হল, এই সাবোটাজগুলো কে করতে পারে? মনে রাখতে হবে, এগুলো কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এক বা একাধিক লোকের একটি গোষ্ঠী এই কাজটা করছে। এখন, আমরা যদি এই ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করি, তাহলে কি দেখব? প্রথমত, এই ষড়যন্ত্রটি যার মাথা থেকে বেরিয়েছে, সে হয় একটি অভিজ্ঞ, অসৎ ব্যবসায়ী যার এই ধরনের কার্যকলাপের সঙ্গে পরিচয় আছে, অথবা এমন একজন লোক যার অঙ্কে মাথা একেবারে পরিষ্কার। দ্বিতীয়ত, এই একই লোকের অথবা তার দলভুক্ত লোকেদের বিজ্ঞান সম্পর্কেও বেশ জ্ঞান আছে যাতে করে তার পক্ষে ছোটো, বহনযোগ্য অথচ শক্তিশালী টাইম বোনা বানানো সম্ভব। তৃতীয়ত, যেসব জায়গায় বিস্ফোরণ হয়েছে, সেইসব জায়গায় তার পক্ষে কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ না করে ঢোকা এবং বের হয়ে আসা সম্ভব। চতুর্থত, তার এই চারটে কারখানাতেই অবাধ গতিবিধি আছে। এবং পঞ্চমত, এইসব কোম্পানির শেয়ারের কাগজ তার পক্ষে জোগাড় করা সম্ভব।

‘এই ধরনের কোনো লোক বা গোষ্ঠীকে কি আমরা চিনি? যদি ধরে নিই যে এই কাজ করেছে কোনো বাইরের লোক যার এই সংস্থাগুলোর সঙ্গে কোনো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নেই, তাহলে সেটা মেনে নেওয়া কিন্তু বেশ কঠিন হয়। বরং এটা কোনো ভেতরের লোকের কাজ, সেটাই অনেক সহজ সিদ্ধান্ত।’

প্রশান্ত জিজ্ঞেস করলেন, ‘এরকম তো হতে পারে যে কোনো বাইরের লোক ভেতরের লোককে দিয়ে এই কাজ করাচ্ছে?’

‘তা অবশ্যই হতে পারে। তখন সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হল, এই ভেতরের লোকটি কে? সে কি হোয়াইট স্টারের লোক না ডায়মন্ড গ্লাস বা অন্য দুটো কোম্পানির লোক? আমরা জানি যে হোয়াইট স্টার বাকি তিনটে সংস্থার কাছ থেকে মাল কেনে অর্থাৎ হোয়াইট স্টার

পারচেজার, বাকি তিনটে সাপ্লায়ার। এখন, সাপ্লায়ারের তরফের কোনো লোকের পক্ষে পারচেজারের উৎপাদন কেন্দ্রগুলোতে অবাধে ঘোরাঘুরি করা কি সম্ভব, না তার উলটোটা? মিস্টার ঘোষাল কি বলেন?'

মি. ঘোষাল দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'অবাধে ঘোরাঘুরি করা কোথাও সম্ভব নয়। তবে পারচেজারের লোকের পক্ষে সাপ্লায়ারের কারখানায় যাওয়াই বেশি হয়ে থাকে।'

'তাহলে এবার আর একটা প্রশ্নের জবাব দরকার হবে। মিসেস ঘোষাল, আপনি কি জানেন যে কোন কোন কোম্পানির শেয়ার আপনি আপনার ছেলেকে লিখে দিয়েছেন। নাম বলার দরকার নেই, কটা কোম্পানি বললেই হবে।'

তপতী একটু চিন্তা করে বললেন, 'সাতটা, হোয়াইট স্টারকে ধরে।'

'বেশ। আচ্ছা মিস্টার ঘোষাল, এই সাতটার মধ্যে চারটের কথা আমরা জানি। তাদের অবস্থা পড়তির দিকে। বাকি তিনটের অবস্থা কী?'

অলোকনাথ বললেন, 'তাদের মধ্যে দুটোর অবস্থা আমাদেরই মতো।' বলে হঠাৎ চুপ করে কী চিন্তা করতে লাগলেন। একটু বাদে বললেন, 'আশ্চর্য, অন্যটার সঙ্গে আমাদের কোম্পানির আশ্চর্য মিল ছিল, কিন্তু আজ আর নেই।'

প্রশান্ত বললেন, 'রয়াল বেঙ্গল ইকুইপমেন্ট লিমিটেড?'

অলোকনাথ মাথা নাড়লেন। বললেন, 'হ্যাঁ। ওরা আর আমরা একই ধরনের ইকুইপমেন্ট বানিয়ে থাকি। আমাদের দুজনেরই অবস্থা পড়তির দিকে ছিল। যে মস্ত অর্ডারটা আমাদের বর্তমান অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটাতে পারত, তার কিছুটা তো ওরাও পেয়েছিল। আজ ওদের দশ টাকার শেয়ারের দাম বাইশ টাকায় উঠে এসেছে। আর আমাদের?'

দময়ন্তী জিজ্ঞেস করল, 'ওদের ওখানে কোনো সাবোটাজ হয়নি?'

'না। অন্তত আমার জানা নেই।'

'ওদের সিকিউরিটি কি আপনাদের ফ্যাক্টরির চেয়ে বেশি জোরদার?'

'একেবারেই না।' বললেন প্রশান্ত, গুটিকয়েক লিকলিকে দরোয়ান। আর সিকিউরিটির যিনি ইনচার্জ, তিনি আবার একটি পর্বতাকার মানুষ। তিনি গেটের কাছে দাঁড়ালে হয়তো চোর-ছ্যাঁচোররা ভয় পেত, কিন্তু তিনি হরদম নাক ডাকিয়ে ঘুমোন। ফ্যাক্টরিতে ডাকাত পড়লেও উঠবেন কিনা সন্দেহ।'

দময়ন্তী বলল, 'তাহলে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, এই ঘটনাগুলোর যোগসূত্র হচ্ছে হোয়াইট স্টার। রয়াল বেঙ্গল ইকুইপমেন্টের সঙ্গে হোয়াইট স্টারের কোনো যোগাযোগ নেই, তাই সেখানে কোনো সাবোটাজ হয়নি। অতএব যিনি নাটের গুরু তিনি এখানেই, মানে এই প্রতিষ্ঠানেই আছেন। এরকম কাউকে আপনি চেনেন, মিস্টার ঘোষাল?'

অলোকনাথ কিছু বলবার আগেই প্রশান্ত বললেন, 'আমি চিনি।'

অলোকনাথ ব্যাকুল চোখে তুলে বললেন, 'কে? কে?'

'তার নাম শ্রীঅতীন্দ্রনাথ ঘোষাল। যে পাঁচটি লক্ষণের কথা আপনি বললেন, তার সব কটিই এর মধ্যে প্রবলভাবে বিদ্যমান। যেমন, প্রথমত, অঙ্কে এর মাথা প্রচণ্ড রকমের পরিষ্কার। সেদিন একটা রিপোর্টে দেখি সাতাশের সঙ্গে একান্ন যোগ দিয়ে দিব্যি অবিচলিত কলমে লিখেছে ছিয়াত্তর। আর চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ যদি সে কখনো হিসাব করে, তাহলে

তার ডিপার্টমেন্টের অন্তত চারজন সেই হিসাব চেক করে নেয়। দ্বিতীয়ত যেন কী বললেন? ও হ্যাঁ, বিজ্ঞানে জ্ঞান? সেও অসাধারণ। একদিন ওকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, বল তো ব্যাটা, ইলেকট্রিক তারে দুটো তার থাকে কেন? সে বললে, খুব সহজ, একটা দিয়ে কারেন্ট আসে, অন্যটা দিয়ে ফিরে যায়। তৃতীয়টা ছিল এই চারটে কোম্পানিতে তার অবাধ গতিবিধি আছে কিনা? হোয়াইট স্টারে আছে, তবে অন্য তিনটেতে আছে কিনা আমার জানা নেই। তবে হ্যাঁ, এসব ক্ষেত্রে সে অবশ্য লোক লাগিয়ে বোমা বসাতে পারে। চতুর্থ বোধ হয় বলেছিলেন সকলের অলক্ষ্যে সে ঘোরাঘুরি করতে পারে কিনা। মানে, সে কোনো প্রোডাকশন ইউনিটে গেল, এদিক-ওদিক ঘুরল, বেরিয়ে চলে এল, তখন সবাই তাকে দেখল অথচ খেয়াল করল না, এই তো? এটা বোধ হয় সম্ভব নয়। কারণ সে পার্সোনেলের লোক, তার কাজ অফিসে, কারখানার ভেতরে নয়। তবে সেক্ষেত্রেও সে লোক লাগাতে পারে। পঞ্চমত, শেয়ার বা কোম্পানির কাগজ। সে তো তার আছেই। তার মা দিয়েছেন। কিন্তু সে জানে যে খুব সম্ভবত সেটা তার বাবার ইচ্ছের বিরুদ্ধে। অতএব, সেগুলো সোজাসুজি বিক্রি করে দিলে অনর্থ হবার সম্ভাবনা। তাই সে শর্ট সেলিং করেছে। আর তা ছাড়া তার হাবভাবটা লক্ষ্য করেছেন। তার বাবা তাকে শেয়ারের কাগজগুলো আনতে বলামাত্র সে ছুটে বেরিয়ে গেল। কোনো ইতস্তত করা নেই, কোনো আমতা আমতা করা নেই, কোনোরকম সময় নষ্ট নেই। যার মনে কোনো পাপ আছে সে-ই তো এরকম করে, তাই না?'

অতীন্দ্রনাথের গলা আবার হিমশীতল হয়ে এল। বললেন, 'তোমার বিদ্রূপগুলো বাজে-খরচা হচ্ছে, প্রশান্ত।'

প্রশান্ত সে কথায় কর্ণপাত করলেন না। বললেন, 'অতএব বিনা দ্বিধায় আপনারা ছেলেটাকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যান। সেখানে তাকে আড়ং ধোলাই দিলে সে হয়তো সবই স্বীকার করে নেবে।'

প্রশান্তর কথা শুনে তপতী শিউরে উঠলেন।

অলোকনাথ বললেন, 'তোমার এত বড়ো লেকচারটার উদ্দেশ্য কী, তা আমি বেশ বুঝতে পারছি, প্রশান্ত। তুমি এঁদের দৃষ্টি তিনুর ওপর থেকে সরিয়ে অন্য একজনের ওপর দিতে চাইছ। হ্যাঁ, একথা সত্যি যে তার অঙ্কে মাথা আছে, সে ইঞ্জিনিয়ার, ইনসপেকশনে আছে বলে আমাদের এবং সাপ্লায়ারদের কারখানায় তার অবাধ গতিবিধি এবং হয়তো অগোছালো তিনুর আলমারি থেকে শেয়ারের কাগজপত্রও তার পক্ষে বের করে নেওয়া সম্ভব। কিন্তু এ কাজ সে করবে কেন? তার কীসের অভাব? তা ছাড়া, তুমি জানো যে সে মিথ্যে কথা বলে না। আমি এখনই তাকে ডেকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করছি, দেখি সে কী উত্তর দেয়। আমার সামনে দাঁড়িয়ে সে কখনো মিথ্যে কথা বলতে পারবে না। আমি জানি তুমি তাকে পছন্দ করো না। আশ্চর্য, যার জন্যে আমাদের গর্বিত বোধ করা উচিত, তাকেই তুমি অপছন্দ করো।'

প্রশান্ত অবিচলিত মুখে বললেন, 'তোমার লেকচারটাও বেশ বড়ো হয়ে যাচ্ছে। তোমার সেই জুয়েলটিকে যদি ডাকতে হয় তো ডাকো।'

দময়ন্তী বলল, 'হ্যাঁ, সেই ভালো। তবে, একটা কথা। তাকে কেবল আপনি নন, আমরা সবাই প্রশ্ন করব।'

তপতী বললেন, 'কী যে ঘটেছে, তা আমি জানি না। তবে এটুকু জানি, তিনুই বলুন আর পবিত্রই বলুন, দুজনের কেউই কোনো অপরাধ করে থাকতে পারে না। তিনু হয়তো লেখাপড়ায় ভালো নয়, পড়ার টেবিলের চেয়ে খেলার মাঠেই ওর মন বেশি পড়ে থাকে। কিন্তু লেখাপড়ায় ভালো না হলেই কি গুন্ডা-বদমাইশ হতে হবে? পবিত্র সত্যিই সবদিক দিয়ে আদর্শ ছেলে, তার পক্ষে কোনো অন্যায় কাজ করার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আপনারা এই ছেলেদুটোকে ছাড়া আর কাউকে কি ধরতে পারেন না?'

প্রশান্ত বললেন, 'দুটোকে কোথায়? ধরা তো হয়েছে একটাকে। এই কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর স্বয়ং বলেছেন যে ছেলেটা বদমাইশ, ক্রিমিন্যাল। তার কারণ, সে লেখাপড়ায় দিগগজ নয়, সে খেলাধুলো ভালোবাসে, দেশের দশের দুরবস্থা আর অর্থনৈতিক সামাজিক সমস্যা নিয়ে কোনোমতেই মাথা ঘামতে রাজি নয়। সে আনন্দ করতে চায়, লাফাতে চায়, হাসতে চায়— সে ক্রিমিন্যাল হবে না তো কে হবে? আর ছেলেটার জিদও আছে। কতদিন বলেছি, তিনে, এখানে থাকিসনি, অন্য কোথাও চাকরি দ্যাখ। তোর মতো স্পোর্টসম্যানকে অনেক কোম্পানি লুফে নেবে। তা শুনল আমার কথা? না, এখানেই থাকবে, বাবার কাছে প্রমাণ করে দেবে যে সে অপদার্থ নয়। এখন? জেলে পচে মর!'

অলোকনাথ অবিচলিত কণ্ঠে বললেন, 'প্রশান্ত, তুমি বড্ড বেশি বকবক করছ। আগে পুরো ব্যাপারটা শেষ হোক, তারপর যা বলবার বলো!'

দময়ন্তী বলল, 'মিস্টার ঘটক, আপনি সত্যিই অকারণে আপনার বন্ধুর ওপর রাগ করছেন। তিনি যে তাঁর ছেলের ওপর অসন্তুষ্ট, তার জন্যে তাঁর জীবনের ঘটনা পরম্পরা যতটা দায়ী, তাঁর আপন মানসিকতা হয়তো ততটা নয়। আপনি যখন ওঁকে বিদ্রূপ করছেন, তখন আঘাতটা গিয়ে লাগছে একটা অসহায় মনে।'

প্রশান্ত বললেন, 'বুঝিয়ে বলুন।'

'আপনি তো তাঁকে অনেক দিন থেকেই চেনেন। অল্প বয়েসে ইনি ছিলেন একজন প্রচণ্ড আদর্শবাদী এবং গুরুতর রক্ষণশীল রাজনীতিক। এই আদর্শবাদ ও রক্ষণশীলতার জন্যে কখনো আবার কাজেও ফাঁকি দেননি। ফলে, তাঁর জীবনে উন্নতি এল অবশ্যম্ভাবীরূপে। তখন উনি বোধ হয় এই বলে নিজের সঙ্গে আপোষ করলেন যে উন্নত অবস্থার মধ্য দিয়েই উনি ওঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসগুলোর আরও ভালো রূপ দিতে পারবেন। এদিকে এই উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এল ক্ষমতা, এল অর্থ, এল প্রতিপত্তি। তখন আবার আপোষ। এই ক্রমাগত আপোষ একটি রক্ষণশীল মনের ওপর কী পরিমাণ চাপ সৃষ্টি করতে পারে, তা বোঝবার ক্ষমতা আমাদের মতো সাধারণ মানুষের নেই। নেই, তার কারণ, আমরা তো প্রতি পদে, প্রতি মুহূর্তে সবকিছুর সঙ্গেই আপোষ করে চলেছি।

'এই মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে আপনার বন্ধু নিশ্চয়ই সান্ত্বনা খুঁজতে গিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রীর কাছে যাঁকে তিনি বিয়ে করেছিলেন মনের মিলের জন্যেই। কিন্তু তখন তাঁর সন্তান হয়েছে। তিনি আপনার বন্ধুকে যতটা সময় দেওয়া উচিত ছিল, ততটা দিতে পারেননি। ফলে, সান্ত্বনা পাওয়া তো দূরের কথা, আপনার বন্ধুর মনে রাগ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। আর সেই রাগ গিয়ে পড়েছে তাঁর ছেলের ওপর। এমনিতেই পোসেসিভ বাপেদের তাদের ছেলেদের ওপর অল্পবিস্তর যৌন ঈর্ষা থাকেই। তার ওপর এক্ষেত্রে আপনার বন্ধুর মনে হল যে তাঁর ছেলে তাঁর স্ত্রীকে কেবল তাঁর কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল তাই নয়, তাঁকে তাঁর আদর্শ থেকেও বিচ্যুতি করল। সেই ছেলে যত বড়ো হতে লাগল আর দেখা যেতে লাগল যে সে তার বাবার পছন্দসই আদর্শবাদী ছেলে তৈরি হচ্ছে না, রাগ ততই বাড়তে

লাগল। তার মা যে তাকে গোপনে মদত দিয়ে থাকেন, আদর্শ মানেন না, তাতে রাগের আগুন আরও বাড়ল বই কমল না। এরই পাশাপাশি এল পবিত্র— আদর্শ ছেলে। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর সমস্ত অপত্য স্নেহটা গিয়ে পড়ল এর ওপর। তাই বলছি, আপনি অকারণ রাগ করছেন, মিস্টার ঘটক। এটা আপনার অনুচিত হচ্ছে।'

দময়ন্তী চুপ করল। প্রশান্ত আর অলোকনাথ, দুজনেই কী যেন বলতে গিয়েও না বলে চুপ করে রইলেন। কেবল দেখা গেল, তপতীর দু-চোখ বেয়ে নিঃশব্দে জল পড়ে যাচ্ছে।

শিবেন নৈঃশব্দ ভেঙে বলল, 'আপনার বিশ্লেষণা বড়ো নিষ্ঠুর হল, বউদি।'

দময়ন্তী বলল, 'হ্যাঁ, তা অবশ্য হল। তবে কি জানেন, নিজের স্বরূপ জানা থাকে না বলে আমরা আমাদের নিজেদের সঙ্গে শত্রুতা করি, নিজেরা নিজেদের ঠকাই। আমরা যদি নিজেদের আসল চেহারাটা সম্পর্কে কোনো ভুল ধারণা পোষণ না করি, তাহলে কিন্তু অনেক মানসিক যন্ত্রণা, অনেক অন্যায় কাজের হাত থেকে বাঁচতে পারি। যেমন ধরুন, সম্পত্তিকর বাঁচানোর জন্যে মিস্টার ঘোষাল নিজের অনেক শেয়ার বেনামি করেছেন, তাতে তাঁর ভেতরে নিজের ওপরে যে রাগের সৃষ্টি হয়েছে, সেটা তিনি আরোপ করেছেন ছেলের ওপর। তাকে বঞ্চিত করে নিজে শাস্তি পাচ্ছেন। তিনি যদি নিজের সম্পর্কে নিষ্ঠুর বিশ্লেষণটা সাহস করে করতেন, তাহলে এই কষ্টটা তাঁকে পেতে হত না।'

অলোকনাথ ম্লান হেসে বললেন, 'আপনার বিশ্লেষণটা অবশ্যই খুব ইন্টারেস্টিং, কিন্তু সমালোচনার অযোগ্য নয়।'

কথাটা শেষ হল না। তার আগেই দরজা খুলে একটি তেইশ-চব্বিশ বয়সের ছেলে ঘরে এসে ঢুকল। রোগা, বেঁটেখাটো চেহারা, মাথার চুল কদমছাঁট করে কাটা, চোখে গোল ফ্রেমের চশমা, ঠোঁটের ওপর একজোড়া মোটা গোঁফ, পরনে সাদা শার্ট আর সাদা ট্রাউজার্স। মুখে একটা শান্ত বিষণ্ণতা। একনজরে সবার ওপর চোখ বুলিয়ে অলোকনাথকে সম্বোধন করে বলল, 'আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?'

অলোকনাথ বললেন, 'হ্যাঁ, পবিত্র। এসো, বসো। এঁদের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে? পরিচয় করিয়ে দি।' বলে সবার সঙ্গে পরিচয় করানো হল।

পবিত্র বলল, 'এঁরা এসেছেন কেন? কোনো গণ্ডগোল হয়েছে কি?'

অলোকনাথ মাথা নাড়লেন। বললেন, 'হ্যাঁ, শেয়ার নিয়ে আর আমাদের কারখানায় যে বোমা ফেটেছিল, তাই এঁরা তদন্ত করতে এসেছেন।'

'শেয়ার নিয়ে? তাই কি তিনু আমার কাছে ওর শেয়ারগুলো কোথায় আছে তা নিয়ে খোঁজ করতে এসেছিল?'

'হ্যাঁ। তুমি জানো শেয়ারগুলো কোথায় আছে?'

'জানি বই কী! ও তো বড্ড অগোছালো ছেলে। ওর সব জিনিসপত্রের খোঁজ আমাকে রাখতেই হয়। শেয়ারগুলো কোথায় আছে বলে দিয়েছি।'

হঠাৎ দময়ন্তী প্রশ্ন করল, 'অতীন্দ্র যখন আপনাকে এই খোঁজ দিতে বলেছিল, তখন আপনি নিশ্চয়ই আরও দু-তিনজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন, তাই না?'

'হ্যাঁ, তাই।'

'অতীন্দ্র যদি আপনাকে আড়ালে প্রশ্নটা করত, তাহলেও কি আপনি বলতেন যে শেয়ারগুলো কোথায় আছে সে খবরটা আপনিই দিয়েছেন?'

‘হ্যাঁ, বলতুম বই কী! মিথ্যে কথা আমি বলি না।’

‘তাই নাকি? অতীন্দ্রের কত টাকার শেয়ার আপনি কেনা-বেচা করেছেন?’

‘আমি? শেয়ার? কি বলছেন? আমি জীবনে শেয়ার কেনা-বেচা করিনি।’

‘আপনার বয়েস খুব কম, অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে যে শেয়ার কেনা-বেচার গলিঘুঁচিগুলোর সঙ্গে আপনার এখনও পরিচয় হয়নি। তাহলে, সেক্ষেত্রে আপনার ভরসা এই কোম্পানিরই শেয়ার ডিপার্টমেন্টের কোনো লোক যিনি শেয়ার ব্রোকারদের সঙ্গে সম্ভাব্য মক্কেলদের পরিচয় করিয়ে দেন এবং তাদের মাধ্যমে কেনা-বেচায় সাহায্য করেন। প্রশান্তবাবু, এরকম কোনো লোক কি এই প্রতিষ্ঠানে আছেন?’

প্রশান্ত বললেন, ‘আছেন। কর্পোরেট সেকশনের শ্রীধরন এই কাজ করে থাকে। আমাদের কোম্পানির যারা শেয়ার কেনা-বেচা করে, তারা ওর মাধ্যমেই করে।’

‘বেশ। এই শ্রীধরনকে ডেকে যদি আপনি চাকরি চলে যাবার এবং হাজতবাসের ভয় দেখান, তাহলে কি সে বলবে যে সে গত এক বছরে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের ছেলের শেয়ার কেনা-বেচা করেছে কিনা, এবং কার কথায় করেছে?’

প্রশান্ত পুলকিত মুখে বললেন, ‘আলবত বলবে! লোকটা একটু অসৎ, টাকাপয়সার প্রতি লোভও আছে, কিন্তু প্রচণ্ড ভীতু। অলোককে আর আমাকে তো যমের মতো ডরায়। আর তারপর ধরাচুড়ো পরা পুলিশের ত্র্যহস্পর্শ যোগ। দাঁড়ান, ওকে এখনই ডাকছি।’

পবিত্র তাড়াতাড়ি হাত নেড়ে বললেন, ‘দাঁড়ান কাকাবাবু, শ্রীধরনকে ডাকার দরকার নেই। আমি সত্যি সত্যি শ্রীধরনকে দিয়ে তিনুর শেয়ার কেনা-বেচা করেছি। তিনু আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিল যেন এই কাজটি আমি গোপনে করে দি। আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলুম যে কাউকে বলব না। কিন্তু সেই প্রতিজ্ঞা রাখতে পারলুম না।’

দময়ন্তী জিজ্ঞেস করল, ‘গোপনে কেনা-বেচা করতে বলেছিল কেন?’

‘ওর ধারণা, এই ধরনের কাজ করলে মেসোমশাই ভয়ানক অসন্তুষ্ট হবেন। অথচ, ওর টাকার খুব দরকার ছিল।’

‘শ্রীধরনের কাছে সে নিজে গেল না কেন?’

‘শ্রীধরনের সঙ্গে ওর সম্পর্ক ভালো নয়। এই অফিসে অনেকের সঙ্গেই তিনুর সদ্ভাব নেই।’

‘কত টাকার লেনদেন হয়েছে?’

‘প্রায় এক লক্ষ টাকা।’

‘বটে! এত টাকার তার দরকার ছিল?’

‘হ্যাঁ। শুনেছি সম্প্রতি ও কিছু বদ নেশা ধরেছিল। কিন্তু কী নেশা তা আমি জানি না।’

‘ও, তাও শুনেছেন? চমৎকার! তা, যে চারটে ফ্যাক্টরিতে সাবোটাজ হয়েছে, সেগুলোও কি অতীন্দ্রই আপনাকে করতে বলেছিল?’

‘সাবোটাজ? সে সম্বন্ধে তো আমি কিছুই জানি না। শেয়ার সম্পর্কে জানি। তিনু বিক্রি করেছে, তিনু কিনেছে, টাকা ও পেয়েছে, আমি কেবল কাগজগুলো শ্রীধরনকে পৌঁছে দিয়ে তাকে সমস্ত ব্যাপারটা গোপন রাখতে বলেছি। এ ছাড়া আর আমার কিছুই জানা নেই।’

‘তাই নাকি? আচ্ছা, সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স কাকে বলে জানেন?’

‘জানি।’

‘আচ্ছা প্রশান্তবাবু, আপনাদের সাপ্লায়ারদের ফ্যাক্টরিতে ইন্সপেকশনে কবে কবে কে গেছেন, তার গত এক বছরের কোনো রিপোর্ট আছে কি?’

‘আছে বই কী। এমনকী কোন কোন বিশেষ দিনে আর কে কে সেখানে গেছেন অথবা যাননি, তারও হিসাব আছে।’

পবিত্র একটু উষ্ণ কণ্ঠে বলল, ‘যেখানে সাবোটাজ হয়েছে সেখানে সেইদিন যদি আমি গিয়ে থাকি, তাতে প্রমাণ হয় না যে আমিই সাবোটাজ করেছি।’

দময়ন্তী বলল, ‘না, তা হয় না। কিন্তু যে যে কোম্পানির শেয়ারের দাম বাজারে পড়ে গেলে যদি কারুর সুবিধে হয়, আর ঠিক সেই সেই কোম্পানির শেয়ার নিয়েই যদি তিনি কেনা-বেচা করেন, তাহলে সেই সব কটা কোম্পানির সাবোটাজের দিনে সেখানে তাঁর উপস্থিতি কিছু একটা প্রমাণ করে বই কী।’

অলোকনাথ হাত নেড়ে ক্লান্ত গলায় বললেন, ‘ব্যস, ব্যস। যথেষ্ট হয়েছে। পবিত্র, এ কাজ তুমি কেন করলে? আমি তোমার কী অপকারটা করেছি বলতে পারো?’

পবিত্র দৃঢ়ভাবে বলল, ‘আমি কিছুই করিনি মেসোমশাই। এসব ষড়যন্ত্র। আমার বিরুদ্ধে কোনোকিছুই প্রমাণ করা যাবে না।’

দময়ন্তী মৃদু হেসে বলল, ‘সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স ব্যাপারটা আপনি যতটা ফেলনা ভাবছেন ততটা কিন্তু নয়।’

এই কথার মধ্যে পুনরায় দরজা খুলে ঘরে ঢুকলেন মিসেস মজুমদার। বিস্ফারিত চোখে ঊর্ধ্বশ্বাসে তড়বড় করে বললেন, ‘স্যার! রায়বাহাদুর এসেছেন!’

তৎক্ষণাৎ অলোকনাথ আর প্রশান্ত সটান খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তপতী উঠে তাড়াতাড়ি ঘরের এককোণে চলে গেলেন যাতে সকলের চোখের আড়ালে থাকতে পারেন। বাকি তিনজন ইতস্তত করছিল, কিন্তু ঘরে যিনি ঢুকলেন, তাঁকে দেখে তারাও উঠে দাঁড়াল। রায়বাহাদুর অশোকনাথ ঘোষাল, পরনে থ্রি-পিস সুট, গলায় বো-টাই, একটু সামনে ঝুঁকে ধীর কিন্তু দৃঢ় পদক্ষেপে ঘরে ঢুকলেন। হাতের ইশারায় সবাইকে বসতে বলে নিজে একটা চেয়ার টেনে বসলেন। বললেন, ‘আমি দুঃখিত মিস্টার অলোকনাথ ঘোষাল যে আমাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট না করেই চলে আসতে হল।’ বলে চট করে ঘাড় ঘুরিয়ে তপতী ঘরে আছেন কিনা দেখে নিয়ে বললেন, ‘তারপর, দময়ন্তী, আসামী ধরা পড়ল?’

উত্তর দিলেন অলোকনাথ। বললেন, ‘হ্যাঁ, একজন ধরা পড়েছে।’

বৃদ্ধ মৃদু হাসলেন। বললেন, ‘বটে? সে কে?’

‘তদন্ত এখনও চলছে। শেষ না হলে নাম বলা বোধ হয় ঠিক হবে না।’ বলে পবিত্রর দিকে তাকিয়ে অলোকনাথ বললেন, ‘আচ্ছা, তুমি এখন যাও। তবে আমার অনুমতি ছাড়া অফিস থেকে বেরিয়ো না।’

পবিত্র ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই অলোকনাথ টেলিফোন তুলে সম্ভবত সিকিউরিটিকে আদেশ দিলেন যেন তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে পবিত্রকে অফিস থেকে বেরুতে দেওয়া না হয়। তারপর শিবেনকে বললেন, ‘আপনি সম্ভব হলে এখনই সার্চ ওয়ারেন্ট দিয়ে আমার

বাড়িতে লোক পাঠান। পবিত্রর ঘর সার্চ করা উচিত। আমি জানি ওর ঘরে একটা ছোটো ল্যাবরেটরি মতন আছে, সেখানে নানারকম এক্সপেরিমেন্ট সে করে থাকে।'

শিবেন বলল, 'ঠিক আছে। তাহলে আপনার অপারেটারকে একটু লালবাজার দিতে বলবেন?'

অলোকনাথ পুনশ্চ ফোন তুলে মিসেস সাহাকে শিবেনের কথা মতো লাইন দিতে বললেন।

প্রশান্ত গলা খাঁকারি দিয়ে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'স্যার, এঁদের যিনি নিয়োগ করেছেন, শুনেছি তিনি এই কোম্পানির একজন শেয়ারহোল্ডার বা অংশীদার। সেই অংশীদারটি কি আপনি?'

রায়বাহাদুর কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে প্রশ্নকর্তার দিকে চেয়ে থেকে বললেন, 'এরকম গাধার মতো প্রশ্ন করো কী করে? জানো না, আমি আমার অংশ তিনকড়িকে লিখে দিয়েছি? তবে হ্যাঁ, নিয়োগ আমিই করেছি আর সেটা করেছি একজন অংশীদারের প্রতিনিধি হিসেবে।'

প্রশান্ত ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'তিনু আপনাকে বলেছিল?'

'আবার! আবার সেই গাধার মতো প্রশ্ন! তিনু কি এসব জানে, না বোঝে? আমি নিজেই তার প্রতিনিধিত্ব স্বীকার করেছি। তার অনুমতিটা যথাসময়ে নিয়ে নেওয়া যাবে অখন।' বৃদ্ধের মুখ তখন চাপা হাসিতে ফুসকায়িত।

দময়ন্তী বলল, 'মিস্টার ঘোষাল, আপনি কিন্তু গোড়া থেকেই বুঝেছিলেন এই কীর্তিটি কার। তবুও একটা বিচ্ছিরি আষাঢ়ে গল্প ফেঁদে বসেছিলেন কেন?'

'তোমার এত বুদ্ধি দময়ন্তী, আর এইটে বুঝতে পারলে না?'

'আমি যা বুঝেছি, বলব?'

'বলো।'

'বালিটিকুরির বিস্ফোরণটার পরেই আপনি ব্যাপারটা কী ঘটছে, তা ধরতে পেরেছিলেন। কিন্তু ষড়যন্ত্রটা এমনভাবে করা হয়েছে যে আপনি সোজাসুজি গিয়ে আপনার ছেলেকে কিছুই বলতে পারছিলেন না। তার কারণ, সবাই জানে যে অতীন্দ্রের প্রতি আপনার পক্ষপাত আছে, অতএব আপনি অন্য যার প্রতি দোষারোপ করছেন তাকে ফাঁসানোই যে আপনার উদ্দেশ্য, সেটাই আপনার ছেলের ভেবে নেওয়া স্বাভাবিক ছিল। তখন যদি কোম্পানির কাগজগুলো পরীক্ষা করা হত, তখন দেখা যেত যে তাদের কেনা-বেচায় অতীন্দ্র ছাড়া অন্য কোনো লোকের চিহ্নমাত্র নেই। তখন যদি শ্রীধরনের খোঁজ পাওয়া যেত, তখন তাকে কেউ চাকরি যাবার বা হাজতবাসের ভয় দেখাত না এবং তখন সে যেসব মিথ্যে কথা বলত, সেগুলো সত্য বলে মেনে নিতে কেউ দ্বিধা বোধ করত না। ষড়যন্ত্রকারিটি তখন বেশ সুচারুরূপে অতীন্দ্রর সর্বনাশটি করে মাসিমা-মেসোমশাইয়ের সংসারে মৌরসীপাট্টা নিয়ে বসত। আর মেসোমশাইয়ের শরীর খারাপ, বেশি উত্তেজনা সয় না। নিজের ছেলে জেলে গেছে, এ ধাক্কাটা বেশিদিন আর সইতে পারতেন না।

'তখন আমাকে এই কাজে লাগিয়ে আপনি আমাদের ভুল পথে চালালেন। ফলে, নানারকম সংবাদ সংগ্রহ করে বিশ্লেষণের বন্ধুর পথে আমাদের সমস্যার সমাধান করতে হল। আমি বাইরের লোক, আমার কারুর প্রতি পক্ষপাতিত্ব থাকার কথা নয়। অতএব, আমার যুক্তিগুলো সবাইকে মন দিয়ে শুনতে হল। এবং, যেহেতু সকলেই বুদ্ধিমান লোক,

অতএব সমস্ত ঘটনাটার স্বরূপ যুক্তির আলোয় সকলেই দেখতে পেলেন। তবে হ্যাঁ, কারুর কারুর চোখের সামনে কতগুলো মানসিক বিকারের পর্দা ছিল। রূঢ়ভাবে হলেও সেই পর্দাগুলো আমাদের ছিঁড়ে দিতে হয়েছে।'

রায়বাহাদুর সহাস্য মুখে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'তোমার সবকটি কথাই প্রায় ঠিক, কেবল একটি ছাড়া। আমি কিন্তু তোমাদের নেহাত ভুল পথে চালাইনি। কেবল অতীতের এক ঘটনাকে বর্তমানে এনে ফেলেছিলুম এই কারণে যে পাত্র-পাত্রীদের নাম পালটে দিলে সেটা আজকের এই ব্যাপারেও সত্য। ভেবে দ্যাখ, এই ঘটনাটা আদৌ ঘটল কেন? অলোক যার নাম করতে চায় না, সে ছেলেটি যে ব্রিলিয়ান্ট তাতে তো সন্দেহ নেই। তা নাহলে এরকম একটা ষড়যন্ত্র তার মাথা থেকে বেরোয়? কিন্তু প্রশ্ন হল, এহেন ব্রিলিয়ান্ট ছেলে এরকম একটা কাজ করতে গেল কেন? তিনকড়িকে এইভাবে না ফাঁসালেও, একদিন না একদিন তার বাপ তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিত। সে পর্যন্ত অপেক্ষা করলেই হত। এই নিষ্ঠুরতার কি দরকার ছিল? আসলে কি জানো দময়ন্তী? সম্পত্তিটা বড়ো কথা নয়, এটা ক্রাইম প্যাশিওনেল বা রিপুজনিত অপরাধ। আষাঢ়ে গল্পটা বলার একটা উদ্দেশ্য ছিল এই ইঙ্গিতটা দেওয়া যে ঈর্ষা এবং প্রতিহিংসা— এই দুটো ব্যাপার যেন তোমার দৃষ্টি এড়িয়ে না যায়।'

দময়ন্তী রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'বৈদেহী? আমি এইরকমই সন্দেহ করেছিলুম!'

'দোষ তার নয় দময়ন্তী। দোষ যৌবনের আর আমার পুত্র ওই মিস্টার অলোকনাথ ঘোষালের। উনি আড়ালে ঘটকালি করেছিলেন। তাই না মিস্টার অলোকনাথ ঘোষাল?'

অলোকনাথ কোনো জবাব দিলেন না। নিঃশব্দে মাথা নীচু করে বসে রইলেন। এইসময় দরজা খুলে ঘরে ঢুকল অতীন্দ্রনাথ। ঠাকুরদাকে দেখে ফিক করে হেসেই গম্ভীর হয়ে তার বাবার টেবিলের সামনে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে একটা মোটা খাম তাঁর দিকে এগিয়ে দিল। অলোকনাথ ক্লান্ত ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে খামটা নিয়ে না খুলেই প্রশান্তকে দিয়ে দিলেন। বললেন, 'ওখানে কী আছে, আমি জানি। তবু একটু চেক করে দেখো।' তারপর মুখ তুলে ছেলেকে বললেন, 'আজ সন্ধ্যেবেলা বাড়ি থেকে বেরুবে না আর একটু ভদ্রস্থ পোশাক-আশাক পরে থাকবে। আজই ডক্টর ব্রজেন চ্যাটার্জি আর বৈদেহীকে নিয়ে আটটা-সাড়ে আটটা নাগাদ বাড়ি আসব। বৈদেহীর বিয়ের কথাবার্তা বলবার জন্যে।'

অতীন্দ্রনাথের সমস্ত শরীরটা কঠিন হয়ে উঠল। মুষ্টিবদ্ধ হাতে দাঁতে দাঁতে চেপে বলল, 'সেখানে আমার থাকার কি দরকার? পবিত্র থাকলেই তো হল?'

অলোকনাথ স্বভাবসিদ্ধ হিমশীতল গলায় বললেন, 'বাজে বকো না। তোমার সঙ্গে বিয়ে আর তুমি না থেকে পবিত্র থাকলেই হবে?'

'আমার সঙ্গে?' ছেলেমানুষের মতো চেঁচিয়ে উঠল অতীন্দ্র। ঠাকুরদার চেয়ারের পেছনটা ধরে যেন টাল সামলাল। আর ঠিক তখনই একটা অদ্ভুত আওয়াজে সবাই পেছন ফিরে তাকাল। দেখা গেল, তপতী একহাতে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে আছেন বিস্ফারিত চোখে। সেই চোখে কৃতজ্ঞতা, অনন্দ এবং হয়তো আরও অন্য কিছু।

প্রশান্ত অতীন্দ্রর হাত ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন, 'বুঝলি তিনে, তোর বাপ আমাকে তোদের বাড়ি আজ যেতে বলেনি বটে, কিন্তু আমি যাবই। তুই ব্যাটা যা ক্যাবলা, হবু শ্বশুরের সামনে কী করতে কী করে বসবি।'

অশোকনাথ বললেন, 'না। তুমি আজ সন্ধ্যেবেলা আমার বাড়িতে যাবে। আর যাবার সময় অনুকে নিয়ে আসবে। তিনকড়ি আসবে তার মোটর সাইকেলে বৈদেহীকে নিয়ে। আর মিস্টার অলোকনাথ ঘোষাল ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জিকে নিয়ে আসবেন। আমি এখন বউমাকে নিয়ে যাচ্ছি।'

প্রশান্ত ঘটকের মুখটা একেবারে হাঁ হয়ে গেল। খাবি খেতে খেতে বললেন, 'বউমা, মানে তপতী?'

'আবার গাধার মতো প্রশ্ন। তোমার পদবি ঘোটক না হয়ে দেখছি গর্দভ হওয়া উচিত ছিল। আমার বউমা আর কে হতে পারে? তুমি যদি বিয়ে করতে তাহলেও বা একটা কথা ছিল। আর হ্যাঁ, এই যে তোমরা! তোমরাও আসবে। আর সেন সাহেব, গিন্নিটিকে আনতে ভুলবেন না যেন।'

দময়ন্তী সহাস্যে মাথা নেড়ে বলল, 'অবশ্যই যাব। কেবল একটা শেষ প্রশ্ন। যিনি আপনাকে আমার নাম বলেছিলেন, অতীন্দ্রের আড়ালে বৈদেহীর সঙ্গে যে অন্যরকমের বন্দোবস্ত হচ্ছে তার খবর দিয়েছিলেন, অতীন্দ্র এবং বৈদেহীর মনের কথা যিনি জানিয়ে ছিলেন এবং আপনার সাহায্য চেয়েছিলেন, অতীন্দ্রকে যে ফাঁসানোর কোনোরকম একটা ষড়যন্ত্র দানা বাঁধছে, সে বিষয়ে তাঁর ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের সন্দেহের কথা বলেছিলেন এবং আজকে এই অফিসে আপনার উপস্থিতি প্রার্থনা করেছিলেন, তিনি কি একই ব্যক্তি?'

বৃদ্ধ হাসতে হাসতে প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বললেন, 'অবশ্যই, অবশ্যই। তিনি ছাড়া আর কে হবেন?'

'তাই যদি হবে, তবে তাঁর সম্পর্কে কিছু আপত্তিকর কথা বলেছিলেন কেন?'

'তার কারণ, তুমি যদি জানতে যে আমার সংবাদদাতাটি কে, তাহলে তুমি সোজাসুজি তাঁর কাছে যাবার চেষ্টা করতে। তাহলে সঙ্গে সঙ্গে মিস্টার অলোকনাথের তোমার ওপর সন্দেহ গড়ে উঠত। তোমার বিশ্লেষণ সে শুনতে হয়তো রাজিই হত না। তা ছাড়া, একসময় আমি তাঁর ওপর অনেক অন্যায় করেছি। কিন্তু তিনি যে আজ সেসব কথা ভুলে গিয়ে আমাকে একটা প্রকাণ্ড অপরাধবোধের বোঝার থেকে মুক্তি দিয়েছেন, সে কথা আমার পুত্র জানতে পারলে সে যে কী মূর্তি ধরত, তা তো আমার জানা ছিল না। ব্যস, আর নয়। এসো বউমা, আমাদের যাবার সময় হয়েছে।'

শিবেন জনান্তিকে দময়ন্তীকে বলল, 'বুড়েকে মোক্ষম বিশেষণটি দিয়েছেন বটে— রামঘুঘু।'